বিপন্ন সময়

অমলেন্দু চক্রবর্তী

সাহিত্য
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ - ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশিকা
আভারাণী মিত্র
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
শতদল ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর
শ্রীপরাণচন্দ্র ঘোষ
চণ্ডিকা প্রেস
১১৯, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

তৃপ্তি, তৃপ্তি, অতৃপ্তি, তৃপ্তি—প্রেম, ভালোবাসা, রোদনভরা এ বসন্ত—গান, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, সুচিত্রা মিত্র, তৃপ্তি—অধ্যাপিকা, সাংবাদিক, টেলিপ্রিণ্টার, রয়টার, পি-টি-আই—সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি, সংসার—কলকাতা, বৃন্দাবন মিত্র লেন, ভবানীপুর, তৃপ্তি, তৃপ্তি—তৃপ্তি, আমি কল্যাণ, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়······

কিছুই যখন করার নেই, কিছুই যখন ভাবার নেই, 'কিছু ভাবব' ব'লে তখনই সামনে এসে বসল কল্যাণ। 'কিছু লিখব' ব'লে প্যাডটা নিলো। কলমটাও। কিন্তু কিছু লিখতে গিয়ে মনে হলো কিছু লেখার নেই, কিছুই ভাবার নেই। এলোমেলোভাবে নানা চিন্তা নানা ভাবনা মাথার ভিতর কিল্‌বিল্‌ করছে। মন রইল একদিক, চোখটা কাগজের উপর, কলমটা যন্ত্রমাত্র। টুকরো ভাঙা ভাঙা, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন শব্দে আর কথায়, অর্থহীন। কাগজের বৈধব্য কালো হয়ে গেলো। কি লিখছে জানে না, ভাবছে তা-ও না। তবু লিখছে, লিখে চলেছে। কলমটা থামল একসময়। হুঁশ হলো। মনে হলো, বুঝি কিছুই ভাবছে না। চেয়ে দেখল কাগজটা একেবারে কালো। এতটুকু জায়গা নেই কোথাও। শুধু হিজিবিজি আর নানা আঁকিবুঁকি।

একটানে প্যাড থেকে কাগজটা টেনে নিলো। অনেকক্ষণ সময় দিয়ে হাতের পাতায় ঘ'ষে দলা পাকালো আনমনে। তাকিয়ে রইল টেবিল-লাইটের শেডটার দিকে। জানলা গলিয়ে ফেলে দিলো কাগজের গোল্লাটা। সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে ধোঁয়ার রং দেখল। একবার নয়, দুবার নয়—অনেকবার। মাথা তুলে আরেকবার টেবিলের দিকে তাকাল। ন-টা বাজতে দশ মিনিট। বেশ রাত হয়েছে। প্যাডের উপর আরেকটা ধবধবে পাতা

কাগজ প্রলুব্ধ করছে যেন। ডান হাতেব সিগারেটটা বাঁ হা
কলমটা তুলে নিলো। একটা মানুষের মুখ আঁকতে গে
অনেকটা আমের মতো হলো দেখতে। আমের উপরই
চোখ এঁকে দিলো। অদ্ভুত একটা কিছু হলো। কী
না। নিজের নাম সই কবল বারকয়েক। তৃপ্তির ন
একবার নয়, দুবার নয়, অসংখ্যবার। গোটা কাগজটা
কালো ক'রে তুলল তৃপ্তির নাম লিখে—মিস তৃপ্তি, মিস্ ন
নয়—অধ্যাপিকা, অধ্যাপিকা তৃপ্তি ঘোষ, তৃপ্তি মুখা
মুখোপাধ্যায় এম এ—তৃপ্তি .....

আচ্ছা, তৃপ্তি আসছে না। এখনও আসছে না কেন?
ন-টা কুড়ি। এখনও ঘবে না ফেরার কোন কারণ নেই
কারণ থাকতে পারে না। আধুনিকতাব কোন যুক্তি দিয়ে
আর সমর্থন করতে পারবে না তৃপ্তি। অসম্ভব। হাতের
শেষ হয়ে এসেছে। পুড়তে-পুড়তে শুধু ছাই জমেছে এতক্ষ
সইতে না পেবে টুক্ ক'রে প'ড়ে গেলো ধবধবে শাদা টে
উপর। প'ড়ে গিয়ে ভেঙে গেলো না। প'ড়ে রইল অবি
নিটোল গোল হয়ে। তৃপ্তি কাছে থাকলে ধমক দিতো।
উড়িয়ে দিতো সঙ্গে সঙ্গে, সন্দেহ নেই। অ্যাশ্‌ট্রে থাব
টেবিল-ঢাকনাটা নষ্ট করাব জন্য অনুযোগ করত। কিন্তু
তাই? কাছে থাকলে সে সুযোগ কি তৃপ্তি পেতো! f
ধরানোর পব মাত্র বারকয়েক ওটা ঠোঁটে তুলতে পেরেছে
মনে মনে হিসেব কষল। ওটাব কথা মনেই ছিল না,
অন্যদিকে। অন্য কথা ভাবছিল। তৃপ্তি কাছে থাকলে মনা
থাকত না ওভাবে, হাতে-হাতে পুড়ে ছাই হবাব সুযোগ পে
সিগারেটটা।

দূরের কোন বাড়িতে যেন রেডিও বাজছিল এতক্ষণ
হচ্ছিল। রবীন্দ্র-সঙ্গীত। প্রিয় গায়িকার গলা। ভালো লা

গান থেমে গেছে। কিন্তু রেডিওটা বন্ধ কেন! বোধহয়, ' মধ্য-সমুদ্রে তিমিমাছ শিকার ' অথবা ' মঙ্গলকাব্যে ফুলুরির স্থান ' সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছেন কোন পণ্ডিতপ্রবর। নিধুর মা কি কাজ সেরে নীচে চ'লে গেছে? একটু আগেও টুক্‌টাক্ শব্দ হচ্ছিল রান্নাঘরে। এখন চুপচাপ। রান্না শেষ হয়েছে বোধহয় আটটায় কিংবা তারও আগে। হয়তো নীচে গিয়ে সেই গিন্নির সঙ্গে মন খুলে আসর জমিয়েছে। নীচের তলায় একটা ঘর নিয়ে থাকে একটি পরিবার। বরিশালের উদ্বাস্তু। স্বামী-স্ত্রী আর চার-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে। লোক ভালো, তবে একটু বেশি কথা বলে। ও ঘরের গিন্নির সঙ্গে নিধুর মা-র জমে ভালো। সারাদিনে অন্তত কুড়ি-পঁচিশবার কম কথা বলার জন্য নিধুর মাকে ধমক দেয় তৃপ্তি।

সিগারেটের আগুন নামতে-নামতে এসে আঙুলের নখ ছুঁয়েছে। কোনরকমে শেষ টান টেনে ওটা অ্যাশ্‌ট্রেতে গুঁজে রাখল কল্যাণ। প্যাডের কাগজটায় আর জায়গা নেই। একটা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলল সেটা। উল্টো দিকটা এখনও শাদা। অনেক কিছু লেখা যায় এখনও। আরও অনেকটা সময় কাটানো যায়। কিন্তু কি লিখবে? কবিতা লিখতে জানে না। জানলে শুধু আজ নয়— গোটা দু-বছরে অনেক কবিতা লিখে ফেলত। শুধু তৃপ্তিকে নিয়েই সনেট লিখত ডজন কয়েক। যারা কবিতা লিখতে জানে না তাদের জন্য কবি থাকেন। কল্যাণ কবিতা পড়ে, পড়তে ভালোবাসে। মনের সম্মতি না নিয়েও হাতের কলমটা অনেক কিছু লিখে ফেলে। এমন কি কবিতাও—

' তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল
সূর্য মানে আলো
এখনও নারীর মানে তুমি।......'

তারপর? কলমটা থেমে গেলো। আর একটা মাত্র লাইন। কী যেন লাইনটা! মনে পড়ছে না। কী যেন, কী যেন, আঃ·

টেবিলের উপর কনুইটা ঠেকিয়ে আঙুলের সাঁড়াশিতে মাথাটা চেপে ধরল। দাঁত চেপে, জোর ক'রে চোখ বুজে, সমস্ত মন এক ক'রে ভাবল কিছুক্ষণ। হারিয়ে যাওয়া লাইন! মনে পড়ছে, কিন্তু পড়ছে না। খুব কাছে-কাছেই ঘুরছে, কিন্তু ধরতে পারছে না কল্যাণ। অনেকটা অন্ধকারে মশারির নীচে তালি দিয়ে উড়ন্ত মশা-মারার মতো। হ্যাঁ, পড়েছে। মনে পড়েছে—'কত রাধিকা ফুরালো।' যেন একটা আবিষ্কার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কল্যাণ। ঠিক জায়গামতো লিখতে গেলো। কিন্তু কলমটা হোঁচট খেলো আবার। বাইরে পায়ের শব্দ। কে যেন উঠছে উপরে।

তৃপ্তি! তৃপ্তি ফিরেছে! কল্যাণ ঘড়ির দিকে তাকাল। ন-টা পঞ্চাশ। প্রায় দশটা। রাত দশটায় ঘরে ফিরছে তৃপ্তি। সিঁড়িতে শব্দ। একটা লাল রঙের স্লিপার। শব্দটা স্লিপারের নয়—পায়ের। এ শব্দ ওর অনেকদিনেব চেনা। আজ প্রায় পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। অন্তত দেড় মাসের বিবাহিত জীবনে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

এক···দুই···তিন···ওর প্রতিটি পায়ের শব্দ গোনা যায়। তৃপ্তি কি ক্লান্ত? বড়ো আস্তে-আস্তে, গুনে-গুনে সিঁড়ি ভাঙছে মনে হয়। কোত্থেকে এলো? হয়তো অনেকটা পথ হেঁটেছে। হয়তো দেখা হয়ে গিয়েছিল কোন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধু নয় তো বান্ধবী। হয়তো হেঁটেছে কথা বলতে-বলতে।. এলগিন রোড থেকে হাজরা কিংবা আরও দূরের পথ—লেক থেকে কালীঘাট কিংবা আরও দূর—গড়িয়াহাট থেকে। কিংবা কোথাও থেকে নয়, সিনেমা দেখে। সিনেমা দেখে ক্লান্ত।

সিনেমা। গলাটায় কে যেন খামচি দিলো হঠাৎ। একটা ঢোঁক গিলে নিজেকে সামলে নিলো কল্যাণ। শাদা কাগজের উপর আবার আঁকাবুঁকিতে মন দিলো। প্যাকেট থেকে সিগারেট টেনে নিলো আরও একটা। ধরাল। উঠে গেলো না। তৃপ্তি দোতলায় উঠে এসেছে একথা জেনেও একবার পিছু তাকাল না। বরং আরও

বেশি অমনোযোগী হবার ভান করল সেদিকে, আরও বেশি মন দিলো হিজিবিজির শাদা কাগজে।

ভেজানো দরজাটা খোলার শব্দ হলো পিছনে। তৃপ্তি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। শ্লিপারটা রাখলো চৌকাঠের ধারে—'এ কি, কখন এসেছ?'

কল্যাণ সাড়া দিলো না।

তৃপ্তি এসে গা ছুঁয়ে দাঁড়াল। টেবিলের পাশে। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল কোণের দিকে। হাতঘড়িটা খুলল। কোনদিকে না তাকিয়ে সব কিছুই অনুমান করতে পারছে কল্যাণ! এবার ঘড়িটা রাখতে হবে টেবিলের ড্রয়ারে। তা হলে কল্যাণকে একটু হেলতে হবে বাঁদিকে।

তৃপ্তি কাঁধের দিকে একটু মৃদু ধাক্কা দিলো—'কী হলো, সরো।'

সিগারেটে একটা টান দিয়ে একটু কাৎ হলো কল্যাণ। ঘড়িটা ঠিক জায়গায় রেখে ড্রয়ারটা সশব্দে ঠেলে দিলো তৃপ্তি, চশমাটা টেবিলের উপর ভাঁজ ক'রে রাখল।

'কী কথা বলছ না যে। কখন এসেছ?' তৃপ্তি টেবিলের কার্নিশে কোমরের ভার ছুঁয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

টেবিল থেকে স'রে চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তৃপ্তি। একটা নরম চাপ পড়ল কাঁধের উপর। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ঝুঁকে পড়েছে তৃপ্তি। কল্যাণ অনুভব করল। শুনল, ফিসফিসিয়ে বলছে তৃপ্তি—'রাগ করেছ?'

কল্যাণ গম্ভীর। চুপ।

তৃপ্তি উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল হঠাৎ। মাথা নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কল্যাণের পাট করা চুলগুলো এলোমেলো ক'রে দিয়ে সরে যেতে-যেতে বলল—'রাগ না অভিমান!' এই তো চাই। মাঝে মাঝে রাগ করবে, শাসন করবে, ধমকাবে, নইলে কি ছাই ভালো লাগে! বঁধুয়ার মান ভাঙাতে আমি প্রাণান্ত হবো। এই দেখো,

দেখেছ, নিধুর-মা তোমাকে চা দিয়েছে, কাপটা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি বুঝি। এতো যে বলি, ঘর-টর আগোছালো দেখলে আমার খারাপ লাগে। নাঃ—এই বুড়িকে নিয়ে আর পারিনে বাপু।'

ব'লেই টেবিলের কোণ থেকে খালি চায়ের কাপটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল, বেশি দূরে নয়, ওধাবে দরজার কোণে রাখবে ব'লে। কল্যাণ জানে, এবার উঠতে হবে। একটা মাত্র ঘর। স্বামী-স্ত্রীর জন্য ঘবটা শুধু যথেষ্ট নয়, বরং বড়ো, রীতিমত বড়ো। টেবিল-লাইটের সব আলো উপচে পড়েছে টেবিলের উপর। সারা ঘরে অন্ধকার। তবু তৃপ্তি অসুবিধায় পড়বে এবার। এগিয়ে এসে বলতে হবে—' ওঠো, একটু বাইরে যাও।' অন্য কোনদিন বলে না। বলতে হয় না। কল্যাণ নিজেই উঠে গিয়ে করিডোরে দাঁড়ায়। কিন্তু আজ যেন কেমন একটা ঝোঁক চাপল মাথায়। ব'সে রইল। রাগ হোক, অভিমান হোক, তৃপ্তির বিরুদ্ধে আজ ওব বলার আছে অনেক। শাসনের ভঙ্গিতে স্পষ্ট ভাষায় যা বলা যাবে না তা এমনি ক'রেই বোঝাতে হয়। মুখের কথায় না হোক, আচরণে। নিঃশব্দে সিগারেটে আরও কয়েকটা টান দিলো কল্যাণ। সত্যি যদি তৃপ্তি এগিয়ে এসে বলে—'বাইরে যাও।' তবে আর গোঁ ধ'রে ব'সে থাকবে না। উঠবে।

কিন্তু তৃপ্তি এলো না। তবে কি রান্নাঘরে গেলো? রান্নাঘর কি খোলা? নিধুর মা যদি কাজ সেরে নীচে গিয়ে থাকে তবে ওঘরের দরজায় তালা। বার কয়েক ঘটি-বাটি খোয়া যাবার পর বারোয়ারি বাড়িতে ওটাই এখন রেওয়াজ। নিধুর মাকে চিৎকার ক'রে ডেকে এনে ওর সামনেও শাড়ি বদলাতে পারবে না তৃপ্তি। তাহলে যেতে হবে নীচের বাথরুমে। জল প্যাঁচ-প্যাঁচ করা নোংরা বাথরুমে ভাঁজ করা শাড়ি পাল্টানোয় অসুবিধা অনেক। তাছাড়া নিধুর-মার মতো সেকেলে বুড়ি, গেঁয়ো গৃহস্থদের মতো আর সব সহ-ভাড়াটেরা বলবে কি দেখে? একেই বলে এম. এ পাশ বৌ। সোয়ামির কাছে

লজ্জা! হাসি পেলো কল্যাণের। ওরা ভাবতেও পারে না একটি যুবক এবং একটি যুবতী বিবাহের পরেও শরীরের বেড়া ডিঙিয়ে স্বামী এবং স্ত্রী হ'তে কিছুদিন সময় নেয়। অন্তত দেড় মাসের বেশি।

'তুমি সেই সন্ধ্যে থেকে ব'সে আছো নাকি? বেরোও নি!'

পিছনে তৃপ্তির গলা। অবাক হলো কল্যাণ। দাঁতে শাড়ির পাড় কামড়ে কথা বলছে তৃপ্তি। অস্পষ্ট আর ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ! ঘরের পনেরো আনা অন্ধকারে শাড়ি বদলাচ্ছে ও। আর এক-আনা আলো নিয়ে মুখ বুজে প'ড়ে আছে কল্যাণ। সম্মতি না পেলেও ফিরে তাকান যায়। কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু—

কোন সাড়া না পেয়েও তৃপ্তি চুপ রইল না। বলল—'জানো, প্রণবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কলেজ থেকে ফিরছি, পথে হঠাৎ দেখা। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। গ্রেটা গার্বোর অনেক দিনের পুরনো একটা ছবি এসেছে মেট্রোতে। কি যেন নামটা! তোমাকে বলব ব'লে মনে রেখেছি। হ্যাঁ—কুইন ক্রিশ্চানা। প্রণব জোর ক'রে নিয়ে গেলো। সত্যি, দারুণ ছবি। গ্রেটা গার্বো আর জন গিল্‌বার্ট। আঃ, তুমি দেখলে না! সত্যি, মিস্‌ করলে। গেলে না কেন? তাড়াতাড়িই তো ফিরেছ। গেলেই তো পারতে।'

এক নাগাড়ে ব'লে গেলো তৃপ্তি। দাঁতে-কামড়-শাড়ি নেমে গেছে। পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ কিন্তু কষ্টকৃত কণ্ঠস্বর। যেন ঘুম থেকে উঠে দুহাত ছড়িয়ে আড়ামোড়া ভাঙছে পিছনে। পিছনের দিকে পিঠ বাঁকিয়ে বোধহয় ব্লাউজ খুলছে তৃপ্তি কিংবা পরছে। শাদা কাগজের উপর তখনও অর্থহীন প্রলাপ আর শব্দ লিখে চলেছে কল্যাণ। কোন দিকে না তাকিয়ে যেন অন্ধকারকে প্রশ্ন করল—'কোথায় গিয়েছিলে, বললে?'

'' সিনেমায়।'

কল্যাণ আবার থামল। প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ল।

'তুমি গেলে না কেন? জানতে না বুঝি?'

'জানতাম।'

'তবে গেলে না কেন?'

'যাবো ব'লেই তো এতো তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কি? গেলেই পারতে।'

'ঘরে এসে ভালো লাগল না।'

'তুমি কুঁড়ে। এতো ভালো ছবি! তাছাড়া প্রণবের সঙ্গেও দেখা হতো। বললাম আসতে। এলো না। বলল—'শিগগিরই নাকি চ'লে যাবে। যাবার আগে আসবে একদিন।'

'কোথায় আছে ও এখন?'

'জলপাইগুড়ি। ভালো চান্স পেয়েছে। 'স্পনসর্ড' কলেজ।'

কল্যাণের কথা-বলার দায়িত্ব চুকল। তৃপ্তি কাছে এসে দাঁড়াল। খুব কাছে, টেবিলের ধার ঘেঁষে—'শোনো।'

'বলো—'

'তাকাও না আমার দিকে—' তৃপ্তি জোর ক'রে কল্যাণের থুত্‌নি ধ'রে মুখটা তোলাল। হেসে বলল—'জানো, প্রণব বিয়ে করছে।

'হুঁ।' কাকে?

'কাকে কি ক'রে বলব। ও কি নিজেই জানে নাকি ছাই। 'সেটেল্‌ড্‌ ম্যারেজ, বাপ-মার পছন্দ'—ব'লেই কল্যাণের মুখটা ছেড়ে দিলো তৃপ্তি। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল হঠাৎ—আমার কি মনে হয় জানো, মিনতিও বোধহয় এতদিনে লাল-চেলি প'রে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো পিঁড়িতে ব'সে গেছে। প্রণবকে জিজ্ঞেস করিনি মিনতির কথা। কি জানি বাপু, পুরনো ঘায়ে আবার···কি বলো, হ্যাঁ—' এবারে টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কল্যাণের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল—'আসলে ওসব প্রেম-ট্রেম নয়, ওদের। কি বলো? তোমার মতো, আমার মতো, আমাদের দু'জনের মতো

—কী, কিছু বলছ না যে। লজ্জা পেলে নাকি? আচ্ছা, তুমি একটু ব'সো। আমি গা-হাত ধুয়ে আসি নীচ থেকে। এসে লজ্জা ভেঙে দেবো।'

ব'লেই একেবারে অতর্কিতে কল্যাণের কপালের ধারে একটা চুমু খেয়ে ব্যস্তহাতে চুলগুলো উল্টে-পাল্টে দিয়ে স'রে গেলো দূরে। চুরি করার দায়ে, ধরা পড়ার লজ্জায়। কল্যাণ হাসল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলো, দরজাটা বন্ধ আছে কিনা।

দুই

হয়তো এখন অনেক রাত। ঘর অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে এক বিরাট স্তব্ধতা। দরজা দুটো বন্ধ। অঘ্রাণের শুরু। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে বাইরে থেকে। দক্ষিণের জানলা দুটো বন্ধ রাখতে হয়। খোলা শুধু শিয়রের জানলাটা। ওখান দিয়েই যা একটু আলো-বাতাসের আনাগোনা। দম বন্ধ হয়ে আসছে কল্যাণের। কিন্তু তৃপ্তি ঘুমোচ্ছে। এলোচুল বালিশের উপর ছড়িয়ে ঘুমনো ওর অভ্যাস। রোজই ঘুমোয়। কি ক'রে যেন বাঁ দিকের এক-গোছা দীর্ঘ চুল বেঁকে এসে কল্যাণের বালিশে পড়েছে। একটু ঘাড় ফেরালেই গালে-কাঁধে শুড়শুড়ি লাগে। অসুবিধা হয়। অবশ্য ইচ্ছে করলেই হাত দিয়ে সরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দেয় না কল্যাণ। চেতনা থেকে অবচেতনায় তলিয়ে যাবার নাম ঘুম। অবচেতন থেকে তৃপ্তির একটা হাত কল্যাণের বুকে উঠে এসে কি যেন বলতে চায়। হয়তো কিছুই চায় না। তবু সযত্নে সেটা রক্ষা করে কল্যাণ। গরম লাগছে। তবুও।

এ অন্ধকার এবং নির্জনতার নাম—সহবাস, দাম্পত্য-জীবন।

এখানে পৃথিবী নেই, সমাজ নেই। সমাজের ন্যায়-নীতি আর হাজার মানুষের কলরব থেকে দূরে আলাদা এ অন্ধকার। এ অন্ধকার আমাদের! দু'জনের! নিজের অজ্ঞাতেই নিজের হাতের মুঠোয় তৃপ্তির একটা হাত তুলে নেয় কল্যাণ। ধীরে ধীরে চাপ দেয়। প্রতিটি আঙুল গুণে দেখে, আংটিটা নাড়ে-চাড়ে ওর হাতের পাতায় নিজের হাতের পাতা ঘষে, আদর করে, আবার অলসভাবে ধ'রে রাখে শুধু।

এত সহজ! গরম লাগছে! বুক থেকে তৃপ্তির হাতটা নামিয়ে রাখল কল্যাণ। তৃপ্তির শরীরে ভালো ক'রে লেপটা তুলে দিয়ে নিজে বসল। আস্তে আস্তে নেমে দাঁড়াল খাট থেকে। অন্ধকারেই হেঁটে গিয়ে টেবিল হাতড়ে খুঁজে নিলো সিগারেটের প্যাকেটটা। দেশলাইটাও। খিল খুলল দক্ষিণের দরজায়। ঘরে এসে ঢুকল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। যেন বাইরেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল গায়ের উপর। চাদরটা খুঁজে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। ঝোলানো বারান্দার রেলিং-এ। দুপুর-রাতের কলকাতা। ঘরে ঘরে অন্ধকার, নিঃঝুম। রাস্তায় অনাবশ্যক আলো। ফাঁকা। স্নেক-ল্যাডার বোর্ডের মতো আঁকা-বাঁকা গলির পথ। কোথাও কিছু নেই। জানলা-গলানো তরকারির কুঁচি পড়েছে রাস্তার ধারে। কালো, রোগা, নোংরা আর কুৎসিত একটা ন্যাড়া কুকুর কি যেন শুঁকছে। ও পাশের লাইট-পোস্ট থেকে তীব্র আলো দরজা খোলা পেয়ে হানা দিয়েছে ঘরে। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ জেগে এত আলো দেখলে হয়তো ভয় পাবে তৃপ্তি। পিছনের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। চাদরটা ভালো ক'রে জড়িয়ে নিলো গায়ে।

অথচ এই তৃপ্তির জন্যই মনের মধ্যে কী ভীষণ রকম যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম এক সময়। ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারের গোড়াতেই ওর উপর চোখ পড়ে সকলের। ছাত্রীরা ঈর্ষায় তাকাল, ছেলেরা নাম দিলো হরেক-

রকম। ছাত্র-ফেডারেশানের নেত্রী, মোটামুটি ভালো অনার্স-পাওয়া ছাত্রী, চাল-চলনে, কথায়-বার্তায় স্মার্ট। শুধু বাংলা-ডিপার্টমেণ্টের মধ্যেই নয়, অল্পদিনের মধ্যে স্টুডেণ্টস্‌-ইউনিয়নের মারফত গোটা ইউনিভারসিটিতেই সব ছেলে-মেয়ের মধ্যে নিজে এক হয়ে মিশে গেলো। পরিচয় রইল সকলের সঙ্গে, কিন্তু যে সব ছাত্ররা এক পড়াশুনা ছাড়া আরও অনেক কিছু নিয়ে জড়িয়ে থাকত তারাই শুধু বন্ধু হলো ওর। ছাত্র-আন্দোলনের নেতা, তরুণ কবি-লেখক, শৌখিন নাট্যামোদী, ডিবেটর। আজও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার এতদিন পরেও, তারাই ওর বন্ধু। তাদের নিয়েই দিন কাটে। কিন্তু—

সিগারেটে একটা টান দিলো—ধোঁয়া ওড়াল কল্যাণ। বাতাসের ধাক্কায় জমাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী এলোমেলো হয়ে ফিরে এসে ছড়িয়ে পড়ল চোখে-মুখে। কিন্তু এই মহিলার জন্যই সেদিন মনের মধ্যে অসহ্য দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা চাষ করেছি বুকের ভিতর। রূপে সাধারণ, খুবই সাধারণ, তবু কি যেন একটা ছিল। ওই একটা কিছুর জন্যই সবাই ওর বন্ধুত্ব চেয়েছিল। মিথ্যে স্তাবকতা করেনি কেউ, ভালবেসেছিল। আশিস, সুনীল, অমিত, অরুণ, প্রবীর, লোকেন—এবং অনেকে। পরিস্থিতি বুঝে তৃপ্তিও সচেতন হলো। দলের মধ্যে একা রইল না আর, নিয়ে এলো আরও অনেককে—বিনতা, শোভা, শোভনা, শ্যামলী, অঞ্জলি, অনুরাধা আর উমাকে। যখন নাম ধ'রে ডাকতে শুরু করল তখন সকলেই একসঙ্গে 'বাবু' সম্মান হারাল, যখন আপনি থেকে নেমে এলো তখন সকলেই একসঙ্গে 'তুমি'।

গলির স্তব্ধতা রাত দুপুরে নাড়া খেলো হঠাৎ। শূন্য চীনে-মাটির বাসনে চামচে নাড়ার শব্দ। একটা রিকশা এগিয়ে আসছে এদিকে। হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে। শেষ টান শুষে নিয়ে ওটা হাত থেকে আলতো ক'রে নীচে ছেড়ে দিলো কল্যাণ।

দোতলার রেলিং থেকে রাস্তার গিয়ে পড়ল। শেষ আগুনটুকু নিভে যাওয়া দেখতে-দেখতে চোখ গেলো অন্যদিকে। ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির দরজায় এসে থামল রিকশাটা। আর দোতলার জানলায় জ্ব'লে উঠল আলো। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের এক অতিকায় প্রৌঢ় মদ খেয়ে ঢুলছে। রিকশার গোটা সিট্‌টা জুড়ে বসেছে। দেহপুষ্ট বিরাট এবং ভারি হাত দুটো ছড়িয়ে পড়েছে দুদিকে। মাথাটা ঢ'লে পড়েছে পিছনে। রিকশাটা থামবার পরেও নড়তে পারছে না, নামতে পারছে না। অক্ষম বাঁ-হাত নাড়তে চেষ্টা ক'রে, মাথাটার টাল সামলাতে সামলাতে—চিৎকার ক'রে অকথ্য আর অশ্রাব্য ভাষায় হুমকি দিতে চেষ্টা করল রিকশওয়ালাকে। কিন্তু জড়ানো ভাষায় বোঝা গেলো না বাক্যটা পুরোপুরি কি। এবং তখনই সদর দরজা খুলে গেলো। বেরিয়ে এলেন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের এক মহিলা। রিকশার দাম মেটালেন। যেন কত দিতে হবে তার জানা। রিকশাওয়ালার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভদ্রলোককে নামালেন। টানতে-টানতে, হোঁচট খেতে-খেতে নিয়ে গেলেন ভিতরে। রিকশাওয়ালাও খালি পথে দেহাতি সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আপন পথে চ'লে গেলো। কল্যাণ শুনল, ওদিকে সদর দরজাটাও সশব্দে বন্ধ হলো। এবং এখনও শুনতে পেলো, জানোয়ারের মতো চিৎকার ক'রে চলেছে লোকটা। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। এর পরেরটুকুও কল্যাণ জানে। ঐ পাড়ার সবাই জানে। ভদ্রলোকের গর্জন আর শোনা যাবে না। এর পরে ওই ভদ্রমহিলার একটানা গোঙানির শব্দ ভেসে আসবে দূর থেকে। ঐ বুড়ো বয়সেও বৌকে মারে লোকটা। রোজ মারে, রোজ মদ খায়।

বিলাসবাবুকে নিয়ে ঐ পাড়ায় অনেক কানাকানি হয়, অনেক কথা। কল্যাণ সেসব হাজার দিন শুনেছে। কিন্তু বিলাসবাবু নিজে নির্বিকার মিথ্যা অপবাদ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ইহলোকের সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হ'তে রাজি নন্। স্ত্রীটিও স্বামীর

যথার্থ সহচরী। এত জঘন্য অত্যাচার আর অশ্লীল লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও ভাবছেন—'পতি পরম গুরু।' বড়ো মেয়ে দুটির বিয়ে হয়েছে। আরেকটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে আছে ঘরে। সাত-আটটি ছেলেমেয়ের মধ্যে বড়ো ছেলেটির বয়স খুব কম হলেও পঁচিশ। পাড়ার রকে ব'সে আড্ডা মারে। মড়া পোড়াতে শ্মশানে যায়, বৎসরে তিন মাস অন্তর পূজোর চাঁদা তোলে, রাস্তায় টেনিস বলে ফুটবল খেলে—ইত্যাদি কোন কাজই যদি না থাকে তবে একটু 'শিভালরি'র প্রকাশ ঘটে পাড়ায় কি বড়ো রাস্তায় সোডার বোতলে অথবা লাঠি-ছুরিতে। এদের নিয়ে সংসার এবং এদের সামনে স্বামীর হাতে মার খেয়েও ভদ্রমহিলা সেই স্বামীর পায়েই মাথা কুটছেন। সারা কপাল জুড়ে ড্যাবড্যাবে সিঁদুরের ছোপ, সামনের দিকে চুল উঠে যাচ্ছে দেখেও সারা সিঁথি ভ'রে সিঁদুর ছড়ান। মার খেয়ে পিঠের চামড়া উঠে যাক, চুল উঠছে উঠুক—তবু স্বামীর পরমায়ু হোক।

জঘন্য বর্বরতা। ইতরতা। লোকটাব মুখের দিকে তাকালেই সাবা শরীর জ্ব'লে ওঠে। গায়ের চাদরটা একটু গুছিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল কল্যাণ। ঠাণ্ডা লাগছে। এবারে ঘরে যাওয়া দরকার। তৃপ্তি ঘুমোচ্ছে। কল্যাণ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল।

তৃপ্তি সিঁদুর দেয় না কপালে, সিঁথিতে ছোঁয়। হাতে শাঁখা নেই। বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের পর কল্যাণই একদিন বলেছিল—'যে বিয়েতে সানাই বাজল না, শাঁখ বাজল না, উলুধ্বনি হলো না, সেখানে প্রথা মেনে লাভ?'

কিন্তু অতটা পারেনি তৃপ্তি। অন্তত সিঁথিতে সিঁদুরের স্পর্শ রাখতে হয়েছে। সমাজ আছে, কলেজ আছে, গুরুজন সহকর্মিণী আছেন, ছাত্রীরা আছে। কল্যাণের মনে পড়ল, সেদিন ঠিকই বলেছিল তৃপ্তি—'বাসর-ঘরের রোমান্সটা মাঠে মারা গেলো আমাদের। বিয়ে তো নয়, যেন বিদ্রোহ করলাম।'

বিদ্রোহ করেননি বিলাসবাবুর স্ত্রী। বাসর-ঘরের স্বাদ পেয়ে সারাজীবন শুধু বন্যার মতো সন্তানের জন্ম দিয়ে দিয়ে নিজেকে রক্তহীন করলেন। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে ভাবছেন— নিয়তি। এই হয়। বিধির ইচ্ছা। তবু পতিব্রতা। অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যেও স্বামীর অনুগত। ওই সংসারে ভালোবাসার আরেক অর্থ, দাম্পত্যের আরেক সংজ্ঞা।

ভাবতে-ভাবতে নিজেকে আবার অন্ধকারে আড়াল করল কল্যাণ। দরজটা বন্ধ ক'রে দিলো। আলো জ্বাললে ঐ অন্ধকার থাকবে না। তৃপ্তি স্পষ্ট হবে। সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েও কি ভেবে হাতটা সরিয়ে নিলো। প্রচুর আলোর মধ্যে ঘুমন্ত তৃপ্তিকে দেখলে কল্যাণের মধ্যেও যেন একটা বিলাসবাবু চাড়া দিয়ে ওঠে। তাকে বাধা দিতে পারে না কল্যাণ। অসহায়ের মতো লুটনো শরীরটা ওর নেশা ধরায়, ওকে মাতাল করে। কেন না, সেটাও নারীদেহ, ওর স্ত্রীর শরীর।

কিন্তু তৃপ্তি অধ্যাপিকা। বাইরের জগতে অনেক সম্ভ্রম, অনেক মর্যাদা। বিলাসবাবুর মতো হাতের থাবা বাড়ালেই চলবে না সেখানে। আরও ভেবে এগোতে হবে।

কিন্তু কেন, অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে-হাতড়ে গায়ের চাদরটা খুলে চেয়ারের পিঠে রাখল কল্যাণ। সেই একই প্রশ্ন অথবা একই অস্বস্তি জেগে উঠছে ভিতরে ভিতরে। একটি পুরুষ এবং একটি নারীর মিলনে ঐ অন্ধকারের ঘনিষ্ঠতা আরও নিবিড় হ'তে আরও কত সময় লাগে, কতদিন? দেড় মাস কি খুব কম সময়? যদি পাঁচ বছরের সুদীর্ঘ প্রণয়ের ইতিহাস মিথ্যে না হয়। নিজের দাবিটা একবার মেটাতে পারলে ঐ অন্ধকারের প্রহসন ভাঙবে। হয়তো তৃপ্তির প্রত্যাশা মিটবে। মিটবেই। এটাও নিয়ম। এটাও প্রথা। এই প্রথা চিরকালের। এখানে বিদ্রোহ নেই।

কল্যাণ শয্যার দিকে এগলো।

তিন

ভোরে ঘুম ভাঙতেই রাতটাকে মনে পড়ল। হাসি পেলো তৃপ্তির। খুব আলতোভাবে আস্তে আস্তে কল্যাণের হাতটা সরিয়ে দিলো বুকের উপর থেকে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসল খাটের উপর। ফিরে তাকাল কল্যাণের দিকে। অসহায়ের মতো বালিশে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে কল্যাণ। খুব আপন মানুষকে ঐভাবে ঘুমোতে দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। ভালো লাগে দেখতে। কত নিরীহ মনে হয়, কত ভালো মানুষ। এক পলকে তাকিয়ে রইল তৃপ্তি। দিনের পর দিন দেখতে হয় যাকে। শরীরে শরীর জড়িয়ে যাকে জানতে হয় রোজ; কোন কোন মুহূর্তে যেন প্রথম দেখার মতো নতুন মনে হয়। নেশার ঘোর লাগে সে দেখায়।

এত তোমার ভয় কল্যাণ? ছিঃ, তুমি না পুরুষ! নিজের অধিকারের উপর হাত বাড়িয়ে বলতে পারো না—এ আমার দাবি, আমার অধিকার। খুব নরম হাতে কল্যাণের গায়ে হাত বুললো তৃপ্তি। ওর চুলে আঙুল ডুবিয়ে ভালো লাগল। কোমরের নীচ থেকে জড়ো করা লেপটা বুক পর্যন্ত তুলে দিলো। ভুলে গেলো বাইরে ভোর হয়েছে এখন। নিধুর-মা এখনই এসে কড়া নাড়বে দরজায়। কল্যাণের উপর ঝুঁকে প'ড়ে মুখটা নামাল। দুহাতে জড়িয়ে ঝাকুঁনি দিয়ে কল্যাণকে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। কী এক ছেলেমানুষি ভালো লাগায় পাগলামি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। হাসি পেলো তৃপ্তির। কাল রাতে এত ভয় পেয়েছিল মানুষটা। অথচ এই মানুষটাই তো সেদিন কত সহজে সোজাসুজি চোখ তুলে প্রস্তাব করেছিল। ভালোবাসার স্বীকৃতি, বিয়ের প্রস্তাব। যা কেউ পারেনি। অমিত না, বিভাস না, প্রবীর না—কেউ না।

লোকেন এগিয়ে এসে অপমানিত হয়েছিল। কিন্তু কল্যাণ পেরেছিল। সেদিন ভীষণ ভালো লেগেছিল কল্যাণকে। আর কাল রাতে—একটা প্রচ্ছন্ন হাসির রেশ কেমন একটা মাদকতা ছড়াচ্ছে শরীরে আর রক্তে। হাঁটুর নীচের শাড়ি আর কাঁধের আঁচল গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মেঝের উপর। ছোটো একটা হাই উঠল। এলোমোলো চুলগুলোর উপর হাত বুলোতে-বুলোতে এগিয়ে গেলো ঘরের কোণে। জানলা দুটো খুলে দিলো। ফুরফুরে হাওয়া ঢুকল ঘরে। হাওয়া আর আলো। দরজাটা খুলে বারান্দায় এলো। ঝুঁকে দাঁড়াল রেলিং-এর উপর। ওপাশের মুদি দোকানটার দরজা খুলেছে মাত্র। পশার শুরু হয়নি। তেলে-ভাজা দোকানটায় ভিড়। গলির মোড়ে জলের কলে স্নান করছে একটা লোক। দু-চারজন দাঁড়িয়ে আছে আশেপাশে। কেউ গামছা প'রে অসভ্যের মতো। কেউ লুঙ্গি প'রে, মুখে দাঁতন। উল্টোদিকের বাড়ির বুড়িটা গঙ্গা স্নান ক'রে ফিরছে। সঙ্গে সাত-আট বৎসরের ছেলেটা। বুড়ি রোজই শেষরাতে গঙ্গায় যায়। যেতে কোনদিনই দেখেনি তৃপ্তি তবে ফিরতে দেখেছে অনেকদিন। পরনে চওড়া লাল পাড় সেই গরদের শাড়ি, হাতে এক ঘটি জল। গঙ্গার জল। পুণ্য নিয়ে ফিরলেন। পুণ্য না ছাই। ভণ্ডামি। কি জানি কেন, ও বাড়ির জানলাগুলোর দিকে তাকালেও কেমন যেন বিশ্রী লাগে। স্বামীটা একটা বেহুঁশ মাতাল, চরিত্রহীন, লম্পট। প্রায় পঞ্চান্ন-ষাট বছরের ওই বেসামাল বুড়োটার হাতে নাকি বেদম মার খায় বুড়িটা। ওই মার খাওয়া অবশ্য কোনদিন দেখেনি তৃপ্তি, তবে কান্না শুনেছে। রাত দুপুরে কান্না শুনে কোন কোন দিন বারন্দায় আসতে চেয়েছে, কিন্তু জোর ক'রে বাধা দিয়েছে কল্যাণ। সব দোষই তো ওই বুড়ির। দোষ নয় তো কি? সাতটা না আটটা ছেলেমেয়ের মা হয়েও শখ মেটে না। গাদাগাদি ক'রে দুটো ঘর নিয়ে থাকে। নোংরা, বিদঘুটে, বিশ্রী।

নিজের ঘর সামলাতে পারে না। আবার পাড়ার এঘর-ওঘর নিয়ে নিন্দা রটায়। নিধুর মা পাড়ার সব খবর রাখে। ওর কথাটা যদি সত্যি হয়। ছিঃ······

অথচ ওই বাড়িরই দোতলার জানলায় মেয়েটা এসে দাঁড়ায়। ওই বুড়িরই মেয়ে। বিশ্বাস হয় না। কেমন শান্ত করুণ। উনিশ-কুড়ি বয়েসের ওই সময়টা একদিন তৃপ্তিরও ছিলো। কিন্তু ওই বয়েসে অমন জুড়িয়ে যায়নি তৃপ্তি, বোবা হয়ে যায়নি। কি দুঃখ ওর, কতটুকু দুঃখ। ওই তো বাপ-মা। ওদের হাতে প'ড়ে একটা কাঁচা বয়সের মেয়ে যদি পুড়ে-পুড়ে ঝলশে যায়, আর সেই পোড় খাওয়া মেয়েটাকে যদি দিনের পর দিন দেখতে হয় তবে নিজের কথা ভাবতে ইচ্ছা করে। ওই বয়সে আমি কি চেয়েছিলাম। কি ভাবতাম। যা চেয়েছিলাম তা কি পেয়েছি? আমি কি সুখী? বুড়িটা নিজের বাড়ির ভিতরে চ'লে গেলো। তৃপ্তি স্বস্তি পেলো যেন। দোতলার জানলার দিকে তাকালো। মেয়েটা এখনও এসে দাঁড়ায়নি সেখানে। চোখে পড়ল দেয়ালে টাঙানো একটা রাম-কৃষ্ণের ফোটো, পেরেকে ঝোলানো একটা বড়ো রেন্-কোট। মনে হয় গলায় ফাঁসি দিয়ে ফাঁসী-কাঠে ঝুলছে একটা মানুষ। বিরক্ত হয়ে তৃপ্তি নিজেও ঘরে ফিরে এলো। কল্যাণ ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবে। শিয়রে চায়ের কাপ রেখে ডাক না দিলে ও কোনদিন জাগে না। আজও জাগবে না। টুথ ব্রাশে পেস্ট ছুঁইয়ে, পায়ের তলায় রবারের শ্লিপারটা টেনে নিয়ে বাইরে এলো তৃপ্তি। রান্না-ঘরের দরজায় উঁকি দিতে গিয়ে পিছিয়ে এলো। ভীষণ ধোঁয়া।

'তোমার উনুন ধরল নিধুর মা?'

'এখ্খুনি ধরবে কি গো। সবে তো আগুন দিলুম। যাও না, তুমি যাও। চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো। আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি ব'লে।'

'আর শোনো নিধুর মা। বাজারে যাবার সময় আমার কাপড়গুলি

নিয়ে যেয়ো তো। পথে লণ্ড্রিতে দিয়ে যাবে। কাল রাত্তিরে বলতে ভুলে গেছি।'

'শোনো কথা'—ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘর থেকে একটা অদৃশ্য মানুষের গলা শোনা গেলো—'হাটের পথ ইদিকে আর লণ্ড্রি হলো গে উদিকে। কাজের হাত। সময় কোথা আমার।'

'আহা হবে, হবে। যেয়ো না একবার। আজ রোববার। ধীরে-সুস্থে কাজ ক'রো। কোনো তাড়া নেই। বলতে-বলতে তরতর ক'রে সিড়ি ভেঙে নেমে গেলো তৃপ্তি। নীচের তলায় বাথরুম। চায়ের পাট চুকে যাবার পর কল্যাণ বসলো ওর সিগারেট আর অফিসেব ফাইল নিয়ে। নিধুর-মা রইল রান্না ঘরে। বাকশো থেকে বাজারেব টাকা বের করল তৃপ্তি। আলনা থেকে, ব্র্যাকেট থেকে টেনে-টেনে কাপড়ের স্তূপ করল মেঝের উপর। তিনটে শাড়ি, দুটো সাধাবণ, একটা আড়ং ধোলাই। তিনটে ব্লাউজ। তিনটেই সিল্ক। একটু সাবধানে ধুতে বলতে হবে। ওগুলোও আড়ং। দুটো শায়া। তিনটে ধুতি, তিনটে পাঞ্জাবি। চোখে পড়ল হ্যাঙ্গারে ঝোলানো পাঞ্জাবিটার ওপর। কাল পর্যন্ত কল্যাণ সেটা প'রে অফিস করেছে। ছি, ছি এতো নোংরা জামা প'রে বাইরে বেরোয় কেউ? বলবে কি লোকে? নিজের জামা-কাপড়টা নিতান্ত চলনসই ফর্সা কিনা সেটুকুও দেখতে পারে না নিজে। ধমকাবে ব'লে তৃপ্তি কড়া চোখে তাকালো। ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখছে কল্যাণ। বাঁ হাতে সিগারেট পুড়ছে। সকাল থেকে একটিও কথা বলেনি। চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে বারবার চোখ ফিরিয়েছে। তৃপ্তি হাসল। কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। হ্যাঙার থেকে পাঞ্জাবিটা টেনে নিলো। ওটাও দিতে হবে। পকেটে হাত দিলো। বের হলো ডান পকেট থেকে একটা রুমাল, বাঁ পকেট থেকে একটা ছোটো ডায়েরি, কিছু খুচরো কাগজ আর গোটা কয়েক ট্রাম আর বাসের টিকিট। আর—

পাঞ্জাবিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে জানলার কাছে এগিয়ে এলো তৃপ্তি। ভালো ক'রে লক্ষ্য করল। তুটো কাগজ। লাল, সিনেমার টিকিট। কাউন্টার পার্ট নয়, পুরো। মেট্রো। মেট্রো, 'কুইন ক্রিশ্চানা,' আমি, প্রণব, আমি—

ভিতরে ভিতরে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলো। কল্যাণের দিকে তাকালো। কি যেন লিখছে কল্যাণ। একমনে লিখে চলেছে।

'এগুলো কার?' তৃপ্তি সামনে এসে দাঁড়াল।

'কোথায় পেলে তুমি?'

'পকেটে।'

'আমার পকেটে যখন, নিশ্চয়ই আর কারও নয়।'

'গেলে না কেন? টাকাগুলি নষ্ট হলো তো।'

'তুঃখটা কেন? আমি গেলাম না ব'লে, না আমার টাকাগুলো নষ্ট হলো ব'লে?'

'মানে?'

'মানে—' কল্যাণ চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে হাসল—'যাবো ব'লেই কিনেছিলাম। ঘরে এসে কেমন ভালো লাগল না। গেলাম না। দাও, ফেলে দাও।'

তৃপ্তির হাত থেকে নিজেই টিকিট তুটো কেড়ে নিলো কল্যাণ। উল্টেপাল্টে দেখল একটু। যেন 'প্রাইজ উইনারসে'র তালিকায় নাম্বার খুঁজে না পাওয়া লটারির বাতিল টিকিট। বড়োরকমের একটা বাজি হেরে যাবার। হাসতে-হাসতেই কুঁচিকুঁচি ক'রে ছিঁড়ে গুঁজে দিলো 'অ্যাশ্‌ট্রে'র গর্তে। তৃপ্তি দেখল। বলল না কিছু। বলার কিছুই নেই। ফিরে এলো নিজের কাজে। রান্নাঘরের কাজ সেরে নিধুর মা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এমনি হয়। কত সামান্য ঘটনাই কত বড়ো হয়ে ওঠে মধ্যে-মধ্যে। সামান্য আড়াইটা টাকা। কিছুই নয় তেমন। যা অনায়াসেই তু'জনে উড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু ওড়ানো যায় না।

নিধুর মা চ'লে যাবার পর রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল তৃপ্তি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বড়ো খারাপ লাগছে মনটা। কল্যাণ কি সত্যি খুব ক্ষুব্ধ? ঘরে ফিরে এসে এভাবে নিজের কেনা টিকিট নষ্ট হতে দেখলে আমিও কি ক্ষুণ্ণ হতাম? গলির ওধারের মুদি-দোকানটার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি ভাবলো। কী চায় স্পষ্ট ক'রে বলে না কেন মানুষটা? না বললে কি ক'রে বুঝব আমি? কি ক'রে খুশি রাখব ওকে! ওবাড়ির জানলায় সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালো। উনিশ কি কুড়ি বছরের কাঁচা মেয়ে। তৃপ্তি তাকালো। মেয়েটি স'রে গেলো। ওবাড়ির সংসারে কিন্তু এসব সমস্যা নেই। তৃপ্তির মনে হলো—ওই বুড়ি সব বুঝেছে। বিলাসবাবু বৌকে মানুষ ভাবে না। বৌটাও প্রতিবাদ করে না। নির্বিচারে মেনে নেয়। রাত্রে মার খেয়ে কাঁদে, সকালে পোয়াটাক ট্যাংরা নয় তো চিংড়িমাছ, গোটাকয়েক আলু, বেগুন পেলেই খুশি। কোনদিন ভাগ্যক্রমে একটা রুই, নয়তো ইলিশ, নয়তো আস্ত কোন মাছ এসে পড়লে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চারদিকের গিন্নিদের শোনায়—স্বামী তার কত দিলখোলা মানুষ। কত অল্পে খুশি হয় ওরা। কত অল্পে তৃপ্তির মন ভাঙে। কিন্তু দোষ কি শুধু ওর একার? একটা দীর্ঘশ্বাসে বুকের পাঁজরে টান পড়ে। তৃপ্তি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ঘরে ফিরে এলো। কল্যাণ ফাইল ঘাটছে। মন দিলো না সেদিকে। টেবিল থেকে পত্রিকাটা তুলে নিলো। খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস ওর নেই। কি থাকে কাগজে? রাশিয়া, আমেরিকা, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা— বিরক্তিকর রাজনীতি, কর্মখালি, পাত্র-পাত্রী, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ হরেক বিজ্ঞাপন, খেলা, সিনেমা, আবোল-তাবোল যত কিছু। কী হয় ওসব পড়ে? রোজ অনায়াসে এ কাজটুকু এড়িয়ে যায় তৃপ্তি। অথচ এরই জন্য কল্যাণ দিনরাত খেটে মরে। এরই মধ্যে নাকি ওর পেশা, নেশা, চাকরি, ক্যারিয়ার। খাটের উপর গা ছড়িয়ে কাগজটা নাড়াচাড়া ক'রে ফেলে দিলো

না। আজ রবিবার। সাহিত্য-ক্রোড়পত্র আজকের আকর্ষণ। একটা ছোটোগল্প পড়ায় মন দিলো। পড়তে-পড়তে হাসি পেলো। একজন প্রবীণ লেখকের গল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেম। লেখকটি হয়তো এম-এ পড়েছেন, কিন্তু প্রেমে পড়েননি ঠিক। পড়লে প্রেমের গল্প লিখতেন না। অন্তত এ গল্প তো নয়ই। কাগজটা ফেলে দিয়ে উঠে বসল তৃপ্তি। ঐজন্যেই রবিবারটা বিশ্রী। কিছুই করার থাকে না। বড়ো একা মনে হয়। রান্নাঘরের কাজ নিধুর মার একার। দু'জনের সংসারে কীইবা আর কাজ। টুকিটাকি একটু হাত নাড়লেই সবকাজ ফুরিয়ে যায়। নীচে গেলে হয় না? সুন্দরীদির কাছে। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।

চার

বছর তিনেকের ছেলেটাকে দুধ-ভাত খাওয়াচ্ছিলেন সুন্দরীদি। উলঙ্গ ছেলেটা মেঝের ওপর লেপটে ব'সে আছে। সামনে একবাটি-মাখা ভাত। মুড়ির টিনে মুড়ি ঠাসার মতো ছেলেটার মুখে ভাত ঠেলছেন সুন্দরীদি। তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, পাল্লা দিয়ে কাঁদছে ছেলেটা। সারা গায়ে কোথাও ভাত, কোথাও দুধ গড়াচ্ছে। বোধহয় এখনই মার হাতে কিল খেয়েছে একটা। পিঠে হাত দিয়ে ভ্যাঁ ক'রে কাঁদছে। ঘরে ঢুকেই তৃপ্তি হাসল। হেসে বলল—'কি সুন্দরীদি, ছেলেকে মারছেন কেন অতো। খেতে চাইছে না বুঝি? কিরে ভোলা পড়তে বললেও কাঁদবি, খেতে বললেও কাঁদবি। খেয়ে-দেয়ে ওপরে চল। সেদিনের মতো চকোলেট দেবো।'

কান্নার স্বরটা আচমকা খাদে নেমে এলো। ছেলেটা হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল তৃপ্তি মাসির দিকে। ছেলের জ্বালায় বিরক্ত ছিলেন

সুন্দরীবালা। হঠাৎ তৃপ্তিকে দেখে হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না পুরোপুরি। কেমন গম্ভীর হয়ে বললেন—'এই যে, এসো এসো ভাই। বোসো। দেখ না, কি এক হাড়-জ্বালানি গুষ্ঠি নিয়ে পড়েছি। আহা, পোলা তো না, যেন গভ্ভে এসে আমায় উদ্ধার করেছেন। নে গেল্, গেল্ বলছি। হাঁ কর—'

বলতে-বলতেই মস্ত একটা গ্রাস ছেলেটার মুখে পুরে দিলেন। ছেলেটা সবটাই হাঁ ক'রে গিল্তে চাইল কিন্তু পেটটা ওর বড়ো, মুখটা ছোটো। দুদিক থেকে দুধ আর ভাত গড়িয়ে পড়ল। দুহাতে ভাতগুলো চটকেছেন সুন্দরীবালা। তার গোটা হাত ভ'রে আছে সেগুলো। ছেলেটার মুখে-গালে-শরীরে মেঝের চারদিকে এঁটোভাত ছড়ানো-ছিটনো। সমস্ত দৃশ্যটাই বড়ো নোংরা, বড়ো বিশ্রী লাগছিল তৃপ্তির কাছে। তবু মুখে কিছু না ব'লে পিঁড়ি টেনে বসল।

'আহা মাটিতে বসছ কেন। ওপরে বোসো না। ওই খাটে।'

খাট মানে একসঙ্গে জোড়া লাগানো দুটো ছোটো ছোটো তক্তপোশ। ইঁটের ওপর ইট দিয়ে আরও উঁচু করা। ওপরে ওরা স্বামী-স্ত্রী ঘুমোয়, নীচে বাচ্চাগুলো। অত উঁচুতে বসতে অসুবিধা হয় তৃপ্তির। বলল—'না, এই তো বেশ আছি। এখানেই ভালো। এবার আপনাদের খবর বলুন।'

'আমাদের আবার খবর। বাটির ধারে হাত চেঁছে আরেক গ্রাস ভাত ছেলের মুখে তুলে সুন্দরীবালা বললেন--'আমরা ভাই সেকেলে বৌ-ঝি। আজ পনেরো-বিশ বছর ধরে এক নাগাড়ে এই ঘানি টানছি। রান্নাবান্না করি, ঘর সামলাই আর বছরে-বছরে এমনি একটা ক'রে কুষ্মাণ্ড বিয়োই। শাড়ি-গয়না প'রে রাস্তায় বেরোতে পারলে ভাগ্যি মনে করি। আমরা আর কি নতুন খবর দেবো তোমাদের। বলো—'

সুন্দরীদি একটু অশ্লীল। মুখের লাগাম নেই। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যায় কিনা ভাবছিল তৃপ্তি। কিন্তু আগেই সুন্দরীবালা আবার

ব'লে উঠলেন—'তোমরা হলে গে একালের মেয়ে। চার-চারটে পাশ করা বৌ। তোমরা দুজনটিতে চুপচাপ, একলা বেশ আছ। যখন খুশি, যেমন খুশি আসছ-যাচ্ছ, চলছ-ফিরছ। কেউ মাথায় নেই। আমরা তো ভাই বুড়োর সেবা করতে-করতেই মরলাম। সেই পনেরো বছর আগে বৌ হয়ে এসেছিলাম। প্রথম তো শ্বশুর আর বুড়ি শাশুড়ির সেবা, যত্ন-আত্তি করতেই বছর দশেক কেটে গেলো। সোয়ামির দিকে তাকানোর সময় ছিল না। যখন বুড়ো বুড়ি মরলো তখন দেখি উনিও বুড়ো হয়ে গেছেন। আমাদের আবার সাধ আহ্লাদ। তোমাদের এই কাঁচা সোমত্ত বয়স। দেখলেও হিংসে হয়। অমন জোয়ান সুন্দর সোয়ামি…'

'সু…সুন্…সুন্দরীদি, শুনুন—ওই বেলন-চাকিটা নতুন কিনলেন বুঝি'—প্রাণ বাঁচাতে উঠে গেলো তৃপ্তি। দেয়ালে হেলান দেওয়া বেলনটা তুলে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখল। যেন চৌরঙ্গী থেকে নতুন কেনা কাশ্মীরী ক্লোক্। হেসে বলল—'বাঃ, বেশ তো।'

'হ্যাঁ ভাই, অনেকদিন ধরেই তো ওঁকে ব'লে-ব'লে হন্যি হলাম। কাল অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে এলেন! যাই বলো ভাই, উনি জিনিস কিনতে পারেন। ঠিক যেমনটি চাইবে তেমনটি পাবে।'

তৃপ্তি আর কিছু বলল না। মেঘ কেটে গেছে। বেলনটা জায়গা মতো রেখে দিলো। এবার পালাতে হয়। সুন্দরীদি বড়ো বেশি কথা বলেন। অবান্তর-অপ্রাসঙ্গিক, কখনও কখনও অশালীন। ছেলেকে খাওয়ানো শেষ হয়ে গেছে। জায়গাটা মুছে নিয়ে, এঁটো আর ছেলেকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'এসো ভাই, একটু রান্নাঘরে বসি। এতদিন পরে এলে।'

রান্নাঘর মানে বারান্দার পাশে চট্ দিয়ে ঘেরা একটুখানি জায়গা। সুন্দরীদি ছাড়া ওখানে আর কারও ঠাঁই হয় না। ধোঁয়ায় চট্টাও কালি-ঝুলি প'ড়ে জঘন্য হয়েছে। এক কোণে নর্দমার ফুটোটায় ভাতের মাড় শক্ত হয়ে জ'মে আছে, তার সঙ্গে

আলু-পটলের খোশা আর কুঁচো মাছের আঁশ। জল দিয়ে না ধুলে যাবে না। জল দিয়ে ধাক্কা দিলেও সিমেন্ট উঠে যাওয়া মেঝের জায়গায় জায়গায় আটকে থাকবে। দিনের পর দিন আটকে থেকে তুর্গন্ধ ছড়াবে। পচবে। কিন্তু তারই মধ্যে সুন্দরীদি পরিপাটি ক'রে নিপুণ হাতে রান্না করবেন। সব তুর্গন্ধ ছাপিয়ে সেই রান্নার গন্ধ ওপরে যাবে, তৃপ্তি আর কল্যাণ শুঁকবে। শুকনো লঙ্কা-তেজপাতা ভাজার গন্ধ যাবে। ওরা হাঁচবে।

বারান্দাতেই একটা পিঁড়ি পেতে তৃপ্তি বসল। ঘরে গোবর জল ছড়িয়ে এসে সুন্দরীবালাও উনুনের পাশে এসে বসলেন। রান্না শেষ। পড়ন্ত আঁচে একটা বেগুন পোড়াতে হবে। বেগুনের গায়ে তেল মাখাতে-মাখাতে সুন্দরীবালা জিজ্ঞেস করলেন,—'কি গো তৃপ্তি, শ্বশুর-শাশুড়ি কেমন আছেন?'

'কি ক'রে বলব। ঝণ্টু তো প্রায় দিন সাতেক আসেনি। ভালো আছেন নিশ্চয়ই। নইলে খবর পেতাম।'

'তুমি কি আর কোনদিন যাবে না নাকি ওখানে?'

তৃপ্তি জানে এটা ওকে পরোক্ষ আক্রমণ। তবু হাসতে চেষ্টা করল—'কি ক'রে যাই বলুন। সবই তো জানেন। কেন মিছিমিছি ওসব কথা তুলে লজ্জা দিচ্ছেন সুন্দরীদি। ওঁকে তো যেতে বলি। কিন্তু না গেলে আমি কি করব?'

'ওঁকে'—সুন্দরীবালা বাঁকা তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

ঐ হাসির অর্থ তৃপ্তি জানে। প্রথম এ বাড়িতে এসে কল্যাণ প্রসঙ্গে কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নাম ধ'রে ডেকে ফেলেছিল একবার। শুনে ঘাবড়ে গিয়ে জিভ কামড়ে ফেলেছিলেন সুন্দরীদি। তারপর থেকেই এ পরিবেশে এলে তৃপ্তি বড়ো বেশি সচেতন।

আচ্ছা তৃপ্তি, বাপ-মায়ের জন্য তোমার মন কেমন করে না?

তেলমাখা বেগুনটা উনুনের উপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে সুন্দরীবালা বললেন—'শ্বশুর-শাশুড়ি না হয় ছেড়েই দাও। তোমার নিজেরও তো মা-ভাই-বোন আছে। ওদের কথা মনে হয় না, গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে না? কি জানি বাপু, তোমরা হলে গে একালের মেয়ে। তোমাদের হাল ফ্যাশানই আলাদা।'

মনে-মনে বিরক্ত হয়ে উঠছে তৃপ্তি। এজন্যেই এখানে আসতে চায় না বেশি। আগে প্রায়ই আসত। এখন দুমাসে একবার আসে। এখনও এসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে জানলে আজও আসত না। এর চেয়ে ওপরে একা থাকা ভালো। কত আর কৈফিয়ৎ দেবে এদের কাছে। কত বোঝাবে? অনেক দুরূহ তত্ত্বের কথা বোঝানো যায় অল্প বয়সী ছাত্রীদের। কিন্তু অনেক সহজ কথা বোঝানো যায় না সুন্দরীদিদের। এরা বোঝেন না। হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে সুন্দরীদির দিকে তাকিয়ে ছিলো তৃপ্তি। দেখছিল মিলের শস্তা শাড়ি পরনে, গিঁট দিয়ে দারিদ্র্য ঢাকবার চেষ্টা। তাহোক কিন্তু ব্লাউজ পরেন না কেন সুন্দরীদি? কেন বোঝেন না পাঁচ-ছটা সন্তানের মা হলেই খুঁটি-নাটি লজ্জা চ'লে যাবার মতো বয়স এসে যায় না মেয়েদের শরীরে। সুন্দরীদির এ নগ্নতা পীড়িত করছিল ওকে। যদি পরেশবাবু এসে পড়েন হঠাৎ! হোক না স্বামী। তবু এই দুপুর বেলা—

আঁচলটা কখন যেন ভেজা মেঝের ওপর ঢ'লে পড়েছিল। সেটা চোখে পড়তেই টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসল তৃপ্তি—'সেসব পুরোনো কথা আর কেন তুলছেন সুন্দরীদি? অনেকদিনই বলেছি।'

'না ভাই, চারদিকের লোকে নানা কথা বলে কিনা তাই বলছি। লোকে কি আর কল্যাণবাবুকে কিছু বলবে। তোমাকেই দুষবে। বলবে পাশ করা বৌ বিয়ে করলে ..'

'কে বলে? কি বলে তারা?'

'বলার লোকের আর অভাব? চারদিকে এতো লোক। কেন,

ও বাড়ির বিলাসবাবুর ইস্তিরিই তো বলছিল সেদিন। মিত্তিবদের গিন্নিকে বলছিল আমি কান পাতলাম। ওই যে কথায় বলে না ......কি যেন শোলোকটা। ভুলে গেলাম—'

'ভাগ্যিস্ ভুলে গেছেন নইলে আবার কোন অশ্লীল প্রবচন আওড়ে বিব্রত করতেন। তৃপ্তি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ছাই জমেছে পোড়া কয়লায়। ফুঁ দিয়ে কিছুটা আগুন খুঁজে বের করে বেগুনটা গুঁজে দিলেন সুন্দরীদি। মাথা তুললেন। চোখ পিটপিট ক'রে হাতের কব্জি দিয়ে চোখ রগড়ালেন। কাঁধেব বাহুতে কপাল ঘষলেন—নিজে তো একটা পাঁড় মাতালের বৌ। তার ওপর একটা আইবুড়ো সোমত্তা মেয়ে ঘরে রেখে পুষছে। মাগীর না আছে লজ্জা, না কিছু। এখন বুঝুক। ঠেলা সামলাক না দেখি।'

মেয়ের প্রসঙ্গ উঠতে তৃপ্তিরও কৌতূহল চাপল একটু—'কেন সুদরীদি, কি করেছে ওদের মেয়ে? ওই মেয়েটি, ওই যে রোজ জানলায় এসে দাঁড়ায়?'

'হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, নইলে বলছি আর কি? জানলায় দাঁড়ায় না ঘেঁচু। সব বজ্জাতি।'

'কেন, কি করেছে ও?'

'আরে ছি ছি ঘেন্নার কথা। সে আর ব'লো না।'

'তৃপ্তি দ'মে গেলো। বেশি নাড়াচাড়া করতে সাহস পেলো না। হঠাৎ কি বলতে কি ব'লে বসবেন সুন্দরীদি ঠিক নেই। হয়তো উল্টে তৃপ্তিই লজ্জা পেয়ে ছুটে পালাবে। ও পক্ষকে চুপ ক'রে যেতে দেখে সুন্দরীবালাও একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। বেগুনটা একটু উল্টে দিয়ে আবার ফুঁ দিলেন উনুনে। বেগুনের বোঁটাটা ধরে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন—'আর বলো কেন, ওই যে একটা ছোকরা থাকতো ওদের বাড়ি। পিসতুতো ভাই না কি যেন। সত্যি সত্যি ভাই কি না কে জানে। নইলে বোনের সঙ্গে এমন কেলেঙ্কারি।'

'ও মাগো, কী ঘেন্না কী ঘেন্না—'

আঁচলের কোনে চশমার কাচ মুছছিল তৃপ্তি। আচমকা একটা নাড়া খেলো—'কী বলছেন সুন্দরীদি? কী বকছেন যাতা?'

'যা তা বকছি? বেশ তো জিজ্ঞেস করো না কাকে করবে। ডাকো তোমাদের নিধুরমাকে। উনুনের বেগুনটা ফেটে পড়ল। পোড়া ধরেছে। একটু উল্টে দিয়ে ওটা ছেড়ে দিলেন সুন্দরী-বালা। উৎসাহে পিঁড়িটা টেনে নিয়ে এগিয়ে বসলেন—দেখ তৃপ্তি, সবে তো সেদিন বিয়ে হয়েছে। ও সবের তুমি কি বুঝবে? আমরা এসব দেখে-সয়ে এতোটা বয়স পার করলাম। এখন এক নজরে ঠাউরে নিতে পারি। আরে বাপু, তুই তো সেদিনের পুঁচকে ছুঁড়ি। বায়োস্কোপ-থিয়েটারের মতো তোর অতো পেরেম না পিরিত করতে যাওয়া কেন। সেসব করবে তোমাদের মতো লেখাপড়া শেখা পাশ করা মেয়েরা। অতো ঢলাঢলি যখন দেখেছি আমি তখনই জানতাম এমনি একটা কিছু হবে। দেখো সেয়ানা বুড়ি ঠিক সামলে নেবে। কাকপক্ষীও টের পাবে না। ও মাগী, হাড় বজ্জাত। আরে বাপু, আগুন কি চাপা থাকে? এখন ওই নষ্ট চরিত্তিরের মেয়ে বিয়ে দিতে অন্য পাড়ায় যাও।'

বড়ো বিশ্রী লাগছিল তৃপ্তির। বিশ্রী, নোংরা আর অশ্লীল। সুন্দরী-বালার কথা শেষ হতেই একটু সোজা হয়ে বসল। হেসে বলল—'থাক ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে। আমাদের কি। আজ তাহলে উঠি সুন্দরীদি। আরেকদিন আসব।'

'উঠবে? এরই মধ্যে?' আসরটা মাত্র জ'মে উঠেছিল। হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে দেখে কেমন একটু হতাশ হলেন সুন্দরীবালা।

'হ্যাঁ, যাই, আবার আসব।'

'আর এসেছ। ওপরে নীচে থাকি। এই তো কতদিন পরে এলে।'

'সত্যি বিশ্বাস করুন সময় হয় না'—তৃপ্তি হাসল—'সকালে-বিকেলে ঘরের কাজ। দুপুরে কলেজ।'

ওদিকে বেগুনটা ছুঁচো বাজির মতো ফুটছে।' সুন্দরীবালা ঘুরে বসলেন। ওপরে নিজের ঘরে এসে আবার মনে হলো সুন্দরীদির ঘরটা বড়ো নোংরা বড়ো অস্বাস্থ্যকর, সে তুলনায় ওর ঘর স্বর্গ। ঝকঝকে, চকচকে, পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। ওই জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যে সুন্দরীদিও কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছেন জং-ধরা যন্ত্রের মতো। ঘরে ঢুকতেই সামনের বড় আরশিটায় নিজের ছায়া পড়ল। চোখ সরিয়ে নিলো তৃপ্তি। বিছানার বেড কভারটা ঈষৎ গোলাপী, জানলা আর দরজার পর্দাগুলো গেরুয়া। ওগুলো নোংরা হয়ে গেছে। ধুতে দেওয়া দরকার।

কল্যাণ ঘরে নেই। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো, চায়েব খালি কাপ, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। বাইরে যায়নি। গেলে ব'লে যেতো। চেয়ারের পিঠে কল্যাণের গেঞ্জি-চাদর। ওদিকের আল্‌নায় পাশাপাশি তৃপ্তির শাড়ি, কল্যাণের ধুতি। শায়া-ব্লাউজ অন্তর্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধুতি-পাঞ্জাবি আণ্ডার-ওআর। টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো তৃপ্তি। চশমাটা খুলে রাখলো কল্যাণের মোটা ফ্রেমে বাঁধানো বিরাট চশমাটার উপুর। নিজের সরু রোল্ড গোল্ডের চশমা কল্যাণের চশমার ছায়া মনে হয়। সময় দেখতে ড্রয়ার খুললো। চোখে পড়ল কল্যাণের দামী মোটা পেলিকানের গা ঘেঁসে ওর ছোটো লেডিস্ সেফার্স। পুরু চামড়ার ব্যাণ্ডে বাঁধা কল্যাণের হাত-ঘড়িটাকে জড়িয়ে আছে সরু চেনে বাধা ওর ছোটো লেডিস্ ঘড়ি। সাপ আর সাপিনীর মতো। ঠিক নাকি এমনি দেখায় ওদের। ড্রয়ারটা বন্ধ ক'রে স'রে দাঁড়াল। মাত্র নটা পঁয়ত্রিশ। সময় যেন ফুরোয় না আর।

জানলার ওধারে ঝুলোনো বারান্দা। তারপর রাস্তা। রাস্তার ওপারে বিলাসবাবুর সংসার। ওদের জানলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দরীদির কথা কি সত্যি? একটু যেন খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করল তৃপ্তি। বোঝে না। মেয়ে হয়েও মেয়েদের অনেক

কিছুই বোঝে না এখনও। সত্যি যেন একটু কেমন লাগছে মেয়েটিকে। একটু বেশি সুন্দর। একটু ভয় পাওয়া ভাব। একটু গম্ভীর। ওই তো একটুখানি মেয়ে। কোথায় পায় এতো সাহস? কে দেয়? সত্যি কী যেন চাইছে মেয়েটি। এবয়সে সব মেয়েই চায়। তৃপ্তিও চেয়েছিল। চতুর চড়ুই পাখির মতো ছুটে বেড়াবার কিশোরী বয়সটাকে মনে পড়ল হঠাৎ। তখন কলেজ ছিলো তৃপ্তির, অনেক বন্ধু ছিলো, বাইরে একটা পৃথিবী ছিলো। কিন্তু ওর কেউ নেই। ওই মেয়েটির। ও একা। ক্লাসের মেয়েগুলোকে মনে পড়ল। তৃপ্তি যখন খাতা খুলে নাম ডাকে যখন বক্তৃতা দেয়, তখন হাঁ করে ওরা শোনে। ঠিক ওই মেয়েটির মতো, ওই বয়সের মেয়েরা। দু-চারজন ছাড়া আঠারো উনিশ কুড়ি বড়ো-জোর একুশ কি বাইশ হবে যাদের বয়স। ওরা সবাই একা নয়। এতো নিঃসঙ্গ নয়। ওরাও তৃপ্তির মতো। ওরাও চায়। কিন্তু কেমন করে চাইতে হয় তা ওরা জানে। অমন দেউলিয়া হয় না। কিন্তু এই মেয়েটি?

হঠাৎ চাখে চোখ পড়তেই জানলা ছেড়ে চ'লে গেলো মেয়েটি! লজ্জা পেলো তৃপ্তি। আমার চোখে কি কোন সন্দেহ ছিলো? তৃপ্তি ভাবল। ও কি বুঝতে পেরেছে সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আমি সব শুনেছি। বোধহয় উচিত হয়নি ওভাবে তাকিয়ে থাকাটা। ছি, কি ভাবল ও।

তৃপ্তি রান্নাঘরে এলো, বাজার থেকে ফিরে তরকারি কুটতে বসেছে নিধুর মা। উনুনে ভাতের হাঁড়ি।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে গো মা?'

'সুন্দরীদির ঘরে। কেন?'

'বাবু ডাকছিলেন।'

'ডেকে দিলে না কেন, বাবু কোথায়?'

'চান করতে গেলেন যে। তাই তো বললেন।'

'আচ্ছা সরো, আমি কুটনোটা কেটে দিচ্ছি। তুমি বাবুর জন্য

কিছু নিয়ে এসো তো শিগ্‌গির। ভালো সরু চিঁড়ে আর দই। এখন যখন স্নান করতে গেলো বেরোবে নিশ্চয়ই? পয়সা আছে না তোমার কাছে। বাজার থেকে ফেরেনি কিছু?'

'আছে গো আছে। সে তোমায় ভাবতে হবেনি।'

'আসার সময়ে আনা দুয়েকের সোডা কিনে এনো। রাত্তে জামা-কাপড়গুলো সেদ্ধ করতে দিতে হবে।'

পাঁচ

'কী জার্নালিস্ট। কী খবর?'

নাইট ডিউটি। প্রস্তুত হচ্ছিল কল্যাণ। খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট শেষ ক'রে, একটু জিরিয়ে ভাঁজ-ভাঙা নতুন কাপড় বদলাচ্ছিল। মাথা নুয়ে আঙুলের চিরুনি দিয়ে ধুতির কোঁচা আঁচড়াতে-আঁচড়াতে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল—প্রণব।

'আয় বোস্—' একটু তাকিয়ে নিস্পৃহ অভ্যর্থনা জানালো কল্যাণ। বহুদিন পরে দেখা। কিন্তু বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। যেন কাল সন্ধ্যায়ও কোথাও আড্ডা দিয়েছে দুজনে। আজ আসার কথা ছিলো। এসেছে।

প্রণব একটু এপাশে-ওপাশে তাকালো। খুব একটা হৈ-চৈ অভ্যর্থনা পাবার প্রত্যাশা ছিলো না। তবু বন্ধুর এই অনাসক্তি অদ্ভুত লাগলো। হেসেই বলল—'কিরে, গম্ভীর যে। কোথায় যাচ্ছিস।'

'আপিশ।'

'আপিশ? এত রাতে!'

'নাইট ডিউটি।' একটুখানি হাঁটু ভেঙে, দুটো ঠ্যাং ফাঁক ক'রে

কোঁচার কাপড়ে দুদিকে সমতা আনতে একটু বাঁকল কল্যাণ। সোজা হয়ে বলল—'বোস, এই তো এখানে বোস, নয় তো ওই তো চেয়ার।'

খাট থেকে ভাঁজ-করা পাঞ্জাবিটা তুলে নিলো কল্যাণ। চেয়ারেই বসল প্রণব।

'বসে লাভ? তুই তো চ'লে যাচ্ছিস্। অ্যাদ্দিন বাদে এলাম আড্ডা দিতে।'

'তুই এলি ব'লে আমি কাজে যাবো না?'

'তাতে কি রাজ্যের টেলিপ্রিন্টার থেমে থাকবে? একটু না হয় লেট হবি।'

পাঞ্জাবির বোতাম আঁটতে-আঁটতে কল্যাণ স্বভাবে হাসল—'তাতে কি, তুই বোস না। তৃপ্তি আছে, গল্প কর। আমার সত্যি একটু কাজ আছে। ডোণ্ট মাইণ্ড, প্লিজ—'

পাঞ্জাবির হাতায় বোতামগুলো লাগিয়ে, পায়ের তলা থেকে পায়জামাটা খাটের ওপর রেখে টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো কল্যাণ। ড্রয়ার থেকে ঘড়িটা বের ক'রে হাতে বাঁধতে-বাঁধতে বলল—'তুই নাকি বিয়ে করছিস্?'

'ভাবছি।'

'ভাবছি মানে, শুনলাম সব ঠিক।'

'কোথায় শুনলি? তৃপ্তির কাছে?' প্রণব হাসল—'তা, হ্যাঁ—ওদিক থেকে তো কোন আপত্তি নেই। এখন আমার মতামত।'

'কে মেয়েটি?'

'চিনবি না। স্কুল-মিস্ট্রেস, বি-এ, বি-টি।'

'আলাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মা কাল ডেকে এনেছিলেন বাড়িতে। একটু ষড়যন্ত্র ছিলো দু-তরফের। ও জানত না আমি এসেছি।'

'কি রকম দেখতে।'

'নট ব্যাড।'

'মিনতির খবর কি?'

প্রণব সশব্দে হাসল—'নামটা মনে পড়ল তো। জানতাম, পড়বে। কাল মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমারও পড়েছিল। কিন্তু ক্ষতি হয়নি। আদৌ ডিস্‌টার্বড্‌ হইনি। দিব্যি গল্প করেছি ঘণ্টাখানেক। মেয়েটি কিন্তু অদ্ভুত ফ্রি। কোন জড়তা ছিলো না—'

'মিনতি সম্বন্ধেও একদিন এসব মনে হতো না?'

'হতো। কিন্তু আশ্চর্য কি ছাখ, এখন বিলকুল ভুলে গেছি। তখন মনে হতো, মিনতিকে ছাড়া বুঝি চলবে না, আর এখন ওসব অ্যাব্‌সোলিউটলি ফর্‌গট্‌ন্‌। আসলে বুঝলি, ওসব কিছু না। একটু চেষ্টা করলেই সব ভোলা যায়, ইভ্‌ন্‌ লাভ্‌, সিলি সেন্টিমেন্টস্‌।'

কল্যাণ কটাক্ষে তাকাল। মুচকি হাসল—'আমরা সবাই খুব ভোঁতা হয়ে যাচ্ছি, না প্রণব? কখন কি সব আবোল-তাবোল বকি আর ব'কে যাই খেয়াল করি না। অথচ বয়স বাড়ছে, মন পাকা হচ্ছে। স্ত্রী হিসেবে একটি মেয়েকে যে প্রয়োজন সেটা বুঝি, আর সেই প্রয়োজনটা এতো বড়ো যে অন্যান্য কতগুলো 'হাইআর ভ্যালুস'কেও পাত্তা দিতে চাই না।'

'কেন, কি হোল। বোধহয় আমার কথাটা তুই একটু ভুল বুঝেছিস।'

'থাক, সে অন্যদিন হবে। আজ সময় নেই—' কল্যাণ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

—'এখন বিয়ে কর। করতে যখন হবেই, বয়স বাড়িয়ে লাভ কি?'

ঘরে ঢুকল তৃপ্তি। আঁচলে গরমদুধের গ্লাস জড়িয়ে। কোন মতে কোণের ছোট একটা টেবিলের উপর নামিয়ে আঁচলটা পিঠে

ছড়িয়ে হাতে হাত ঘ'ষে ফুঁ দিতে-দিতে ফিরে তাকালো—'কথা রাখলে তা হলে। কখন এসেছ?'

'এই তো একটু আগে।' প্রণব বললো।

'ভাগ্যিস এক্ষুনি এলে। নইলে তোমার বন্ধুতো এই একটু বাদেই বেরিয়ে যেতো—'কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি বললো—'পাঞ্জাবির নীচে গরম গেঞ্জিটা পরেছ তো? শালটা নিয়ে নাও। অফিসে ওটা খুলে রেখো না আবার। জানালার ধারে বোসো না। উঃ, কী ঠাণ্ডা বাইরে।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছে। সব শুনেছি। দাও তো, কি দেবে। দশটা এখানেই বাজলো।' অকারণেই হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো কল্যাণ।

শুধু দুধ নয়, কোণের আলমারি থেকে কি একটা ওষুধের শিশি নিয়ে গেলো তৃপ্তি। কডলিভার-অয়েল, ওআটারবেরিস, কিংবা অন্য কিছু টনিক। প্রণব এককোণে ব'সে তাকিয়ে রইলো। চামচে মেপে দুধের সঙ্গে ওষুধ মেশাল তৃপ্তি, চামচে দিয়ে নাড়লো, ঘরের কোণ থেকে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিলো এক গ্লাস। দুটো গ্লাসই এগিয়ে দিলো স্বামীর দিকে। কল্যাণ নিঃশেষে পান করলো।

কল্যাণ বললো—'সাবধানে থেকো। জানালাগুলো বন্ধ ক'রে শুয়ো। যাই রে প্রণব। অন্য একদিন আয় না। আজ তো কিছুই কথা হলো না।'

'আর কবে আসব। পরশু তো চ'লে যাচ্ছি। বেটার নেক্সট টাইম।'

'হ্যাঁ, তখন বরযাত্রী যাবো। তোকে আসতে হবে না, আমিই যাব। আচ্ছা চলি—'টেবিল থেকে ফোলিও ব্যাগটা তুলে নিয়ে কল্যাণ আরও একবার স্ত্রীর দিকে তাকালো।

তৃপ্তি বললো—'সাবধানে যেও।'

তৃপ্তি স্বামীকে সদর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে নেমে গেলো নীচে। আবার উঠে এলো একটু পরেই।

'এতো রাত ক'রে এলে। চা খাবে?'

'নাঃ—এই তো খেয়ে এলাম।'

তৃপ্তি এগিয়ে এসে খাটটায় বসতে গিয়ে কল্যাণের ছেড়ে-যাওয়া পায়জামাটা দেখলো। ওটা ভাঁজ ক'রে আলনার দিকে এগোতে এগোতে বললো—'পরশু চ'লে যাচ্ছ, ক'দিন রইলে তা হ'লে।'

'সাতদিন। এখন টেস্ট-ফেস্টের সময়। এখন কি আর বেশি ছুটি পাওয়া যায়।'

'ও'দিক কি হলো। তোমার বিয়ের। কবে, ফাল্গুন না বৈশাখ?'

তৃপ্তির হাসির দিকে তাকিয়ে প্রণব হাসলো—'তা একরকম ঠিক। কবে হবে—সে কি ক'রে বলব। তবে খুব শিগগিরই।'

'বিয়ের কথায় তোমাদের মুখ দেখলে এমন অদ্ভুত লাগে। ভীষণ ছেলেমানুষ।' ব'লেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ার আবেগটা বয়েসের খাতিরে সংযত ক'রে নিলো তৃপ্তি।

'হঠাৎ দিদি সাজতে চাইছ সুযোগ পেয়ে।'

'কেন, চাইব না, হাজার হোক, এ ব্যাপারে কল্যাণ তোমার সিনিঅর তো।'

'হুঁ, সময় মতো কল্যাণের কাছে ট্রেনিং নিতে আসব।'

'কল্যাণের কাছে ট্রেনিং? সে কি। বিয়ে তো করবে একটি মেয়েকে। মেয়েরা কি চায়, কি ভাবে, কি করলে কি বললে—ওরা খুশি হবে সেসব তো আমার কাছ থেকে জেনে নেবে? সুতরাং—' কথাটা শেষ হবার আগেই সমস্বরে হেসে উঠলো দুজনই। হাসির রেশটা একটু থেমে এলে তৃপ্তি বললো—'কি কথাটা হলো কল্যাণের সঙ্গে? বিয়ের কথা বলেছিলে?'

'কি ক'রে আর বলব। এসেই দেখি মুখ গোমড়া ক'রে ধুতি পরছে।'

'ওই দেখো, মুখ গোমড়া ক'রে তো। শিখে নাও। আজ সন্ধ্যে বেলা দুজনে ঝগড়া করেছি। সিরিঅস ঝগড়া। কিছুই না অবশ্য। কিন্তু চুপচাপ ভাল লাগছিল না। তাই সামান্য ছুতোতেই বাধিয়ে দিলাম। সময়টাও কাটল আর, আর—থাক, বাকিটুকু যথা সময়ে বুঝে নেবে। দাম্পত্যজীবনে এ-ও একটা মজা, অদ্ভুত চার্ম।'

বিয়ে নিয়ে কথা হয়েছিল কল্যাণের সঙ্গে। প্রসঙ্গের উল্লেখ এবং একটা তর্কের সূত্রপাত। কিন্তু প্রণব আর এগোল না। আলাপের বিষয়টাকে এদিকে-ওদিকে বাঁক ঘোরাবার চেষ্টা করলো—'বাজে কথা রাখো তো, অন্য কথা বলো। অ্যাদ্দিন বাদে এলাম। এদিককার আর সব খবর কি? সেদিন তো সিনেমাই দেখা হলো, কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'কি খবর চাই তোমার?'

'এই ধরো, পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের খবর। আমাদের সেই কবির খবর কি। দীনেশ? তারপর বিনতা, অঞ্জলি তোমার সেইসব বন্ধুরা। হ্যা, অনুরাধার সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল গড়িয়াহাটার মোড়ে। আমি তো চিনতেই পারিনি। রীতিমত গিন্নিবান্নি মানুষ। সঙ্গে স্বামী ছিলো। আলাপ করিয়ে দিলো ভদ্রলোকের সঙ্গে। কী ভীষণ 'ডাল'। উঃ—কী করেন ভদ্রলোক?'

'শুনেছি তো কাস্টম্‌স্ অফিসার। চাকরি ক'রেই বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে, ফোন আছে, নম্বরটা দিয়েছিল। কাজে লাগেনি অবশ্য কোনদিন। কল্যাণ ওদের বলে—সাক্‌সেস্‌ফুল ওম্যান। টাকাওলা ভেজা-বেড়াল স্বামী। একটা সুখবর শুনেছ, দীপককে মনে আছে। সেই যে ছেলেটা সায়েন্স পড়ত। সুজয়, অমর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ভালো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইত। ও আমেরিকা গেছে। স্টেট স্কলারশিপ পেয়েছে।'

'ও গ্র্যাণ্ড। ইডিঅটটা আমাকে জানালো না একবার। আশিসও

তো গেছে শুনেছি। দীপকের বন্ধু আশিস। মধু অবশ্য লণ্ডন গেছে। যাবার আগে আমাকে চিঠি লিখেছিল।'

'কে মধু?'

'চেনো না? ইকনমিক্‌সের মধুসূদন লাহিড়ী।'

'চিনি। কিন্তু আমার সঙ্গে খুব বেশি আলাপ ছিলো না।'

'আমাদেরই কিছু হলো না। মফস্বল সহর, দুশো-চারশো স্কেলে আটকে থাকব চিরকাল—' চাপা বিক্ষোভে থাকতে না পেরেই যেন এতক্ষণ পরে একটা সিগারেটের প্রয়োজন বোধ করলো প্রণব। পকেটে হাত দিলো। সিগারেটটা জ্বালতে সময় লাগলো একটু। একমুখ ধোঁয়া উড়িয়ে একটা ভুলে-যাওয়া কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে উত্তেজিত হয়ে বললো—'হ্যাঁ, ভালো কথা, অমিতের খবর কি? আমাদের গ্রেট অমিত। আমাদের হিরো, আমাদের লিডার।'

'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা? কেন?

'এই হিরো-লিডার-গ্রেট এতো সব বিশেষণের বহর।'

'না, ছি, আমি এমনি বলেছি। তুমি হঠাৎ ওভাবে নিলে কেন কথাটা। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কিছু দুঃসংবাদ শোনাবে।'

'দুঃসংবাদ! না, না, দুঃসংবাদ আর কি। খবর সব ভালো, সব ভালো—একটা অস্পষ্ট দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্য থেকে যেন কথাগুলো উচ্চারিত হলো তৃপ্তির মুখে। আস্তে আস্তে খাটটার দিকে এগিয়ে গেলো তৃপ্তি। গায়ের ছোটো চাদরটা আরও একটু টেনে নিয়ে বুক-পিঠ ঢেকে বসলো—'অমিত সম্বন্ধে তুমি কিছু শোনোনি?' সত্যি বলছ? তৃপ্তির এ আকস্মিক ভাবান্তরে প্রণব একটু বিচলিত। তৃপ্তির কথা ফুরোবার আগেই কৈফিয়তের সুরে বললো—'বিলিভ মি, কিছু জানি না। কেন, কি হয়েছে ওর?'

' অমিত সুইসাইড করেছিল।'

' সুইসাইড ? কী বলছ তুমি ?'

' সুইসাইড, মানে চেষ্টা পারেনি। সময় মতো স্টেপ নেওয়া গিয়েছিল বলেই রক্ষে।'

'বেঁচে আছে তাহলে ? কোথায় আছে জানো ? ঠিকানা ?'

দেশে। ঝাড়গ্রাম থেকে আটাশ মাইল দূরে। তলিবেড়া গ্রাম। ভীষণ দুর্বল। ওকে ডিস্টার্ব ক'রো না।'

হাতের সিগারেট নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করল প্রণব। মাত্র কয়েকটা টানে এখনও সেটা প্রায় সম্পূর্ণ। কিছুক্ষণ দুজনই নীরব। টেবিলের মাঝখান থেকে অ্যাসট্রেটা টেনে নিয়ে সিগারেটটা ঠুকে ঠুকে আগুন নেভাতে কিছুটা সময় লাগলো। বাঁকিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে ওটা গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রণব তৃপ্তির দিকে তাকালো। তৃপ্তির এ অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যটাই পরিবেশটাকে হঠাৎ কেমন অনর্থক গুমোট ক'রে তুলেছে। কিছুতেই ভেবে পেলো না—এতো মনমরা হবার কি আছে এতে ? কত লোকের তো কত কিছু হয়। কত কারণে মানুষের কত বিপদ ঘটে। না হয় একজন ঘনিষ্ঠ পুরোনো বন্ধুর জীবনে এমনি একটা অঘটন ঘ'টে গেছে। কত বন্ধুকেই তো ভুলেছি। না হয় ভুলব আরও একজনকে। কিন্তু তাই ব'লে আমাদের হাসতে বাধা নেই, সুখী হতে ক্ষতি নেই।

'ফ্রাস্ট্রেশন, বুঝলে তৃপ্তি ফ্রাসট্রেশন। নইলে এই অমিত কী ছিলো। কী বুদ্ধি, কী এনর্জিটিক। পুলিশের গুলিতেও—'

'একটা কথা বলব প্রণব ? রাখবে—'যেন সকরুণ মিনতিতে তৃপ্তি তাকালো।

'বলো।'

'ও সব কথা থাক। লোক-চরিত্র আমি খুব বুঝি না। খুব কেন, কিছুই বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি, তোমার-আমার পক্ষে অমিতকে বোঝান খুব মুস্কিল। ফ্রাসট্রেশন-ট্রাসট্রেশন কিছু শব্দ আওড়ালে

পারো কিন্তু ওতে ওকে সম্মানও দেওয়া হয় না, অপমানও করা হয় না, আবার নিছক সত্য কথাও যে বলা হলো তা-ও নয়। তার চেয়ে অন্য কথা বলো, অন্য যে কোন কথা, যা তোমার খুশি।'

এর পরে বলার মতো কথা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। রাত বাড়ছে। সাড়ে দশটা। প্রণব হাতঘড়ির দিকে তাকালো। কেমন একটু অস্বস্তিও বোধ করলো এর পর ব'সে থাকতে, কথা বলতে।

'কিছু না জেনে বোধহয় তোমাকে একটু আঘাত করলাম তৃপ্তি?'

'আঘাত! কেন, কি হয়েছে?' তৃপ্তি হাসবার চেষ্টা করলো।

'অমিতের কথা পেড়ে। এতো তো জানতাম না।'

'না, কিছু না। ধ্যেৎ'—হালকা চালে আবহাওয়াটা স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করল তৃপ্তি—'সেসব কিছু ভাবছ নাকি তুমি? না, না, কিছু না, কিছু না—'

'একটা স্বাভাবিক মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এধরনের হঠাৎ কিছু, অ্যাক্‌সিডেন্টাল ব্যাপার'—প্রণব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'এ কি, উঠছ নাকি তুমি?'

'হ্যাঁ যাই, রাত তো অনেক হলো। তুমিও ও খাবে-দাবে।'

'আমার আর কি, আমি তো ঘরেই থাকব—তৃপ্তিও চাদরটাকে আরও একটু আঁট করে জড়িয়ে নিয়ে উঠলো—পরশুই তো চলে যাচ্ছো। এরপর কলকাতা এলে এসো কিন্তু, দেখা ক'রো। চিঠিও তো লিখতে পারো মাঝে-সাঝে।'

'লিখব। বোঝই তো কুঁড়েমি—দরজার কাছে এসে পাম্প-সুতে পা ভরতে গিয়ে প্রণব একটু থামলো। তারপর বললো—'আচ্ছা চলি।'

'এসো।' তৃপ্তি কিছুটা এগিয়ে দিতে গেলো। নীচে নামবার সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত।

ছয়

'যাই বলুন মশাই'—মুখে-চোখে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি ক'রে টেবিলের ওপর ছোটো একটা ঘুসি মারলেন বিনোদবাবু। মাথাটা এগিয়ে দিলেন জিরাফের মতো—'আমেরিকা এবার কিন্তু আচ্ছা চাল চেলেছে। কিস্তিমাৎ—'

'পায়ের কাছে বড়েটা কিন্তু দেখলেন না দাদা। ওটা দিয়ে কিস্তি তো রক্ষে পায়ই, উল্টো সাদা ঘরে কোনাকুনি গজের হাতে দু'দান পরেই দাবাটা যে যায়। রাশিয়া কিন্তু হাসতে-হাসতে বড়েটা একটু ঠেলে দেবে।'

'তা'লে উপায়? শীর্ষ-সম্মেলন?'

সবাই এ-ওর দিকে তাকালেন। মুচকি হাসলেন সকলেই। সাব-এডিটর বিষ্ণুবাবু হালকা চালে বললেন—'উপায় আর কি, ভেস্তে যাবে।'

'ভেস্তে যাবে! বলছেন কি আপনারা। তা'লে আবার যুদ্ধ বাধবে যে।'

'যুদ্ধ? বলেন কি বিনোদদা? বললেই হলো যুদ্ধ বাধবে, হেঁ হেঁ—'সাব-এডিটর অশোক মুখুজ্জে রসিক মানুষ। হাসতে হাসতে বললেন—'নতুন বাড়ি করছেন। এখনও একতলার কাজ শেষ হলো না। তারপর দোতলা উঠবে, গৃহ প্রবেশ হবে, আমরা কব্জি ডুবিয়ে খাবো, ছেলের বিয়ে দিয়ে নাতির মুখ দেখবেন, সে সব নয়, তার আগেই যুদ্ধ? তা'ও কি হয়। কি যে বলেন যা তা—ঠিক নেই।'

'আরে, রাখুন তো মশাই, আপনার ঠাট্টা-তামাসা। কল্যাণবাবু বলুন, বলুন তো, সত্যি যুদ্ধ বাধবে না তো আর—'বিনোদবাবু রোগী দেখানোর পর ডাক্তারের মুখের দিকে তাকানোর মতো ভয়ে-উৎকণ্ঠায়

কল্যাণের দিকে তাকালেন—'আপনার কি মনে হয়, সত্যি ক'রে বলুন।'

গৌতম বুদ্ধের মতো বরাভয় তুলে কল্যাণ হাসল—'না, ভয় নেই। যুদ্ধ বাধবে না।'

'উঃ, বাঁচালেন—'বিনোদবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দূরে তিনটে টেলিপ্রিণ্টার সমস্বরে কট্‌কট্‌ ক'রে চলছিল। বিশ্রীভাবে ওগুলোব দিকে একবার তাকিয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন—'এই অফিসটা হয়েছে এক জ্বালা মশাই। সারাদিন খালি খালি কানের কাছে খচাখচ্‌ খচাখচ্‌। আর কি সব খবর আনে মশাই, শুনলে ভয়ে পেটের ভাত দলা পাকিয়ে গলায় উঠে আসে। চারপাশে আপনাবা হরদম কথা বলেন আর আলাপ করেন। শুনলে ভাবতে হয়, বুড়ো হলাম। কদিনই আর বাঁচব। কিন্তু নতুন বাড়ি করছি, ছেলে-পুলেগুলো বেঁচেবর্তে থাকবে তো? এ চাকরিটা ছাড়তে পারলেও বেঁচে যেতাম মশাই। এতো কথা শুনতে হতো না, খবরের কাগজটাও পড়তাম না। এখন বিনি পয়সায় একটা পাই, না পড়লে চলবে কেন। আর চাকরি, এ বুড়ো বয়সে চাকরি ছেড়ে যাবোই বা কোন চুলোয়। আমার হয়েছে জ্বালা, দুত্তোর এই চাকরি, চাকরির কাঁথায় আগুন—' আপন মনেই গজরাতে গজরাতে নিজের সেকশনের দিকে এগোলেন বিনোদবাবু। পিছনে একটা হাসির রোল উঠলো। এক সঙ্গে হেসে উঠলেন জন-কয়েক সাব-এডিটর। একজন মন্তব্য করলেন—অদ্ভুত মজার মানুষ। স্ট্রেঞ্জ অ্যাণ্ড টিপিক্যাল।

বিচ্ছিন্ন খবরগুলো থেকে দুটো 'বক্স-নিউজ' তৈরি করছিল কল্যাণ। একদিন ছুটির পর আজ থেকেই আবার 'মর্নিং-শিফ্‌ট্‌' শুরু হয়েছে। নতুন শিফ্‌টে এসেই কেউ বিশেষ কাজ করে না। যে কোন একটা টেবিল ঘিরে গল্প শুরু করে। আজ কল্যাণের টেবিলেই সেই আড্ডা শুরু করেছিলেন বিষ্ণুবাবু, নীরদবাবু। তারপর এলেন অশোক মুখুজ্জে, কমলবাবু। দিন-তিনেক আগে কোন এক মন্ত্রী

মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁদের পত্রিকার সম্পাদক সেক্রেটরিয়েটে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে এসেছিলেন। খবরটা গুজব কিনা, কালকের 'সম্পাদকীয়'র পরিপ্রেক্ষিতে তারই বিচার নিয়ে আলোচনার শুরু, সেখান থেকে কলকাতার শীত, নতুন ইটালিআন সিনেমা যেটা চৌরঙ্গীতে চলছে, তারপর রবীন্দ্রনাথের নাটক হয়ে আজকের পত্রিকার 'হেড-লাইন'। সেখান থেকেই শুরু হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বিশ্বপরিস্থিতি, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। আর তখনই এসে একটা চেয়ার টেনে বসলেন বিনোদবাবু। বিজ্ঞাপন বিভাগের কেরানি বিনোদ লাহিড়ী। শুধু আজ নয়, গত পনের বছর ধরে এমনি সব আলোচনায় কান পাততে চেষ্টা করেছেন, কিছু বুঝেছেন, বেশির ভাগ বোঝেন নি। বুঝতে চানও নি। ভোর থেকে সকাল দশটার মধ্যে গোটা পত্রিকাটা উল্টে-পাল্টে, সবগুলো পৃষ্ঠা, সবগুলো কলম, সব খবর মুখস্থ ক'রে অফিসে আসবেন। যে কোন সময়ে তুপুরের দিকে একবার তিনতলায় উঠে আসবেন সাব-এডিটরদের কাছে। তাদের আলোচনার বিন্দুবিসর্গ না বুঝেও সব শুনবেন এবং সব শেষে শুধু জানতে চাইবেন, যুদ্ধটা বাধবে কিনা। খবরের কাগজের অফিসে চাকরি ক'রে আর খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক হবার প্রতিক্রিয়ায় তার একমাত্র ব্যাধি—যুদ্ধের ভয়, একটা আতঙ্ক। আজ বারো বছর ধ'রেই নাকি তিনি এই ভয়ে কাঁপছেন এবং রোজই জেনে নিতে চান—'যুদ্ধ তা হলে সত্যি বাধবে না' এবং একই আশ্বাস নিয়ে ফিরে যান প্রতিদিন। সবাই বলে—এবার লোকটা পাগল হবে ঠিক।

বিনোদবাবু রোজই এক সময় এ ভাবে বিদায় নেন। কিন্তু তার প্রস্থানটা প্রায়ই কেউ লক্ষ্য করেন না। কারণ আলোচনার বিষয়টা রাজনীতি হলে, আলোচনার উপসংহার কোনদিনই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ হয় না। সেই ভয়াবহ উন্মাদনা, উত্তেজনা, আর আত্মকলহের ফাঁকে এক পক্ষের কাছ থেকে আশ্বাসটুকু নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে যান। অন্য

পক্ষ যাই বলুক, এক পক্ষের বিশ্বাসটাই তাকে আশ্বস্ত করে। কল্যাণই তাকে কোনদিন হতাশ করেনি। তাই কল্যাণের বিদ্যাবুদ্ধি বিচক্ষণতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, কল্যাণের সান্ত্বনাই তাঁর কাছে দৈববাণী।

কিন্তু আজ আলোচনার শেষে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন বিনোদবাবু স্বয়ং। তাই তাঁর নাটকীয় প্রস্থানের পর আরও একটা রসালাপের উপাদান জুটল। বিষয়বস্তু বিনোদবাবু। সকলের বিনোদদা।

সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে রসালোচনাটা আরও একটু জমতো কিন্তু বেরসিকের মতো হঠাৎ একটা চিরকুট নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো সুখময় । খোদ বড়োকর্তার আর্দালি—সাহেব, আপনাকে একটু ডেকেছেন।

'আমাকে ?' ভিড়ের মধ্য থেকে কল্যাণ মাথা তুলে তাকালো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এখনই।'

'আজ্ঞে—'

সবাই সোৎসুক-চোখে কল্যাণের দিকে তাকালো। বিষ্ণুবাবু তো ব'লেই ফেললেন—'ব্যাপার কি হে, আজকাল ঘন ঘন বড়োকর্তা, বড়ো সাহেবের তলব।'

'কি জানি, দেখা যাক। কাজ আর কি, বোধহয় কোন ফিচার-টিচার লিখতে বলবেন। বিশ্বাস করি চাই না-ই করি, লিখতেই হবে। চিন্তার দাসত্ব -'হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো কল্যাণ। টেবিলের উপর থেকে ছড়ানো কাগজগুলো জড়ো ক'রে ড্রয়ারে রাখলো। পেনটা পকেটে—'তবে সান্ত্বনা এই, তলবটা বড়োসাহেবের কাছ থেকে নয়, বড়োকর্তার কাছ থেকে। তিনি নিশ্চয়ই তেমন কিছু লিখতে বলবেন না।'

সম্পাদকের খাশমহল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি সংবাদপত্র

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত একটি বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এ কামরা বা ওই চেয়ারটার আভিজাত্য আছে। নিতান্ত সাব-এডিটর হলেও এ ঘরে বিনা নোটিশে ঢুকবার অধিকারটুকু নিজগুণেই তৈরি ক'রে নিয়েছে কল্যাণ। কিন্তু আজ অবাক হতে হলো। সামনে যেতেই দরজার পাশে ব'সে-থাকা বিহারী দরোয়ান হাত বাড়িয়ে বাধা দিল—'নেহি বাবু, আভি যানে কা হুকুম নেহি!'

কল্যাণ বিরক্ত হলো। অবশ্য লক্ষ্যও করলো, আজ একটু বিশেষ সতর্কতা। সম্পাদক ভিতরে থাকলে বিরাট কাঠের দরজাটা খোলাই থাকে, শুধ্ 'সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকতে হয়। কিন্তু আজ বিরাট কপাটটাই বন্ধ। বাইরে সতর্ক প্রহরী। বিরক্ত হলেও কল্যাণ একটু সরে দাঁড়াল। বললো—'সাহেবকে বলো, কল্যাণবাবু এসেছেন।'

'জরুর বাবু, আপ ঠাহ্‌রাইয়ে।

দরোয়ান ঢুকলো আর পরক্ষণেই এসে দরজার একটা কপাট খুলে সসম্ভ্রমে স'রে দাঁড়ালো—'যাইয়ে বাবু, অন্দরমে যাইয়ে।'

ভিতরে ঢুকতেই একটা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ হঠাৎ অভ্যর্থনা জানালো। দীর্ঘ পরিসরের বিস্তৃত ঘরটা গম্‌গম্ ক'রে উঠলো—'আসুন, আসুন কল্যাণবাবু। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। বসুন। নাউ ইট ইজ্ এ চান্স ফর ইউ। অ্যাক্‌সেপ্ট অর রিজেক্ট, অ্যাজ ইউ লাইক।'

সমস্ত ব্যাপারটাই আকস্মিক। বিস্ময়ের প্রাথমিক স্তরটা খুব সংযমের সঙ্গেই মানিয়ে নিতে চেষ্টা করলো কল্যাণ। চৌকাঠ থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে দামি ঝকঝকে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওদিকে ধুতি পাঞ্জাবিতে প্রায়-প্রৌঢ় এক পুরুষ, এদিকে নিখুঁত সাহেবি পোশাকে চীফ রিপোর্টার অনাদি পোদ্দার। দুজনের কাছেই গোটা কয়েক ফাইল, কাগজপত্রের ছড়াছড়ি, শূন্য চায়ের কাপ। কোন একটা গুপ্ত আলোচনার শেষটুকু বুঝি এখনও

অমীমাংসিত কিংবা হয়তো কোন গোপন ষড়যন্ত্র, যা এখনও দানা বেঁধে ওঠেনি।

টেবিলে কনুই রেখে তুহাতের পাঞ্জার জোড়ায় থুত্‌নি ঠেকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন অনাদিবাবু। কল্যাণকে দেখেই পাশের চেয়ারটা একটু ছুঁয়ে বললেন—'বস্থন।'

কল্যাণ বসতেই ওদিক থেকে সম্পাদক ভবতোষ রায়চৌধুরী চাপা গলায় বললেন—'আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন জানেন। খুব জরুরি আর সিক্রেট কতগুলো কথা বলব। আশা করি, লাইক এ টু জার্নালিস্ট, ইউ উইল কিপ্‌ দেম্‌ সিক্রেট্‌। এটা আমার আপনার প্রশ্ন নয়, ইট্‌ ইজ্‌ ছা কোশ্চেন অব ছা পিপ্‌ল্‌। ইন ছাট্‌ কেস্‌, ইউ উড বিট্রে দেম। অনেক খুঁজে, অনেক ভেবে আপনাকে বেছে এনেছি কল্যাণবাবু। আশা করি, আপনি গুরুত্বটা বুঝছেন।

'হ্যাঁ, বলুন। আমাকে কি করতে হবে?'

'অনেক কিছু, অনেক বড়ো কিছু—' ভবতোষ বাবু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—'আজ অ্যাসেম্‌ব্লির সেশন শুরু হচ্ছে। মন্ত্রীরা প্রায়ই সেক্রেটারিয়েটে থাকবেন না। তখন অনাদিবাবুর সঙ্গে আপনাকে একটু সেখানে যেতে হবে।'

'তারপর।'

'অনাদিবাবু বিশ্বনাথ ঘোষাল ব'লে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। হি ইজ্‌ আওয়ার ম্যান, বিলিভ হিম্‌। সেখান থেকে আপনি একটু সেক্রেটারির কাছে যাবেন। আমরা অল্‌রেডি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে রেখেছি। অনাদিবাবু কিন্তু আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েই চ'লে যাবেন। একাজেই তাঁকে একটু বাইরে যেতে হবে। অন্য একটা ইনভেস্টিগেশনে।'

'সেক্রেটারির সঙ্গে কি ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

ভবতোষবাবু ভ্রূ নাচিয়ে হাসলেন—'এই ধরুন, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা, উদ্বাস্তু সমস্যা। আমরা জানিয়েছি এ সম্বন্ধে খুব

শিগগিরই একটা স্পেশাল সাপ্লিমেণ্ট বের করব। আপনি কিন্তু আসলে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে যাবেন। উদ্দেশ্যটা পরে বলছি। এ কাগজগুলো পড়ুন—'

পিন-আপ-করা এক বাণ্ডিল নানা ধরনের কাগজ এগিয়ে দিলেন সম্পাদক। প্রথম কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়েই কল্যাণ চমকে উঠলো—'এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন?'

একটা মহৎ কৃতিত্বের আত্মপ্রসাদে ভবতোষবাবু ঘাড় নাড়লেন—'পড়ুন, পড়ুন আরও তুচারটে পাতা ওল্টান।'

ব্যাপারটার মধ্যে জটিলতা আছে প্রথম পলকেই কল্যাণ অনুভব করলো। বুঝলো, এ রহস্য ভেদ করতে পারার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে—এটা সাপ্লাই করা হয়েছে তার প্রমাণ, এই বিল। কিন্তু পেমেণ্ট হয়েছে?

'সেটা জানতে হবে। অনাদিবাবু 'এ-জি'তে যাবেন। আরও একটা ব্যাপার আমাদের এখন জানতে হবে কল্যাণবাবু—এর আসল শেকড়টা কোথায়। একি শুধু ওই এম-এল-এ ভদ্রলোক আর কণ্ট্রাক্টারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, না কোন সরকারি অফিসারও যুক্ত আছেন। আমরা এ পর্যন্ত যত ডকুমেণ্ট পেয়েছি, তাতে মনে হয় মিনিস্ট্রি এখনও এসব জানে না। অবশ্য এ ব্যাপারে অনাদিবাবুর সঙ্গে আমি ঠিক একমত হতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় স্যর, অনাদিবাবুর স্পেকুলেশনটাই বোধহয় ঠিক। 'মিনিস্ট্রি জানলে এ চিঠির ভাষাটা একটু অন্য রকম হতো।' কল্যাণ আস্তে আস্তে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। কিছুটা উত্তেজিতও।

'সেকথা এখন থাক, আরও কিছুটা না এগোলে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাবে না। সব চেয়ে আগে আমাদের আরও কয়েকটা জিনিস জানতে হবে। অনাদিবাবু 'ফিল্ডে' যাচ্ছেন। 'জার্নালিস্ট' হিসেবেই খোঁজ-খবর নেবেন। কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গে আলাপ করার

চেষ্টাও করবেন। এদিকে আমাদের জানতে হবে, ওই মাড়োয়ারি ফার্মটির সঙ্গে গভর্নমেণ্টের সম্পর্ক কদিনের। লাস্ট ইলেকশনের আগে থেকেই আছে না নতুন। ফার্মটা কিন্তু খুব পুরনো। আপনার হয়তো মনে আছে ওই চিঠিটা যিনি লিখেছেন তিনি ফার্স্ট ইলেকশনে হেরে গিয়েছিলেন। এবার কনস্টিটিউএন্সি পাল্টে রিটার্নিড্ হয়েছেন।'

কাগজগুলো টেবিলের উপর রেখে একটু স্থির হয়ে বসল কল্যাণ। অভিজ্ঞ আইনজীবীর মতো গোটা ব্যাপারটার ওপর চিন্তা করতে চেষ্টা করল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। শীত ফুরিয়ে এসেছে, মাথার উপর ফ্যানটার গায়ে এখনও ধুলো জমে আছে। তবু একটু একটু ঘেমে উঠল। তৃপ্তিকে মনে পড়ল। তৃপ্তি নিশ্চয়ই খুব নিশ্চিন্তে ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছে, নয় তো অধ্যাপকদের ঘরে আড্ডা দিচ্ছে, হাসছে প্রাণ খুলে। আর আমি? কল্যাণ ভাবলো, আমি যা চেয়েছিলাম, যা ভেবেছিলাম, যে সুযোগ পাবো ব'লে কামনা করেছিলাম। কল্যাণ চোখ তুলে তাকালো। ঝানু সাংবাদিক ভবতোষ রায়চৌধুরী, চীফ রিপোর্টার অনাদি গোদ্দার। অদ্ভুত লাগলো। দুটো মানুষ ছাড়া আর কিছু তো নয়। কিন্তু দুটো পাকা মাথা। একটা গভীর চক্রান্তকে ফাঁস ক'রে জনমনকে তুলে ধরার কি এক বিরাট ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে এ দুটো মাথায়। যা এখনও কেউ টের পায়নি। এমন কি, এই অফিসেই আরও অনেক বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান মানুষ রয়েছেন, এই একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক আছেন, তাঁদের কাছে যা এখনও অজানা, ঠিক তেমনি একদা জটিল, দুরূহ, দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে দেবো। বহুবাঞ্ছিত ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করার সুযোগ পেয়ে কল্যাণ ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠলো। কতগুলো ঘোড়েল ধূর্ত লোকের পেছনে গোয়েন্দাগিরি, সাতশো বস্তা সিমেণ্ট, আর আড়াই হাজার

করোগেটেড টিন। কত এর দাম হবে? মনে মনে অঙ্ক কষতে গেলে কোনদিনই মিলবে না, কাগজে-কলমে হিসেব করতে হলে বারবার ভুল হবে। তবু—কল্যাণ মনে মনে মেরুদণ্ডটা সোজা করতে চেষ্টা করলো—তবু দেখা যাক। আমি নগণ্য নই।

'হয়তো ভাবছেন, এতো লোক থাকতে আপনাকে ডাকলাম কেন—' কৌটো থেকে দু'টো পান এক সঙ্গে মুখে পুরে ভরাট মুখের অস্পষ্ট উচ্চারণে ভবতোষবাবু বললেন—কিন্তু আপনাকে না ডেকে উপায়ও যে ছিলো না আমার। শ্রীশবাবু গেছেন প্যারিস, হরিশবাবুকে পাঠানো হয়েছে দিল্লী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংটার খবর আনতে, গিরিনবাবু অসুস্থ। তাছাড়া আর যাঁরা আছেন তাঁদের তো ডাকা যায় না এ সব ব্যাপারে—'

কল্যাণ বিস্ময় নিয়ে তাকালো। শেষ কথাটার তাৎপর্য ওর কাছে অস্পষ্ট।

'দে আর এফিসিয়েন্ট, নো ডাউট্। কিন্তু বোঝেনই তো সব কথা খুলে বলার দরকারই বা কি? কাজে-কর্মে, চিন্তায়-ভাবনায় কোন কিছুতেই মালিক পক্ষের সঙ্গে আমাদের মেলে না। আমরা হচ্ছি বিদেশী রাষ্ট্রে পোলিটিকাল অ্যাসায়লাম নেওয়া রাষ্ট্র-প্রধানদের মতো। সম্মান আছে, 'গার্ড অব্ অনার' পাই, কিন্তু হাতে-পায়ে বাঁধা। সে ক্ষেত্রে এ সব ব্যাপারে কি বিশ্বাসী লোক ছাড়া আর কাউকে ডাকা যায়? তাছাড়া সেবার ইউনির্ভাসিটি সংক্রান্ত 'স্কুপ নিউজটার' ব্যাপারে আপনার কন্‌ট্রি-বিউশনের কথা মালিকরা ভোলেনি। এ ব্যাপারেও আপনি অনাদিবাবুকে সাহায্য করুন। যদি আমরা সাকসেস্‌ফুল হই তবে, বুঝতেই তো পারছেন, আপনার ব্রাইট ফিউচার। নিদেন-পক্ষে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-এডিটার তো—'

কথাটা শেষ করলেন না ভবতোষবাবু। হঠাৎ বোধহয় মনে হলো, এভাবে কথা বলাটা অনুচিত। এর নাম প্রলোভন,

ক্যারিঅরের মোহ দেখিয়ে নিষ্ঠাবান সাংবাদিকের আদর্শবোধে সন্দেহ প্রকাশ। ভবতোষবাবুব কথা ভেবে চোখ তুলে তাকালো কল্যাণ। একটু হাসলো।

'এখানে আমাব একটি পয়েন্ট—' অনেকক্ষণ ধ'রেই হাতে সিগারেট নিয়ে কাগজ-পত্রগুলো নাড়াচাড়া করছিলেন অনাদিবাবু। শান্ত-শিষ্ট, অত্যন্ত সংযত ভদ্রলোক। কথা বলেন কম। হঠাৎ তাব কণ্ঠ শুনে দুজনেই তার দিকে তাকালো।

অনাদিবাবু বললেন—'আমরা যদি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পুরো ম্যাটারটা তৈবি ক'রে ফেলি, বড়োসাহেব বাধা দেবে না তো। ওতে ওদের দিক থেকে অনেক ক্ষতি।'

'বড়োসাহেব মানে? মালিকরা?' ভবতোষবাবু পরিহাসে হাসলেন—'লিভ্ ইট টু মি। সে ঝুঁকিটা আমাব।'

'তবু—'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন অনাদিবাবু?'

'ভয়! কি বলছেন আপনি?'

'তবে?' দামি রুপোর কৌটো বাঁ-হাতের তালুতে উপুড় ক'বে পবিমাণ মতো দোক্তা ঢালতে ঢালতে ভবতোষবাবু বললেন—'আমরা চাকরি করতে এসেছি, মাইনে চাই। কিন্তু আমাদের দায়িত্বটা মালিকের কাছে নয়। একটা সংবাদপত্র একজন ব্যক্তির লাভের ব্যবসা হতে পারে কিন্তু সম্পত্তি হিসেবে তার মালিকানার দাবি একটা জাতির। তাছাড়া ভাবছেন কেন। যাঁদের আপনি মালিক বলছেন তাঁরা আদর্শকে যতোটুকু বোঝেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো বোঝেন ব্যবসাটা। বড়ো বড়ো এক্‌সাইটিং হেডলাইনে বাজার ছেয়ে দিন, চারদিক গরম হয়ে উঠুক। আর সেই তাপে সার্কুলেশান-গ্রাফ-টেব্‌লের রেখাটা যদি শোঁ শোঁ ক'রে টপ্ পয়েন্ট টাচ করে তবে দেখবেন মালিকরা আদর্শ ভুলে যাবেন। আমার-আপনার ক্ষতি হবে না।'

ভবতোষবাবু থামলেন। মাথা উঁচু ক'রে মস্ত হাঁ-টার মধ্যে দোক্তা ঢেলে দিয়ে পান চিবুতে-চিবুতে হাসলেন—'আর ধরুন যদি চাকরি গেলোই। যাক্। মনে রাখবেন অনাদিবাবু, আমরা যদি সত্যি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি তবে ঠকবো না। আপনাদের মতো, আমার মতো দু-চারজন সাংবাদিককে সম্মান দেবার মতো মানুষ আমাদের দেশে অসংখ্য আছে।'

'আপনি মিথ্যে এতো সব বলছেন'—অনাদিবাবুর গলায় ক্ষীণ প্রতিবাদ—'আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আমি শুধু একটা প্রিকোশন নেবার জন্যে—'

'দরকার নেই'—ভবতোষবাবু কথাটা কেড়ে নিলেন—'তা হলে আপনারা রেডি। কল্যাণবাবু—'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে দেরি করবেন না। এখানেই তো সাড়ে এগারোটা বেজে গেলো'—হাতঘড়ি থাকতেও ভবতোষবাবু একবার দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিলেন—'অনাদিবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন। কি করতে হবে, বাকিটা অনাদিবাবুই বুঝিয়ে দেবেন। তবে পারেন তো, আড়াইটা নাগাদ ডাল্‌হৌসি থেকে একবার ফোন করবেন। দরকারি কিছু বলবার থাকলে, জানার থাকলে বলা যাবে।'

সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো কল্যাণ। অনাদিবাবু আগেই উঠে ফাইল গোছাচ্ছিলেন।

চৌকাঠ পর্যন্ত এগোবার আগেই সম্পাদকের টেবিল থেকে কলিং বেলটা বেজে উঠলো। ভিতরে ঢুকেই কুর্নিশ ঠুকলো দরোয়ান। শোনা গেলো, ভবতোষবাবু হাঁকলেন—'দরওয়াজা খোল দো। যো আতা হ্যায় উস্‌কো আনে দো আভি।'

মাথার উপর দায়িত্বের বোঝা চাপলে মস্তিষ্কটা যে এতো পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, কাজের যে এমন একটা নেশা আছে, এতো অফুরন্ত আনন্দ আছে, সে অনুভব কল্যাণের জীবনে আজই প্রথম। ছাত্র-রাজনীতি

নিয়ে এক সময় মেতে থাকবার সময় ছিলো। তখন কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, রেস্তোরাঁয়, কফি-হাউসে যাকে-তাকে 'আই-বি' ব'লে সন্দেহ হ'তো। এখন নিজেকেই যেন একজন খুদে গোয়েন্দা মনে হচ্ছে বারবার। অবশ্য পেছনের সব কলকাঠিই অনাদিবাবুর, সব পরিকল্পনাই ভবতোষবাবুর অনুমোদনে নির্ধারিত, তবু আজ সারাদিনে যেন এক অসম্ভব অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরছে মনে হলো। ঘরে ফেরার পথে ট্রামের নানা বয়সের বিভিন্ন বেশভূষার, বিচিত্র ধরনের সব সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সারাদিনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করছিল মনে-মনে। আর অবাক হচ্ছিল অনাদিবাবুর কথা ভেবে। কী ভয়ঙ্কর ধুরন্ধর একটা মানুষ! এরা, এই এতো সব সাধারণ মানুষ, যারা ট্রামে-বাসে, শহরে-গ্রামে, পথে-গঞ্জে নিরাপদ আস্তানায় দিন আর রাত গোনে, তারা শুধু ঘটনাই ঘটতে দেখে, সেই ঘটনা ঘটায় আরেক দল। এরা যুদ্ধে মরে, যুদ্ধ তৈরি করে অন্য দল, এরা বাড়তি দরে চাল কেনে, কালোবাজার এদের সৃষ্টি নয়, করের উপর করের চাপ পড়ে, কর চাপায় অন্য মানুষ। এই অসংখ্য ঘটনা থেকে সংবাদ তৈরি করেন অনাদিবাবু, ভবতোষবাবু। তারা নেপথ্যের নায়ক। আমি তাদেরও পিছনে। কল্যাণ ভাবলো। চারিদিকে তাকালো, একই সিটের আরেক অংশীদার মরতে মরতে কোনো মতে বেঁচে-থাকা ভগ্নস্বাস্থ্য যুবকটির দিকে—এরা কি জানে দিন কয়েক পরে প্রভাকর পত্রিকার একটি হেড-লাইন এদেব কি ভাবে চমকে দেবে। আর চমক-দেওয়া সেই সংবাদের পিছনে আমি আছি, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় নামক এই 'আমি' মানুষটি। দোতলায় উঠেই ঘরের দরজায় কড়া নাড়লো কল্যাণ। দরজা খুললে নিধুর-মা।

'অন্ধকার কেন ঘর?'

'আলো জ্বালাই তো ছিলো বাবু। মা নিবিয়ে রেখেছেন।'

'মা কোথায়?'

'শুয়ে তো ছিলেন। বোধহয় ঘুমোচ্ছেন।'

'এখন ঘুমোচ্ছে? মাত্র রাত সাড়ে আটটা? অসুখ-বিসুখ করেনি তো'?—দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে স্যুইচ টিপলো কল্যাণ। ঘর-ভরা আলোয় তৃপ্তিকে দেখা গেলো। খাটের ওপর কাত হয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে। নইলে একবার চোখ তুলে তাকাতো। নিধুর-মার দিকে তাকিয়ে বললো—'আচ্ছা তুমি যাও।'

নিধুব-মা চ'লে গেলে হাতের কাগজ-পত্রগুলো টেবিলের ওপর রাখলো কল্যাণ। দরজা দুটো বন্ধ ক'রে এগিয়ে এলো খাটের কাছে। বার দুয়েক ডাকলো তৃপ্তিকে। সাড়া এলো না। কনুই পর্য্যন্ত ব্লাউজের হাতায়-ঢাকা বাহুতে হাত রেখে, কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে আবার ডাকলো। একটু নাড়া দিলেই হয়তো সত্যি জেগে যেতো তৃপ্তি। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করলো তৃপ্তির বুকের কাছে একটা চিঠি। আর ডাকলো না। চিঠিটা তুলে নিয়ে আলোর কাছে এসে দাঁড়ালো। খামেব উপর তৃপ্তিব ঠিকানা—দিদি, কেয়ার অফ্ শ্রীকল্যাণ মুখোপাধ্যায় ⋯⋯। নিশ্চয় মমতা। ব্যগ্র হয়ে চিঠিটা খুলে ফেলে মন দিয়ে খুঁটিয়ে পুরো চিঠিটাই পড়লো। কলেজে পড়ছে এমনি একটি পরিপূর্ণ মেয়ের লেখা, দিদির কাছে লেখা ছোটোবোনের চিঠি। কিন্তু পড়তে-পড়তে কল্যাণ নিজেও কেমন একটু বিষণ্ণ বোধ করলো। একটি কান্না-কাঁপা কণ্ঠস্বর যেন এ চিঠির ভাষায়, প্রতিটি অক্ষরে-অক্ষরে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। কয়েকটা বিশেষ জায়গা দুবার পড়ার জন্যে চোখ বুলোতে হয়—'জানিস্ দিদি, এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো। বাবা এবার ঠিক করছেন, আমার বিয়ে দেবেনই দেবেন। তুই তো জানিস, বাবা একবার গোঁ ধরলে আর মত বদলান না। বাবা এখনও তোর নাম ক'রে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে আমাকে গালি-গালাজ করেন। লেখাপড়া করলে আমিও নাকি তোর মতো হবো। সেই সেবারে আই-এ পড়ার সময় যদিও বা রেহাই পেয়ে ছিলাম এবার আর পাবো না। আমার কান্নাকাটির কোনো ধারই

ধারেন না বাবা। মা আর কি করবেন। তুই তো জানিস, বাবার সামনে মা কথা বলতেই সাহস পান না। সেই যে ইঞ্জিনিয়ার মজুমদার সাহেবের ভাগনেটা, বাবা যার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন, সেই লোকটা এখনও বিয়ে করেনি। ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে। এ বিয়ে আমি করবো না দিদি, কিছুতেই করবো না। আর কিছু না পারি, গলায় দড়ি দেবো। সত্যি ক'রে বলছি, আমি ম'রে যাবো। তোর মতো কলকাতায় গিয়ে এম-এ পড়তে আমি পারবো না জানতাম, বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। কিন্তু তাই ব'লে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত প'ড়ে বি-এ-টাও পাশ করতে পারবো না? জামাইবাবুকে কখনও দেখিনি দিদি, তোকেও বহুদিন দেখিনি। দোহাই তোদের, আমাকে বাঁচা। ইচ্ছে করে, তোদের কাছে পালিয়ে যাই। কিন্তু কি ক'রে যাবো? আমি তো বড়ো হয়ে কখনও বাংলাদেশে যাইনি। ডিগবয়েই আমাকে মরতে হবে দিদি, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।......'

আরও পড়া যায়। অনেক দীর্ঘ চিঠি। মেয়েলি ভাষায় একই কথার পুনরাবৃত্তি। তবু প্রতিটি শব্দ মনকে পীড়িত করে, নাড়া দেয়। অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা ভাঁজ করতে গিয়ে হঠাৎ 'পুনশ্চ' চোখে পড়লো—......'আমাদের বাড়ির ঠিকানায় তুই আমাকে চিঠি লিখিস্ না। বাবা জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবেন না। নীচে আমার কলেজের এক বন্ধুর ঠিকানা দিলাম। এখানকার নতুন ওভাসিয়ারবাবুর মেয়ে। ওর ঠিকানায় লিখলেই সব চিঠি আমি পাবো।'

চিঠিটা ভাঁজ ক'রে খামে পুরে কল্যাণ তৃপ্তির দিকে তাকালো। তৃপ্তি তখনও ঘুমোচ্ছে। হয়তো সে কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙে উঠলে আবার সব মনে হবে, এই চিঠি, বোন মমতা, মা, বাবা, ডিগবয় শহর আরও অনেক কিছু, অনেক পুরোনো স্মৃতি। তবে ঘুমোক। আজকের মতো এই বিরাট দিনটা, এবং এই দিনের সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলি যেন এক মুহূর্তে কল্যাণের কাছে কেমন ঝিমিয়ে গেলো।

সাত

পুরী এক্‌স্‌প্রেস্‌ বিশ্রীভাবে লেট কর্‌লো। প্রায় চার ঘণ্টা দেরি। রাত দুটোর হাওড়া স্টেশন। মরা মানুষের মতো ঠাণ্ডা, নির্জীব আর বোবা! উঁচু-উঁচু শেডের নীচে দীর্ঘ আর চওড়া প্ল্যাটফরম্‌-গুলো, ভারহীন রেল-লাইনগুলো ক্লান্ত মজুরের মতোই অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। গভীর রাতের হাসপাতালে নার্সের ক্লান্ত চোখের আলো নিয়ে জ্বলছে সারি বাঁধা ফ্লুরোসেন্ট লাইট। তারই নীচে গামছা বিছিয়ে হাতকে বালিশ করে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে স্টেশনের কুলি, ফেরিওয়ালা, ভবঘুরে মানুষ।

নিঝুম রাতটাকে ভেঙেচুরে ইঞ্জিনটা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে থামলো। হঠাৎ একটা সোরগোল উঠে কিছুক্ষণ রইল। যাত্রীদের নামা, কুলিদের হাঁক-ডাক। তারপর সোরগোলটা ধীরে-ধীরে গুঞ্জনে দাঁড়ালো। গুঞ্জনটা মিলিয়ে গেলো। ঝাড়ু হাতে ঝাড়ুদার এসে রেলের কামরায় ঢুকলো। তখনই খেয়াল করলো অমিত—এবার নামা উচিত।

জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই। একটা জং-ধরা স্যুটকেশ, মাদুর আর চাদরে কোনোমতে জড়ানো একটা বালিশ, একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। তাতে একজোড়া চটি জুতো, খানকতক বই। কামরায় উঠে তখনও একটা মানুষকে ব'সে থাকতে দেখে ঝাড়ুদার যেন ভূত দেখলো! কিন্তু তাকে আরও বেশি চমকে না দিয়ে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো অমিত। নামলো।

ফাঁকা প্লাটফর্‌ম্‌। এদিক্‌ থেকে ওদিক ধু ধু করা শূন্যতা। সারি-বাঁধা আলো পেছনের দিকে কোথায় অন্ধকারে বিলীন, সামনের আলো দূরে কোলাপ্‌সিবল গেটের কাছে হঠাৎ থেমে গেছে। একপাশে

মড়ার মতো প'ড়ে ঘুমোচ্ছে কতগুলো মানুষ, স্থির হয়ে প'ড়ে আছে, 'ভেণ্ডারের মালটানা গাড়ি,' একটা থামে বোকার মতো হাসছে বিজ্ঞাপনের মেয়েটা, অন্যদিকে প্রাচীরের মতো গাড়ির দেয়াল। সামনে-পেছনে শুধু হাতলগুলো এক হয়ে মিশে গেছে, আলোয় জ্বলছে। এই বিরাট শূন্যতা আর স্তব্ধতার মধ্যে নিজেকে ঈশ্বর মনে হ'লো। এই একটু আগেও চলতি-ট্রেনের একটা কামরায় এতোগুলো নর-নারী ঠাশাঠাশি করে, গল্পগুজব ঠাট্টা-তামাশা আত্মকলহে কোলাহল ক'রে এতোদূর এলাম আর এখন কেউ কারও নয়। মৌমাছির মতো ভনভন ক'রে একটু গুঞ্জন তুলে কে কোথায় হারিয়ে গেলো! তারপর আমি আবার একা। শূন্যতাকে ভ'রে রেখে একা। হঠাৎ লক্ষ্য করলো আমিত, ওর ছায়া নেই। শুধু ঈশ্বরের ছায়া পড়ে না। ঠিক মাথার উপর আলো। অমিত হাঁটতে শুরু করলো। পিছনের আলোটা সামনের দিকে যতো বড় ছায়া ফেলতে চায়, সামনের আলোটা হঠাৎ এসে ততোদূর পিছনে হটিয়ে দেয়। ছায়াটা এগোতে চেয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে, পেছোতে বাধ্য হ'চ্ছে। কিন্তু অমিত এগোচ্ছে। নিজেরই ছায়া। কিন্তু সে ছায়ার অস্থিরতা-চঞ্চলতার উপর নিজের কোনে হাত নেই। সেই পুরোনো চিন্তাটা তখনও ভিতরে-ভিতরে পাক খাচ্ছিল—কাজটা কি ভালো হলো? আবার সেই কলকাতা। অন্ধকার গলি-ঘুঞ্জির মধ্যে কতগুলো হৃদয়হীন মানুষের সঙ্গে একত্রে বাস। অকারণে যাদের সঙ্গে এক সময় পরিচয় হয়েছিল এবং অনাবশ্যকভাবে আজও যারা চেনা হয়ে আছে—পথে ফুটপাতে ট্রামে-বাসে ঘুরে-ফিরে তাদেরই সঙ্গে দেখা হবে। শৌখিন ভদ্রতায় প্রশ্ন আসবে, 'কেমন আছেন' বা 'কেমন আছিস', আর কোনো রকমে এড়িয়ে যাবার জন্য একটা প্রাণহীন সাড়াও দিতে হবে—'ভালো আছি'। অথচ কোনোটারই দরকার নেই। জানি, ভালো নেই, থাকবো না—তবু একটা বুলি মুখস্ত রেখে সভ্যতার নিয়ম পালন করতে হবে। কী লাভ এই কৃত্রিম জীবন যাপনে? দুপুরে স্টেশনে

আসার আগে অনেক ভেবেছি, ভাবতে-ভাবতে কিছু স্থির করতে না-পেরে টিকিট কিনেছি, টিকিট পকেটে রেখেও মত বদলাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ট্রেন এলে অভ্যাসের বশেই উঠে পড়েছি। ফিরে যাইনি। কিন্তু না এলেই ভালো হতো। আবার ফিরে যাওয়া যায় না? পকেটে দু'-চারটে টাকা এখনও তো আছে। বেশ ছিলাম, বেশ থাকতাম। চেষ্টা করলে গ্রামের স্কুলে মাস্টারিও পেয়ে যেতাম একটা। তবে কেন এলাম। শান-বাঁধানো নিঃসঙ্গ-নির্জন প্ল্যাটফরম পেরোতে আশ্চর্য ভালো লাগলো। বিছানাটা বগলের নীচে আরও একটু ঠেলে দিয়ে সুটকেশটা হাত বদল করলো অমিত। কলকাতার একটা নেশা আছে। মেয়েমানুষের মতো; শুঁড়িখানার মতো একটা আকর্ষণ। যাবার আগে বিবেক পীড়িত করে, বেরিয়ে এলে অনুশোচনা। তবু প্রতিদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ইঞ্জিনের একটা কর্কশ গর্জন হঠাৎ কানে এসে বিঁধলো। বোধ হয় লোকোশেড থেকে। চিন্তাটা একটু নাড়া খেতেই অমিত লক্ষ্য করলো দূরে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট ধরে দুটি লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো রেলের পুলিশ কিংবা টিকিট-এগ্‌জামিনার। কালো কোট, কালো প্যাণ্ট, কালো টুপি! অমিত ওর পায়ের গতি বাড়ালো না। তেমনি ধীরমন্থর মেজাজে অগ্রসর হলো।

'টিকিট'। কাছে আসতেই ঝাঁঝালো বিরক্তি নিয়ে দুজনের একজন বাত বাড়ালো।

অমিত হাতটা সামান্য এগিয়ে দিলো। বেশিদূর পারলো না। বগলে বিছানা।

'এতক্ষণ কি করছিলেন?

'কৈফিয়ৎ দিতে হবে?'

লোক দু'টো ভ্রূকুটি তুলে তাকালো—'গেট বন্ধ ক'রে দিলে কি করতেন? আবার কথা বলছেন?'

ডাকাডাকি ক'রে খোলাতাম।'

'এতোরাতে এভাবে প্ল্যাটফরমে ঘুরে বেড়ালে জানেন, আমরা পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি।'

'পুলিশ আমাকে ধরবে কেন? রেলের চাকার সঙ্গে দু'টো ক'রে ঘড়ির কাটা জুড়ে দিন না। রাত দুটোর সময় আপনাদের প্ল্যাট-ফর্মে আমার মতো লোকের সন্দেহজনক ঘোরা-ফেরা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'যান যান মশাই, কথা বাড়াবেন না। ঢের ঢের লোক দেখেছি আপনার মতো। রাস্তায় নামুন না একবার। পুলিশ সোহাগ ক'রে শ্রীঘর দেখিয়ে দেবে।'

অমিত অদ্ভুত ভাবে হাসলো। একগাল দাড়ির ফাঁকে ওর চিকচিকে শাদা দাঁতগুলো দেখে বোধহয় ভয় পেলো লোক দুটো। বেমালুম চুপ ক'রে গেলো।

তিনটে মানুষের কয়েকটা কথা এবং অমিতের ছেঁড়া-চটি টেনে চলার শব্দে গম্‌গম্‌ ক'রে উঠলো চারদিক। বাতাস এখানে ভারি হ'য়ে আছে, ভয়ঙ্কর নীরবতা। থমথমে প্ল্যাটফর্মের পর আবার এক বিরাট পরিসরে গম্ভীর স্তব্ধতা। হাওড়া স্টেশনের বিস্তীর্ণ লবি। টিকিট-কাউন্টারের ঝাঁপ বন্ধ, দোকানগুলো বন্ধ, মাথার উপরে ফ্যানগুলো স্তব্ধ। থামগুলো বড়ো বেশি উঁচু উঁচু মনে হয় আর বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে কাতারে-কাতারে ঘুমোচ্ছে যে সব মানুষ, তাদের বড়ো বেশি ছোটো মনে হয়। ছোটো আর নগণ্য। যেন মানুষই নয় লোকগুলো। আলোগুলো ঘিরে হাজার হাজার আলোর পোকা উড়ছে, ঘুরছে। নীচে মানুষগুলো যেন মরা পোকা। পৃথিবীর লোকসংখ্যার বিরাট অঙ্কটার মধ্যে নিশ্চয়ই এরাও একটা সংখ্যা। একটা ঘুমন্ত উদ্বাস্তু-পরিবারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অমিত ওদের দিকে তাকালো। একটি পুরুষ, একটি নারী এবং কয়েকটি বাচ্চা। নিশ্চয় ওরা স্বামী-স্ত্রী। অথচ খোলা জায়গায়, অসংখ্য মানুষের খোলা চোখের উপর ওদের প্রকাশ্য

শয্যা। গা ঘেঁসাঘেঁসি ঘুম। ঘুমের আগে বাচ্চা শিশুটি বোধহয় মার কাছে কান্না জুড়েছিল আর সেই কান্না থামাতে মা তার গিঁট-দেওয়া নোংরা শাড়িটা বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল একটু। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে, মা-ও লজ্জা ঢাকতে ভুলে গেছে।

ঝুলে-পড়া স্তনকে সকলের চোখের সামনে উন্মুক্ত ক'রে মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। বাচ্চাটা মা-র নরম বুকে হাত রেখে বেহুঁশ। পুরুষটা নির্বিকার ঘুমে অচেতন। কিন্তু ভোরে উঠে মেয়েটা নিশ্চয়ই ঘোমটা টেনে বসবে। হয়তো ছেলে-কোলে নিয়ে ভিক্ষে করবে স্টেশনের থামে হেলান দিয়ে কিংবা শহরের ফুটপাতে।

অদ্ভূত হাসি পেলো অমিতের। এই কিছুদিন আগেও গৌর সাহার দোকান থেকে দু'-ছিলিম তামাক টেনে একটু আড্ডা মেরে ফিরে আসার সময় পুকুর পাড়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। ঘাট থেকে ভেজা কাপড়ে উঠে আসছিল পরাণ কাকার মেজো মেয়ে বকুলি আর বসুদের বাড়ির যুবতী-বৌ। একজনের কাঁখে পিতলের কলসি, কোমর বেঁকে গেছে। অন্যজনের দুহাতে, কাঁধে এক কাড়ি ধোয়া কাপড়। ছোটো বোন আর ছোটো ভাই-এর বৌ। বৌ-টি ভাসুর ঠাকুর দেখেই চকিতে জিভ কেটে একহাত লম্বা ঘোমটা টেনে পা চালালো আর ভেজা-শাড়িতে ছপ্‌ছপ্‌ করতে করতে কাছে এগিয়ে এলো বকুলি—'কি গো অমিতদা, হাটে গেছলে বুঝি ?'

'না রে, এই তো গৌর সার দোকানে। একটু গল্প ক'রে এলাম।'

'বিকেলে যেয়ো না একবার আমাদের বাড়ি। নারকোলের নাড়ু করেছি, সরু চাকলি করবো। যেয়ো।'

হেসে রাজি হয়েছিল অমিত। মেয়ে দুটো দুলকি চালে চ'লে গিয়েছিল। একটি মাত্র শাড়ি ছাড়া গায়ে আর কোনো আবরণ ছিল না। সে শাড়িও ভেজা চামড়ার সঙ্গে সেঁটে গিয়ে শাড়ি

পরার উদ্দেশ্যটাই বাতিল ক'রে দিয়েছিল। অথচ যুবতী বয়স। চুরি করে ওদের একটু দেখেছিল অমিত। ভালো লেগেছিল তাকিয়ে থাকতে। কী অদ্ভুত গ্রাম্য সরলতা। শহুরে শায়া-ব্লাউজ ওরা পরতে জানে, পরেও। কিন্তু শহর ওদের নগ্ন করতে পারেনি কখনও।

সময়কে ফাঁকি দিয়ে গোটা শহর যখন ঘুমে অচেতন, তখনও সেই বিরাট নৈঃশব্দ্যের সময় গুণে চলেছে স্টেশনের বিরাট ঘড়ি। দুটো পঁয়ত্রিশ। অনেক রাত। ঘড়ির নীচে লোটা-কম্বল নিয়ে প'ড়ে আছে দুটো পশ্চিমা সাধু, ওদিকে সুন্দর বিছানা পেতে সুটকেশে মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে বিশালদেহী একজন পাঞ্জাবি শিখ। রেলিং দেওয়া খাঁচার ভিতর স্তূপীকৃত মালপত্র। কাঠের প্যাকিং, চটের প্যাকিং আরও কত কি! খাঁচার চারদিকে অনেক মানুষ —বিহারী, উৎকলী, কিংবা দরিদ্র দক্ষিণবাসী। হয়তো রাতে ট্রেন ধরতে পারেনি কিংবা খুব ভোরের ট্রেনে যাবে, তার প্রস্তুতি। কেন এসেছিল এরা কলকাতায়? কী পেয়েছে কলকাতার কাছে! নরকের প্রথম পথ সুড়ঙ্গ। মৃত্যুর স্তব্ধতা। সুড়ঙ্গ পেরোলে শয়তানের দরজা। তারপর মহানিস্তব্ধতার গুহা। তারপর আগুনের ঘর। মানুষ সেখানে যেতে ভয় পায়, প্রেতাত্মার প্রবেশ অবাধ। হাওড়া স্টেশনের শেষ সীমানা পেরিয়ে অমিত খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। এই কলকাতা মহানগরী। দুনিয়ার উপনিবেশ, বাংলাদেশের বুকের পাঁজর। মেয়েমানুষের বুকের মতো। গোটা শরীরটাকে গৌণ রেখে দূর থেকে যেমন মাদকতা ছড়ায়। দুদিন পরে নেতিয়ে পড়ে। বুড়িয়ে যায়।

গ্রামটাকে মনে পড়লো। আজ সকালেও যে গ্রামের মাটির ঘরে ঘুম ভেঙেছে। বাংলাদেশের গ্রাম। মনে পড়লো মদন মাস্টারকে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুড়ো হেডমাস্টার মদন জানা। বাংলাদেশের মানুষ। এই জীবনে কলকাতাটা দেখা হলো না

ব'লেই তার যতো দুঃখ, যতো হতাশা। বয়সে আড়াই গুণ বড় হলেও তার কাছে আমার একমাত্র মর্যাদা আমি কলকাতার ছেলে। কিন্তু ভদ্রলোক জানেন না, এখানে এক ঝুড়ি মাটি চার চারটে নগদ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। জানেন না দশটা-পাঁচটার ট্রামে-বাসে এখানকার মানুষগুলো যে কিভাবে প্রাণটুকু মুঠোয় নিয়ে অফিস-কাছারি করে তা একদিন দেখলেই তিনি ভিমরি খেয়ে পড়বেন। কিংবা মনে পড়ে বুড়ি পিসিমাকে, ঘটি উপুড় ক'রে জল না খেলে আজও যার তৃষ্ণা মেটে না। তাঁর শখ, কালীঘাট, মায়ের থান ঘুরে একবার শেষ পুণ্যি নিয়ে যাবেন। গৌর সাহার মুদি দোকানে আজ সন্ধ্যায় লোকগুলো এসে মুখ ভার ক'রে ফিরে গেছে। আমি নেই। ওদের কলকাতার গল্প শোনাবার মানুষ নেই। ওরা জানে, ওদের গ্রামের সীমানার বাইরে একটা পৃথিবী আছে, সেই পৃথিবীটা ওদের বিস্ময়। আত্মতৃপ্ত কলকাতার মানুষ। তারা জানে না, কলকাতার যেখানে শেষ, তার বাইরে একটা দেশ আছে এবং সে দেশটার নাম বাংলাদেশ।

আর আমি? অমিত একবার তাকালো চারদিকে। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে। নিঝুম, চুপচাপ। যেন প্রত্নতত্ত্বের অনাবিষ্কৃত কোন এক মৃত নগরী। আমি যদি ভদ্রলোক হতাম, আমার ভয় করতো। চোরের ভয় গুণ্ডার ভয়। অতর্কিতে এসে ছিনিয়ে নিতে পারে আমার সব কিছু। কিন্তু কেউ আসবে না। অমিত সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালো। হাওড়া ব্রিজ। মহানগরী কলকাতার প্রতীক। আধো-অন্ধকারে আবছা হয়ে আছে, আকাশে লাল তারা। এ কলকাতাকে আমি জানি। আমার বহুদিনের চেনা। রাজনীতি করতাম ছেলেবেলায়। কলেজে-য়ুনিভার্সিটিতে ছুটোছুটি করতাম। তখন চ'ষে বেড়িয়েছি চারদিকে। কাজে অকাজে চরকির মতো ঘুরে বেড়িয়েছি এর প্রতিটি অঞ্চলে, অলিতে-গলিতে, রাজপথে, পার্কে-ময়দানে, থিয়েটার-সিনেমা-

রেস্তোরায়, অফিস-আদালত-কারখানায়। তারপর একদিন মনে হলো—আমি একা। ভীষণ একা। নিঃসঙ্গ। এই লক্ষ লক্ষ নাগরিক অধিবাসীরা আমার কেউ নয়, আমি কারও নই। এখানে বাস করা যায়, ভালোবাসা যায় না একে। মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে একসময়ে ক্লান্তি আসে। ক্লান্তির সঙ্গে বিতৃষ্ণা। সেই ক্লান্তি এলো, আমি পালাতে চাইলাম। পালালাম। তবু আবার তো এলাম। একেবারে পালাতে পারলে বেঁচে যেতাম। কিন্তু পারিনি। একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছি বারবার। আবার ক্লান্ত হতে চাই, বিতৃষ্ণা চাই জীবনে। মদ যতো বেশি তেতো আর বিস্বাদ, নেশা ততো বেশি উগ্র আর ঝাঁঝালো। আকর্ষণ ততো বেশি তীব্র।

শারীরিক ভাবে এবার ক্লান্তি বোধ করলো অমিত। হাওড়া-ব্রিজের মাঝামাঝি এসে সুটকেশ নামালো হাত থেকে, বিছানাটা রাখলো সুটকেশের উপর। অনেকক্ষণ ধ'রে সিগারেট খাওয়া হয়নি। দুপ্যাকেট চারমিনার আর এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। পকেট হাতড়ে গোটা পাঁচেক বিড়ি জুটলো। সারারাত কাটাতে হবে পাঁচটা বিড়িতে। যাকগে। একটা ধরালো। এগিয়ে গেলো রেলিং-এর দিকে, নীচে হুগলি নদী। নীচে, কতো নীচে? বিড়ি ধরিয়ে দেশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠিটা নীচে ফেললো। বাতাসের ফুৎকারে নিভে গেলো। তারপর হারিয়ে গেলো। যদি ঝাঁপ দেওয়া যায় এখান থেকে? অদ্ভুত একটা খেয়াল চাপলো মাথায়। যা কোনোদিন হয়নি বা হবে না, যদি তাই হয়? যদি রেলিংটা ভেঙে পড়ে হঠাৎ? এখন, ঠিক এই মুহূর্তে? আর আমি যদি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই? অমিত মৃদু চাপড় দিয়ে রেলিংটা পরখ করলো। তারপর হেসে উঠলো। যতোসব আজগুবি ভাবনা, মাথা নেই, মুণ্ডু নেই। আত্মহত্যা? আবার সেই ভাবনা?

সে ভাবনা মানুষ ভাবে? মরতেই যদি হয় তবে ওভাবে মরবো কেন? মজা ক'রে মরবো। রসিয়ে-রসিয়ে মরবো।

এখন ফাল্গুন মাস। বসন্ত ঋতু। আমগাছে নতুন কচি পাতা উঠছে, বোল ধরবে। আজ সকালেও গোয়ালঘরের বাঁ দিকের গাছটার নীচে ব'সে কিছুক্ষণ বই প'ড়ে এসেছে অমিত। দু-একটা কোকিলের ডাকও শুনেছে। এখন ফুরফুরে হাওয়া আসছে। নদী থেকে উঠে আসা জোলো বাতাস। বেশ শীত-শীত লাগছে। অদ্ভুত ভালোও লাগছে। অমিত পড়লো না। বিছানাটা খুলে চাদরটা বের ক'রে নেবার তাড়াও অনুভব করলো না একবার।

এদিকে হাওড়া, ওদিকে কলকাতা। দুটো শহরই জ্বলছে। এদিকে চটকল, ইস্পাতের কারখানা, ওদিকে বাড়ির গায়ে বাড়ি, প্রাসাদ, অট্টালিকা। আলো আর আলো। নদীর উপর ছুরির ফলার মতো আলোগুলো জ্বলছে। লকলকে আগুনের মতো ঢেউ-এ ঢেউ-এ কাঁপছে। আকাশের নক্ষত্র ম্লান। কোনো এক তরুণ লেখকের একটি গল্পের কথা মনে পড়লো। আলোজ্বলা এ কলকাতাকে দগ্‌দগে্‌ ঘায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ভালো লেগেছিল। আবার মনে পড়লো। 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।' মনে মনে আবৃত্তি করলো অমিত। চোখ-ধাঁধানো রূপসী এক নারী এই নগরী। কলকাতাকে কি প্রশংসা করেছিলেন কবি। প্রশ্নটা অনেক দিনের। দীনেশের সঙ্গে তর্ক হয়েছিল একদিন। প্রশ্নটা আজও মনে পড়লো।

একটা আচমকা শব্দে চিন্তাটা নাড়া খেলো। পিছন ফিরে তাকালো। হাওড়া থেকে উঠে এসে কলকাতার দিকে নেমে গেলো একটা ট্যাক্সি। প্রচণ্ড বেগে চোখের পলকে মিলিয়ে গেলো। হাওড়া-ব্রিজ মৃদু-মৃদু কেঁপে উঠলো একটু।

এখানেই কাটিয়ে দিলে হয় না রাতটা! অমিত ভাবলো। রাত

ফুরোতে কতটুকুই বা বাকি। জন-মানবশূন্য রাতদুপুরের এই বিরাট অভিজ্ঞতা, কলকাতার মানুষগুলো কি তার খোঁজ-খবর রাখে। অথচ জোলা বাতাসটা এখন জলের ঝাপটার মতো শরীরে বিঁধছে। মাদুর পেতে এখানেই শুয়ে পড়া যায়। কিন্তু পুলিশের ঝামেলা আছে। অকারণে কানের কাছে এসে লাঠি ঠুকবে। ভবঘুরে ব'লে ধ'রেও নিয়ে যেতে পারে। ধ'রে নিক, ক্ষতি নেই। কিন্তু—

ভাবতে ভাবতেই একসময় সুটকেশটা হাতে তুলে নিলো। বিছানাটা বগলে। আবার উৎরাই-এ নামতে শুরু করলো। কলকাতার দিকে। কোথায় যাচ্ছি? কলকাতায়। তবু কোথায়? আমার ঠিকানা? প্রশ্নটা নিজের কানেই কেমন বাজলো। উত্তর নিজের কাছেই অজানা। ট্রেনটা ঠিক সময়ে এলে লোকেনদের মেসে যাওয়া যেতো। ভাগাভাগি ক'রে একটা তক্তপোষেই কাটানো যেতো কয়েকটা রাত। তারপর পুরোনো চাকরিটা যদি জোটে, ভালো। না জোটে তো অন্য যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে বসা যেতো। আজ রাতটা কাটাতে পারলে চাকরির কথা ভাবা যাবে কাল। কিন্তু এখন, এতো রাতে এই বিরাট শহরে কোথায় যাবো? কোথায় উঠবো?

সেতুর ঢালু ফুটপাতে পিছনের আলোটা দীর্ঘ একটা ছায়া ফেললো সামনের দিকে। শরীরের দৈর্ঘ্য থেকে. দ্বিগুণ হবে সে ছায়া। সেই দীর্ঘতর ছায়াকে অনুসরণ ক'রে-ক'রেই অমিত কলকাতাকে স্পর্শ করলো। তীব্র হেড-লাইট জ্বেলে পুলিশের একটা ওআরলেস ভ্যান বেঁকে গেলো স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে হ্যারিসন রোডে। অমিত একটু থমকে দাঁড়ালো। অপেক্ষা করলো। পুলিশের চোখে পড়লে এখন আবার বিড়ম্বনা। নানা প্রশ্নের ঝুঁকি।

কলকাতার প্রবেশ পথ। সামনে তিনটে রাস্তা। ডান দিকে স্ট্র্যাণ্ড রোড। সোজা গেছে দক্ষিণের দিকে—ডালহৌসি স্কোয়ার।

শাসকের কলকাতা। বাঁয়ে নিমতলা শ্মশানের পথ। সামনে হ্যারিসন রোড—বড়োবাজার। বণিকের কলকাতা। কোথায় যাবো ? কোন দিকে ? দূরে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুনলো অমিত। তবু এগলো। মোড়ে এসে লক্ষ্য করলো—রাস্তার ধার ঘেঁসে কিছু দূরে দূরে খই ছড়ানো। লাইটের আলোয় চিকচিক করছে কয়েকটা নয়া-পয়সা। কাল ভোরেই এখানে হুমড়ি খেয়ে পড়বে কাক-চিল আর ভিখিরির দল। রাত দুপুরের স্তব্ধতা কাঁপিয়ে একটা শবযাত্রা চলে গেছে একটু আগে। হ্যারিসন রোড থেকে এসে নিমতলার দিকে। এ পথে যেতে-যেতেই আমি একদিন ফিরে এসেছি। এই কলকাতা, একদিন আমাকে মরতে বলেছিল। আমি নিজেকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। অমিত এদিকে-ওদিকে তাকালো একবার। গভীর রাতের কলকাতা। প্রত্নতত্ত্বের মৃত নগরীর মতো স্থবির, বোবা। রাজনৈতিক আন্দোলনে আন্দোলিত শহরকে আয়ত্তে রাখার জন্য সন্ত্রস্ত-সশস্ত্র প্রহরীর মতো সজাগ লাইট-পোস্টের সারি। যেন বেপরোয়া হয়েই অমিত ঢুকে পড়লো শহরের ভিতরে। খই-ছড়ানো-পথ এসে যেদিকে বেঁকে গেছে তার বিপরীত পথে। 'শুনবো না আর যখন কানে, বাজবে তবু এই এখানে, 'রাম নাম সত্ হ্যায়'—এ আমি জানতাম। আধুনিক কবির প্রিয় লাইনটা মনে পড়লো। কিন্তু আমি মরিনি। আমি আরও কিছু মৃত্যুকে দেখবো। যে কলকাতাকে ঘৃণা ক'রে আমি মরতে চেয়েছিলাম, সে কলকাতা আছে। যে কারণে মরবো ভেবেছিলাম, সে কারণগুলোও আছে। তবু বাঁচা যায় কিনা, আমি আরও একবার দেখবো। দেখতে চাই।

মধ্যরাতে জনহীন, স্তব্ধ, নিদ্রিত নগরীর পথে হাঁটতে-হাঁটতে, পরিচিত অথচ চিরদিনের অপরিচিত, অনাত্মীয় নগরীর রুদ্ধদ্বারে নিজেকে অনাহূত অবাঞ্ছিত ব'লে আবিষ্কার ক'রে, একা একা আর নিঃসঙ্গ, পরিচয়হীন ঠিকানাহীন পরবাসীর মতো ক্লান্ত, অবশ

আর সামর্থ্যশূন্য শরীরটাকে টেনে এনে যেখানে এসে থামলো অমিত, সেখানেই হ্যারিসন রোডের শেষ। দূরে শিয়ালদা স্টেশন। স্টেশনের বড়ো ঘড়িতে রাত তখন তিনটে চল্লিশ। টলতে টলতে আরও কিছুটা এগিয়ে এসে ফ্লুরোসেন্ট আলো-জ্বলা স্টেশনের মেঝেতে এক চিলতে জায়গা খুঁজে নিলো। হাতের সুটকেশটা নামালো, কাঁধের ব্যাগটাও। তারপর মাদুরটা কোনোমতে ছড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলো। আর ভাবতে লাগলো —স্টেশনেই যদি রাতটা কাটাবো, তবে কষ্ট ক'রে এতোদূর কেন এলাম? এক স্টেশন থেকে আবেক স্টেশনে?

আট

বারান্দার রেলিং-এ দাঁড়ালেই ওই দৃশ্য চোখে পড়ে। অসহ্য লাগে। বিলাসবাবুর সংসার। ওদের জানলা। মেয়েটির করুণ মুখ, নইলে সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রশান্ত ছবি, ছবির নীচে পেবেকে ঝোলানো রেন-কোট। মনে হয় যেন আত্মহত্যার পরেও মানুষটা ঝুলছে। কবে যে বর্ষা আসবে। দৃশ্যটা দেখতে হবে না আর।

কলেজ থেকে ফিরে একা ঘরে বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি লাগে আজকাল। বেরোতেও ভালো লাগে না। কোথায়ই বা যাবো। কিন্তু ঘরে থাকলে চিন্তাগুলো মাথার শিরা-উপশিরায় টান দেয়। সমস্যা অনেক, সমাধান নেই। অনেক কথা, অনেকের কথা ভাবতে হয় এক সঙ্গে। অথচ শক্তি নেই, অতো কিছু চিন্তা করার মতো শক্তি। তৃপ্তি ক্লান্ত বোধ করে। মমতার জন্য সারাক্ষণ মনটা ছটফট করে, ক্লাসে ছাত্রীদের দিকে তাকালে মমতাকে মনে পড়ে। কাঁদছে। অন্যায় ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটি জীবন। নষ্ট হয়ে

যাচ্ছে অমিত। কি করছে দেশে? তিনটে চিঠি লিখলাম, উত্তর পেলাম না একটারও। আবার যদি একটা কিছু করে থাকে? আর সত্যি যদি একটা কিছু হয়? সেকথা ভেবেই মনে মনে একবার আঁৎকে উঠলো তৃপ্তি। এমন মতিভ্রম হয় কেন মানুষের? এমন ছন্নছাড়া? মাঝে মাঝে বাড়ির কথা মনে পড়ে। মার জন্য দুঃখ হয়। বাবাকে ভয় করলেও বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে তো অসম্ভব। নিজের সংসারের কথা মনে মনে চিন্তা ক'রে ওই দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারি কই? আস্তে আস্তে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে কল্যাণ। ওর কাজ বাড়ছে অফিসে। জীবিকা কি জীবনের চেয়ে বড়ো? সংসারের মোটামুটি চাহিদা মেটানোর জন্যই চাকরি। কিন্তু সংবাদিকের জীবনে নাকি তার চেয়েও বড়ো কিছু আছে—আদর্শ। কিন্তু আদর্শের চেয়ে বড়ো কিছু নেই? অন্তত আদর্শের মতো গুরুত্বপূর্ণ? সামাজিক দায়িত্ব, পারিবারিক কর্তব্য। আজকাল আর এক সঙ্গে বেরোনোই হয় না দুজনে। আগে মাঝে মাঝে নিধুর-মাকে ছুটি দিয়ে বিকেলের খাওয়াটা খেয়ে আসা হতো চৌরঙ্গি বা অন্য কোথাও। মুসলমান বা চাইনিজ রোস্তোরাঁ, কিংবা পুরো সাহেবিখানা। সে ওসব অনেকদিন হয়নি। স্বাদ ভুলে যাচ্ছি। শুধু শৌখিন-খানার স্বাদ নয়, অন্য অনেক স্বাদ। যা এতো সহজে ভোলার কথা নয়, ভোলা উচিতও ছিল না।

কলেজ থেকে ফিরে, গা-হাত ধুয়ে, শাড়ি বদলে নিজ হাতেই চা ক'রে খেয়েছে তৃপ্তি। বিষণ্ণ মনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ভাবছিল একা একা। রেলিং-এ জোড়া-হাতে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিল। সরু গলি। কখনও কখনও পাড়ারই কিছু পরিচিত মুখ, আবার বেশির ভাগই সম্পূর্ণ অপরিচিত নর-নারীর আসা-যাওয়া। কখনও দু'-একটা রিকশা, ঠেলাওয়ালা, সাইকেল। পুরুষগুলো যেতে যেতে আড়চোখে উপরের দিকে তাকায়। গন্ধ পায়। তৃপ্তি নড়ে না। অবাক লাগে, যখন আঠারো-উনিশ বছরের ছোকরাগুলোও আসতে

যেতে একবার চোখ তুলে যায়। হতাশ হয় না খুশি হয় বোঝা যায় না ঠিক। কিন্তু মনে মনে করুণা করে তৃপ্তি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সকলকে। নানা বেশভূষার হরেকরকম মানুষ। কেউ ধুতি পাঞ্জাবি, কেউ কোট-প্যান্ট, কেউ পায়জামা-শার্ট, কেউ লাল গেঞ্জি কালো-প্যান্ট, গলায় রুমাল। কারও চশমা আছে, কারও নেই। কখনও কখনও একটি কি দুটি মেয়ে, কখনও একদল। তৃপ্তি ওদের শাড়ি পরা আর সাজ-গোজ দেখেই বুঝতে পারে কোন ধরনের সংসারে কার বাস। ওদের চলা-বলা হাসিতেই ধরা যায়, কার হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগ হাড়ি-খুন্তির সংস্পর্শে বেমানান, আর কার হাতে কলেজ-ইউনিভারসিটি-অফিসে একলা পথ চলার নিয়মিত অভ্যাসে অদ্ভুত মানিয়ে গেছে। পুরুষগুলো ছদ্মবেশী। ওরা বাইরে এসেও ঘরটাকে আড়ালে রাখে। চলনে-বলনে ওদের চেনা মুশকিল।
প্রচণ্ড শব্দ তুলে দরজা খোলার শব্দ হলো ঘরের ভিতর। চমকে উঠলো না তৃপ্তি। আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকলো। যা ভেবেছিল তাই। ঝন্টু। চৌকাঠের কাছে চটি খুলে সটান গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো—'এককাপ চা খাওয়াও তো বৌদি। ভীষণ ক্লান্ত।'
'কী এমন দিগ্বিজয় ক'রে এলে শুনি—' তৃপ্তি এগিয়ে এলো কাছে। বড়ো ভালো লাগছে ঝন্টুকে পেয়ে। যেন ওকেই মনে মনে খুঁজছিল মনে হলো। অবসন্ন মনটাকে একটু শান্তি দিতে পারে এমনি একজন ছোটো ভাই-এর মতো বন্ধু। খাটের পাশে এসে তৃপ্তি চোখ-ভ্রূ কুঁচকালো—এ কি চেহারা হয়েছে তোমার। স্নান করোনি? জামা-ধুতি নোংরা কেন এতো?'
'দিগ্বিজয় মানে, ভয়াবহ রকমের জয়—' তড়াক ক'রে উঠে বসলো ঝন্টু—'কুরুক্ষেত্র নয়, স্যালামিস্ নয়, হলদিঘাট নয়, একেবারে এযুগের স্ট্যালিনগ্রাড।
'কেন, তুমি কিছু জানো না, তোমাদের কলেজে হয়নি কিছু?'
'কি স্ট্রাইকের কথা বলছ? হ্যাঁ মেয়েরা ঢুকতেই দিচ্ছিল না ভিতরে।'

'গুড্, কেন দেবে? ঠিক করেছে।'
'তুমি ওই নিয়ে মেতেছিলে বুঝি?'
'মেতেছিলাম মানে? সকালে স্ট্রাইক করেছি। দুপুরে ছাত্রদের একটা মিটিং ছিল ইউনিভারসিটি হলে। সেখানে বক্তৃতা দিয়েছি। তারপর মিছিল ক'রে গেছি ময়দান। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তো ওখানেই ছিলাম। মিটিং শেষ ক'রে এই সোজা তোমার কাছে এলাম।'
'ওতে অতো বড়াই করাব কি আছে। ও রকম আমিও ঢের মিটিং-মিছিল ক'রে বেড়িয়েছি এক সময়। জানো, আমি দু'বারই ইলেকশনে জিতেছিলাম। অফিস-বেয়ারার পর্যন্ত ছিলাম সিকস্থ ইয়ারে।'
'উঃ, বৌদি প্লিজ, এবার নিয়ে ন'শো নিরানব্বুই বার হলো। আর কতবার শোনাবে? তার চেয়ে কিছু খাওয়াও না ছাই। সত্যি ভীষণ খিদে পেয়েছে। কাল সারারাত জেগে ইউনিভারসিটিতে পোষ্টার লিখেছি। আজ দুপুরে একবার ক্যান্টিনে খেয়েছি মাত্র।'
'তাতে কী এমন মহাকাজ করলে শুনি। পড়াশুনা ছেড়ে নাওয়া নেই খাওয়া নেই—শুধু হৈ-হৈ আর হৈ-হৈ।'
'দাউ দাউ টু ব্রুটাস, তুমিই না একদিন ইউনিয়নের মেম্বার ছিলে বৌদি?'
'তা ছিমাম, কিন্তু তোমাদের মতো ও রকম বাউণ্ডুলে ছিলাম না।'
'ওরে বাবা, তাহলে আর রক্ষে আছে? কোনো মেয়ে একদিন ক্লাসে নখ কেটে না এলেই দেখি ক্লাসে ফিশফিশ শুরু হয়ে গেছে। তার উপর স্নান না ক'রে, দাঁত না মেজে, চুল না বেঁধে এলে, শাড়ির ভাঁজ না থাকলে রেহাই আছে।'
'এ সবই হচ্ছে বুঝি আজকাল? মেয়েদের নিয়ে ঠাট্টা করছো আমার সামনে? সাহস তো কম নয়। দেবো কানটা মলে। হাসতে হাসতে সত্যি হাতটা বাড়ালো তৃপ্তি।
কিন্তু কান বাঁচাতে ব্যস্ত হলো না ঝণ্টু—কই, ডাকো না তোমার

নিধুর-মাকে। কি রকম মেয়ে তুমি বৌদি ? শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়োনি। শুনেছি, বাঙালি মেয়েদের নাকি খাইয়েই আনন্দ।'

'কি খাবে বলো তো। এতো রাতে চা নাই খেলে। তুমি বরং হাত-পা ধুয়ে ভাত খেয়ে নাও সারাদিন খেটেখুটে এসেছো।'

'ভাত ? সে কি, তোমাদের কম পড়বে না। সেজদা কোথায় ?'

'সেসব ভাবতে হবে না তোমাকে। গুরুজনের কথা শুনতে হয়। যাও, হাত-পা ধুয়ে এসো। তোমার দাদার একটা লুঙ্গি পরে নাও। তোমার সেজদার এখন আবার ইভনিং-ডিউটি। ফিরতে রাত হবে। যাও, শিগ্‌গির ওঠো।'

ভাগাভাগি বাড়ি। চারটে পরিবারের জন্য তিনটে কলতলা, দুটো পায়খানা, বাথরুম। ঝণ্টুকে একতলা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে তৃপ্তিও নেমে এলো। উদ্দেশ্য—সুন্দরীদির ঘর থেকে নিধুর-মাকেও তুলে নিয়ে যাবে। সিঁড়ির মুখে জানলা-গলানো আলোয় দেবরের পাশাপাশি দাঁড়ালো তৃপ্তি। পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভাঙলো। কেমন যেন লাগে ঝণ্টুর দিকে তাকালে। ভালো লাগে। ঈর্ষা হয়। প্রায় বছর পাঁচেকের ছোটো হবে ঝণ্টু। ইউনিভারসিটিতে পড়ে। ওই একই বয়স ছিল অমিত, কল্যাণ, সুনীল, প্রণব ওদের। একই বয়সের ছিল তৃপ্তি, বিনতা, অঞ্জলি, উমার। ওই বয়সটার একটা অন্য মাদকতা আছে। হয়তো ঝণ্টুও ওর দাদার মতো। বৌদিকে দেখে হয়তো সাহস বেড়েছে ওর। কি হবে ঝণ্টু। কল্যাণ না অমিত ? ও কি ভালোবাসে কাউকে ? কজন বান্ধবী আছে ওর ?

'কী হলো, কী দেখছো ? আমার স্বাস্থ্য ?' সিঁড়ির শেষ কয়েক ধাপ আগে বৌদির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো ঝণ্টু। হাতা-কাটা গেঞ্জিতে ঢাকা শীর্ণ বুকের উপর হাত বুলিয়ে বললো—'দেখছো, কি রকম মোটা হচ্ছি দিন-দিন ?'

'আচ্ছা, তোমরা সবাই এ রকম হচ্ছো কেন বলো তো ঝণ্টু। শুধু তুমি না, আজকাল অনেক ছেলেকেই তো দেখি। ঠিক মতো স্নান

করবে না, খাবে না। সব সময় পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরবে, নয়তো বুকের নীচে বই গুঁজে প'ড়ে থাকবে। কেন, তোমরা স্বাভাবিক হতে পারো না? একটু সময় মানতে পারো না? উচ্ছৃঙ্খল না হ'লে এ যুগে প্রতিভাবান হওয়া যায় না বুঝি?'

ঝণ্টু হাসলো—'তাই ভেবে দেখলাম বৌদি, সেজদাকে দিয়ে কিছু হবে না। সারাদিন খুব টিপ্‌টাপ। ওকে নিয়ে তো তোমার কোনো ভাবনাই নেই।'

নিতান্তই মামুলি একটা কথা। নেহাতই ঠাট্টা। কিন্তু হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলো তৃপ্তি কথাটা শুনে। কলতলায় বাসন মাজছিল নীচের তলার আরেক ভাড়াটেদের মেয়ে গোলাপী। প্রায় চোখের উপরই নন্দবাবু গিয়ে একটা বাথরুমের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। আরেক বাথরুমের দখল নিতে তৃপ্তিকে এতো জোরে ছুটে যেতে হলো যে, ঝণ্টুর কথার কোনো উত্তরই দিতে পারলো না।

সামনে বসে ঝণ্টুকে খাওয়াতে বসালো তৃপ্তি। নিধুর-মা ভাতের থালা সামনে পেতে রেখে গেলো। থালার কোণ থেকে শাকটা টেনে এনে ভাতের সঙ্গে মেশালো ঝণ্টু। মাখলো। প্রথম গ্রাস মুখে তুলে আঙুলের ডগায় একটু নুন নিয়ে ভাতটা আবার মাখলো। তৃপ্তি ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ঝণ্টু ঠিক কল্যাণের মতো। চেহারায়, কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে, স্বভাবে। অন্তত ইউনিভারসিটিতে কল্যাণ যা ছিল। ঝণ্টুকে ভালোবাসে তৃপ্তি। ছোটো বোন মমতাকে যেমন ভালোবাসত একদিন। ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে মমতাকে মনে পড়লো আবার—'তুমি একটা কাজ করতে পারবে ঝণ্টু?'

'কি কাজ?'

'আগে বলো, পারবে কিনা।'

'পারবো না মানে? আলবাত পারবো। তোমার জন্যে কী না করতে পারি। জান কবুল করনে ভি সাকৃতা। রামায়ণের লক্ষ্মণ ব্যাটাকে নিয়ে বহুদিন ধরে লোকে বড্ডো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। ওর রেকর্ড ভাঙা দরকার।'

'না, না ঠাট্টা নয় ঝন্টু, সিরিয়াসলি বলছি।'

'আচ্ছা কাজটা কি, সেটা বলবে তো।' শাকের পালা চুকিয়ে নতুন ক'রে ভাত ভাঙলো। নিধুর-মা ডালের বাটি রেখে গেছে।

'ডিগবয় যেতে পারবে? আসাম?'

'সে তো তোমার বাপের বাড়ি।'

'হ্যাঁ, গোপনে যাবে, একটা ঠিকানা দেবো সেখানে দেখা করবে। আমাদের বাড়ি নয়।' নেহাতই ঝোঁকের মাথায় কথাটা পেড়ে বসেছে তৃপ্তি। বলতে গিয়ে খেয়াল হলো, প্রস্তাবটা কত ছেলেমানুষি। নিজের কাছেই খারাপ লাগছে, ভাবলো আর এগোবে কিনা।

'হুঁ, অতঃপর কর্তব্য?'

'তৃপ্তি চশমার ব্রিজটা একটু নাকের গোড়ায় ঠেলে দিলো। ঝন্টু মাথা নুয়ে খাচ্ছে, ওর খাওয়া দেখতে দেখতে ভাবলো, প্রসঙ্গটা চাপা দেবে কিনা।

'কী হলো, বলো, তারপর কি করতে হবে।' মুখে ভাত নিয়ে ঝন্টু মাথা তুলে তাকালো।

'একটি মেয়ে খবর পেয়ে তোমার কাছে আসবে। মুখ দেখে অনুমান করতে পারবে সে কে। কিন্তু তাকে তুমি দেখোনি কোনোদিন। মেয়েটি যেভাবে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে, এক-কাপড়ে হলেও সেভাবে তাকে নিয়ে তুমি সোজা এখানে চ'লে আসবে।'

'মানে—' মুখের ভাত বোধহয় গলায় আটকাল ঝন্টুর। একটু জল খেয়ে কাশিটা শান্ত করলো—'কী বলছ তুমি, মানে ইলোপ?'

'প্রস্তাবটা অবাক লাগছে?'

'তোমার হয়েছে কি বৌদি? মাথা-টাথা খারাপ?' থালা থেকে হাত তুলে নিয়ে ঝন্টু সোজা হয়ে বসলো—'ডিগবয় থেকে কলকাতা পর্যন্ত কয়েক শো রেলওয়ে স্টেশন আছে জানো! আর প্রত্যেকটা স্টেশনেই প্রায় ডজনখানেক ক'রে গাট্টাগোট্টা দারোগা-কনেস্টবল্

আছে, তা জানো? সেখানে তুমি আমাকে হঠাৎ কী এমন পালোয়ান ঠাওরালে?'

তৃপ্তি জানতো, এসব অবাস্তর কথা। ধোপে টিকবে না। টিকতে পারে না। কিন্তু নানা ভাবনায় চিন্তাটাকে এক ক'রে গোছাতে গেলে মনটা বারবার বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কাজের কথা ভাবতে গিয়ে সমাধান যখন অসম্ভব হয়ে ওঠে তখনই ক্লান্ত মাথাটাকে ঠাণ্ডা করতে সমস্যাটাকে অন্যভাবে ভাবতে ইচ্ছে করে। যা হয় না, হতে পারে না, তেমনি সব আজব রূপকথার মতো ক'রে সমস্যাকে সাজাতে ভালো লাগে। হাঁটু-দুটোকে পিরামিড ক'রে, হাঁটুতে থুত্‌নি ডুবিয়ে পায়ের নখ ঘসছিল তৃপ্তি। ঝণ্টুর পরিহাস কানে এলেও কিছু বললো না। এক পলকে পায়ের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। হঠাৎ ছোটো একটা দীর্ঘশ্বাসে বুকের হাঁপর টেনে সোজা হয়ে বসলো—'কী হলো, তুমি খাচ্ছো না কেন ঝণ্টু? ও কি, বেগুন-ভাজাটা প'ড়ে রইলো যে! খাবে না?' এতো কথার ভিড়েও দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা কানে গেলো ঝণ্টুর। খাওয়া বন্ধ রেখে চোখ তুলে তাকালো। ঝণ্টু বদলে গেলো এক মুহূর্তে—'তোমার কি হয়েছে বৌদি?'

'কই, কিছু না তো।'

'লুকচ্ছো।'

'না না লুকবো কেন,'—তৃপ্তি হাসতে চেষ্টা করলো কষ্ট ক'রে—'সত্যি বলছি, কিছু হয়নি।'

'বেশ।' ঝণ্টু গম্ভীর হয়ে আবার থালার উপর হাত ফেললো। ঝুঁকে বসলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তৃপ্তি নিজেই আবার কথা বললো—'জানো ঝণ্টু, আমার একটি ছোটো বোন আছে। যদি সুযোগ হতো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম। বোধহয় তুমি একজন ভালো বন্ধু পেতে।'

'জানি, মমতা নাম। তোমার কাছেই তো শুনেছি। থার্ড ইয়ারে পড়ে।'

'হ্যাঁ।'

'একটু আগে ওরই কথা বলছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, বেচারি কলকাতা আসতে চায়। কিন্তু বাবা কিছুতেই দেবেন না।' তৃপ্তি একটু থেমে কথাগুলো মনে-মনে সাজিয়ে নিলো—'পাকিস্তান হবার আগে সেই ছেলেবেলায় বার দুয়েক ঢাকা গিয়েছিল। তারপর ডিগবয় শহর ছেড়ে আর বেরোয়নি কোথাও। ওর বড্ডো শখ, কলকাতাটা একবার ঘুরে যায়।'

'ঠিক তা নয় বৌদি, নিশ্চয়ই আব কিছু ঘটনা আছে এর মধ্যে—' 'ঝন্টু ম্লান হাসলো—'নইলে তুমি ওরকম বেফাঁশ একটা আজগুবি প্রস্তাব করতে না। যাক গে, ঘটনাটা সত্যি সত্যি কি, সে আমি জানতে চাইছি না।'

'জেনেই বা কি করবে ভাই? কতটুকুই বা করতে পারবে'—রুগ্ন-কাতর গলায় যেন কথা বলছে তৃপ্তি। তেমনি শান্ত. মোলায়েম, টানা-টানা কণ্ঠস্বর—'বড়ো বোন হয়ে আমি নিজেই যেখানে অধিকার হারিয়েছি, আমারই যেখানে কিছু করার নেই সেখানে তোমরা কতটুকুই বা পারবে?'

নিঃশব্দ হলো দুজনের ব্যবধানটুকু। ঝন্টু বুদ্ধিমান ছেলে। ঠিক কল্যাণের মতো। তৃপ্তি জানে। কৌতূহল রয়ে গেলো। সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে আর কিছু জানতে চাইবে না। কিন্তু পরে অনেক কথার মধ্যে ইঙ্গিত খুঁজে পেয়ে আসল ব্যাপারটা ঠিক জেনে নেবে। সে ক্ষেত্রে সাবধান হ'তে হবে আমাকে। ঝন্টুর ডাল-ভাত শেষ হয়নি তখনও। নিধুর-মা মাছের বাটি রেখে গেলো সামনে। তৃপ্তি দেবরের নোয়ানো মাথার দিকে তাকিয়ে রইলো। ভিতরে-ভিতরে আরও একটা রূপকথার স্বপ্ন গ'ড়ে তুললো। ঝন্টুর সঙ্গে মমুর যদি দেখা হয় কোনোদিন! যদি ভালো লাগে দুজনের দুজনকে। তবে সেদিন—আর ভাবতে পারলো না তৃপ্তি। একটা আরশোলা ছুটে যাচ্ছিল ঝন্টুর থালার দিকে। তৃপ্তি ঝুঁকে প'ড়ে ওটা তাড়িয়ে দিলো।

'তোমার বাবা কেমন আছেন ঝণ্টু? মা?'

'বাবা তো ভালোই। মার বোধহয় দাঁতের ব্যথাটা বেড়েছে আবার।'

'বোধহয কেন, মা'র খবর জানো না।'

'কী ক'রে জানবো? আমি তো সেই সকাল নটায় ইউনিভারসিটিতে এসেছি। তখন দেখে এসেছিলাম গরম জল দিয়ে কি সব করছেন। এখন কি রকম আছেন কী ক'রে বলবো?'

ঝণ্টুর দিকে তাকালে অনেক পুরোনো কথা মনে প'ড়ে যায়। পুরোনো সুখ, পুরোনো জীবন। ভারতের পূর্বপ্রান্তে পেট্রলের খনি, ছোটো শহর, ছোটো একটা সংসার। ঝণ্টু যেন নির্বাসিতের কাছে, স্বদেশে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা। একটি সংসারেব সুখ-দুঃখের খবরের মধ্যে যেন দুটো সংসারেরই ছবি ভেসে ওঠে। তখন, তখন ভালো লাগে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে, অনেক, অনেক কিছু জানতে। 'আজকাল ওঁরা বলেন না কিছু? কোনো কথা হয় না?'

'কী কথা?'

'এই তোমার সেজদার কথা, আমার কথা।'

ঝণ্টু হাসলো—'সে তো চিরকালই হবে বৌদি। ওঁরা যতোদিন বাঁচবেন ততোদিনই বলবেন। মা শুধু মাঝে মাঝে সেজদার জন্যে ঘ্যানর-ঘ্যানর করেন। দেখতে চান।'

'আমি তো তোমার দাদাকে প্রায়ই যেতে বলি। কিন্তু না গেলে কি করবো বলো।'

'সেজদা যাবে না। তুমি একদিন চলো।'

'আমি?' তৃপ্তি আঁৎকে উঠলো—'বালো কি ঝণ্টু, তাহলে রক্ষে আছে?'

'কিচ্ছু হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, আমি থাকতে কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারবে না। সাহসই পাবে না।'

'কি করবে তুমি?'

'সে তুমি গেলেই দেখতে পাবে কি করতে পারি। যাবে বৌদি? মা

তোমাকে দেখেননি কোনোদিন। না দেখেই এতো কাণ্ড করেছেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' দুই জাঁদরেল ছেলে-বৌ নিয়ে জ্ব'লে-পু'ড়ে মরছেন। তোমাকে দেখলে তার ভুল ভাঙবে। তুমি চলো।'

তৃপ্তি হাসলো—'বড়ো বৌদি, মেজ বৌদি কি এখনও সেরকমই আছেন নাকি?'

'সেরকম মানে,—' একমুখ ভাত তাড়াতাড়ি গিলে চোখ বড়ো বড়ো ক'রে উঠলো ঝন্টু—আরও দ্বিগুণ বেড়েছে। মেজদা তো ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে শিগগিরই। বড়দাও হলো ব'লে। উঃ, তুমি বিশ্বাস করবে না বৌদি। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মেয়েরা যে কি বীভৎস হতে পারে, ওদের না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। কী স্বার্থপর, কী ছোটো মন! আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি বৌদি। ওই আবহাওয়ায় কোনো ভদ্রলোক বাস করতে পারে না।'

'ছিঃ, ওসব বলে না ঝন্টু। বলতে নেই। এখন তুমিই তো ভরসা। বুড়ো বাপ-মা।'

'বাপ-মা কি শুধু আমার একার নাকি? বড়দার না, মেজদার না? বৌদের কথায় ওরাও যদি বুড়ো বাপ-মায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে তবে আমি কি করবো?—' মাছের বাটি থেকে দুটো আলু তুলে নিলো ঝন্টু। থালার উপর রেখে আঙুল টিপে দুভাগ করলো—'আমি কি ভাবি, জানো বৌদি? ওরা আলাদা হ'তে চায় হোক। কালই হোক। তা হলেই তোমাকে ওরা চিনবে। তখন বিপন্ন বুড়ো-বুড়িকে সাহায্য করতে যাবে তোমরা। নিশ্চয়ই যাবে। এতদিন তোমাকে যারা বুঝতে পারেনি; তখন বুঝবে। বুঝবে—ঘোষের মেয়ে কি কায়েতের মেয়ে হলেও ওরকম চাটুজ্জে-মুখুজ্জে বংশের অনেক মেয়ের চাইতে হাজারগুণে ভালো। এম-এ পাশ করলেও সব বাঙালি মেয়েই উগ্র আধুনিকা হয়ে ওঠে না। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো বৌদি, আজই একটা কিছু ক'রে ওদের সেটা বুঝিয়ে দিতাম।'

বাঁ-হাতে ডানহাতের চুড়ি নাড়ছিল তৃপ্তি। মৃদু হাসলো—'একি নিধুর-মা! ঝণ্টুকে ভাত দিয়ে যাও! তাড়াতাড়ি এসো।'

'না, বারণ করো, বারণ করো। আর লাগবে না। সত্যি পেট ভ'রে গেছে।'

'নাও, নাও। তুমি খেলে ভাতে কম পড়বে না আমাদের। নাও—' থালার উপর পড়লো দুহাতা ভাত। বাটিতে বাড়তি একটু মাছের ঝোল। দুটো আলু।

'তোমার সেজদার মতো তুমিও ভুল কোরো না ঝণ্টু।'

'কিসের ভুল?' ঝণ্টু তাকালো।

'তোমার দাদা যে ভুল করেছে কিংবা বলতে পারো, আমি যে অপরাধ করিয়েছি। বুড়ো বাপ-মা। ওদের দুঃখ দিতে হচ্ছে ব'লে আমরাও কষ্ট পাই।'

ভাত মুখে দিতে-দিতে ঝণ্টু চোখ তুললো—'হুঁ'—

'হুঁ, মানে?'

'উপায় নেই বৌদি।' ইংরেজিতে একটা কথা আছে শুনেছি। দুনিয়ার সব লোককে নাকি এক সঙ্গে খুশি করা যায় না। অর্ধেক মানুষের মন রাখতে যাও, দেখবে বাকি অর্ধেক ঠিক চ'টে আছে। কিছুই করার নেই।'

খাওয়া শেষ হলো। ঝণ্টু উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তিও।

'ঝণ্টুর আঁচাবার জল দিয়েছো নিধুর-মা? যাও ঝণ্টু, ওখানে বারান্দায়। রেলিং-এর পাশে পাইপের ঝাঁঝরিটায়। জানোই তো সব।'

কথায়-কথায় রাত হলো। রাত দশটা। তৃপ্তি বললো—'এতো রাতে বাড়ি যাবে এতোদূর? সেই শ্যামবাজার। থেকে যাও না আজ?'

'কোথায়?'

'কেন, গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছো নাকি? ঘর নেই আমাদের?'

'কিন্তু সে তো একটা।' ঝণ্টু সকৌতুকে বৌদির দিকে তাকালো।

'কী বললে ?—'তৃপ্তি অল্প হেসে বললো—'বাচ্চা ছেলে, ডেঁপোমি তো কম শেখোনি। নাও, নাও, জামাটা খুলে ফেলো। এক ঘরেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে একটা।'

বৌদির কাঁধে হাত রেখে খুব দিল্‌খোলা হাসির সঙ্গে ঝণ্টু বললো—'আজ থাক বৌদি। আধুনিক নীতিশাস্ত্র এসম্বন্ধে কি বলে, দু-চারটে বই উল্টে আর দিনকয়েক ভেবে একদিন বলবো।'

'সেদিনের ছেলে, ইয়ার্কি রাখো। নাও, জামা খোলো।'

'না বৌদি, সেই সকালে বেরিয়েছি! কাউকে ব'লেও আসিনি। মা ভাববেন।'

ঝণ্টুর চ'লে যাবার পথে ঠিক দরজার মুখেই কল্যাণের সঙ্গে দেখা হলো দুভাইয়ের। কল্যাণকে ক্লান্ত দেখালো। ফোলিও-ব্যাগের ভারটুকুও বইতে পারছে না।

'কখন এসেছিস্ ?'

'অনেকক্ষণ।'

'মা কেমন আছেন ?'

'ভালো।' ঝণ্টু বৌদির দিকে তাকালো।

'বাবা ?'

'ভালো।'

'এতো রাতে যাচ্ছিস, খেয়ে যা না!'

'খেয়েছে। থাকতে বললাম, থাকলো না।' কল্যাণের কথার উত্তর দিয়ে তৃপ্তি দেবরের দিকে তাকালো—'গেলে তাড়াতাড়ি যাও ঝণ্টু। রাত কোরো না। পয়সা লাগবে আর কিছু ?'

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে, হেসে, এক পলকে লাফাতে-লাফাতে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলো ঝণ্টু। তৃপ্তি এগিয়ে দেবার সুযোগও পেলো না।

ঝণ্টু চ'লে যাবার পর ব্যাগটা বুক-শেলফের মাথায় আর ঘড়ি-চশমা টেবিলের উপর রেখে চোখ বুজে কিছুক্ষণ চেয়ারে ব'সে

রইলো কল্যাণ। অফিসে কাজের চাপ দ্বিগুণ হয়ে বেড়েছে, তার উপর ছুটোছুটি। ঘরে ফেরার পরও অবসন্ন মনে হয়। ভালো লাগে না কিছুতেই। না কিছু পড়ায়, না লেখায়। অথচ ঘরে ব'সে করার মতো কাজও আছে অনেক। বোম্বে, দিল্লীর কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ওদের 'ফিচার' পাঠাতে হবে। পেশার প্রয়োজনেই কিছু পড়া দরকার। অথচ সময় থাকলেও মন থাকে না। দিন-রাতের চব্বিশটা ঘণ্টা আর মাসের ত্রিশটা দিনই যেন আস্তে আস্তে অফিস বা পেশা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘরের জন্য, তৃপ্তির জন্য কিছুটা সময় রাখা প্রয়োজন, কল্যাণ বোঝে। অথচ হাজার চেষ্টা ক'রেও কুলিয়ে উঠতে পারে না। অসম্ভব মনে হয়।

মেজাজ আর মর্জির জন্য তৃপ্তিকেও অপেক্ষা করতে হয়। সারা-দিনের পর ঘরে ফিরেছে মানুষটা, ওর একটু পরিচর্যা দরকার, একটু একা থাকতে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রাত প্রায় দশটা-এগারোটার সময় ফিরলে কীই-বা করার থাকে। রান্নাঘরে কয়েকটা টুকিটাকি কাজ সেরে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে এসেও ঘরে ফিরে দেখলো, কল্যাণ ব'সে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে, চোখ বুঁজে দু'আঙুলে কপাল চেপে।

'কি হলো, মাথা ধরেছে ?' তৃপ্তি কাছে এসে দাঁড়ালো।

সচকিত হলো কল্যাণ—'উ কি বললে! কই না তো, না মাথা-টাথা ধরেনি। ও কিছু না।'

'তাহ'লে বসে আছো যে। ওঠো, হাত-পা ধোও, কাপড় ছাড়োনি এখনও!'

'হ্যাঁ, উঠছি,—' কল্যাণ উঠে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে—'আর পারি না তৃপ্তি। ভীষণ কাজ বেড়েছে অফিসে। বিশ্বাস করবে না কী অসম্ভব খাটুনি।'

'কিন্তু এভাবে চললে চলবে কেন। একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারো না বাড়ি। একটু বিশ্রাম তো দরকার।'

'আর বিশ্রাম—কল্যাণ নিঃশ্বাসে হাসলো। স্ত্রীর দিকে তাকালো। স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলো। একটা মুহূর্তের জন্য চোখে চোখ রাখলো দুজন—'বোধহয় ওরা বিশ্বাস করে না তৃপ্তি, আমার একটি বৌ আছে ঘরে।'

তৃপ্তি হাসলো। মৃদু স্পর্শে স্বামীর কব্জি ধ'রে হাতটা কাঁধ থেকে নিজের মুঠোয় টেনে নিলো—'বিশ্বাস ওরা করে কিন্তু তুমিই ভুলে যাও। যাওতো, রাত হয়েছে। হাত-পা ধুয়ে নাও। সারাদিন খেটেখুটে এসেছো।'

খেতে দিতে গিয়ে নিধুর-মা অবাক হলো দুজনের মূর্তি দেখে। ইচ্ছে ছিল, খাবার সময়ই ওদের দুজনেরই মনটা বেশ ভালো থাকে তখনই কথাটা পাড়বে। ভাইঝির বিয়ে। খবর এসেছে দেশ থেকে। দিনকয়েক ছুটি চাইবে দেশে যাবার। কিন্তু আজ দু'গ্রাস ভাত মুখে উঠতে না উঠতেই দুজনের মাথা বিগড়ে গেলো হঠাৎ।

'চিঠিটা লিখেছো ?' তৃপ্তি জিজ্ঞেস করলো ডাল-ভাত মাখতে মাখতে। কল্যাণ সাড়া দিলো না।

'ভুলে গেছো নিশ্চয়ই। আজ নিয়ে তিনদিন।'

'সত্যি ভুলে গেছি—' কুণ্ঠিত হাসিতে ভুলের অপরাধ হালকা করতে চাইলো কল্যাণ—'কাল লিখবো, সত্যি লিখবো। তোমাকে বোঝাতে পারবো না, অফিসে কি কাজ।'

'থাক, ঢের হয়েছে। আর লিখতে হবে না।'

'নাঃ—কাল নিশ্চয়ই লিখবো।'

'কেন লিখবে ?'

'আমার কর্তব্য।'

'দোহাই তোমার, কর্তব্যের দোহাই দিয়ো না। খুব দেখিয়েছ'—রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে তৃপ্তি শক্ত হয়ে উঠলো। চোখ দুটো জ্বলছে—'না হয়, ভুলেই যাও মেয়েটা তোমার কেউ নয়।

কিন্তু সাধারণ একটা মানবতাবোধের খাতিরেও তুমি বুঝতে পারো না, তোমার একছত্র চিঠিতে এ-সময়ে মেয়েটা একটু সান্ত্বনা পেতে পারে। কিছু না হোক, তোমার স্ত্রীর জন্যে যদি কোনো মেয়ে অন্যায়ভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে, অন্তত তোমার স্ত্রীর মর্যাদা রাখতেও তুমি এ-কাজটুকু করতে পারো না? তুমি তোমার স্ত্রীর সম্মান রাখতে পারো না? তুমি—'

'তৃপ্তি—' হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলো কল্যাণ—'ব্যাপারটা এমন কিছু বড়ো রকমের অপরাধ হয়ে যায়নি, যার জন্যে তুমি এতো কথা বলবে। তুমি কি জানো, তুমি কী বলছো।'

'জানি, খুব জানি। আর এ-ও জানি, ভুল বলছি না।'

'সে তোমার আত্মপ্রসাদ।'

পাল্টা জবাব দিলো না তৃপ্তি। নিজের মনেই ফুঁসতে লাগলো। কল্যাণও মাথা নুয়ে খেতে লাগলো। তৃপ্তির খাওয়া হলো না। প'ড়ে রইলো সব কিছু। কল্যাণের কিছুই বাদ পড়লো না।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে এসে প্যাড-কলম টেনে বসলো কল্যাণ। তৃপ্তি তখনও রান্নাঘরে। সারাদিনে অসংখ্য কাজের চাপে একটি চিঠি লেখার মতো সামান্য সময় বাঁচিয়ে নেওয়া যে কত অসম্ভব, তৃপ্তি বোঝে না। কলেজে দু-চারটে ক্লাসের ফাঁকে ঢালাও 'অফ্-পিরিঅড' পাবার ভাগ্য যে সব চাকুরিজীবীর নেই, এই সহজ কথাটা ওর বোঝা উচিত। একটি চিঠির জন্য কতটুকু আর সময় দরকার। দশ মিনিট কি পনেরো মিনিট। কিন্তু সময়ের চেয়েও বড়ো প্রশ্ন আছে সেখানে। যে মন নিয়ে মানুষ চিঠি লেখে, অন্তত এ ধরনের চিঠি, কাজের চাপে সে মন হারিয়ে যায়। চিঠিটি লিখতে বসে বারবার সে কথাই অনুভব করলো কল্যাণ। অকারণে আবার একটা ঝগড়া বাধিয়ে মনটাকে বিষিয়ে দিয়েছে তৃপ্তি। সেই মন নিয়ে চিঠি লিখতে ব'সে ভিতরে ভিতরে তৃপ্তির ব্যবহার-আচরণের বিরুদ্ধে একটা চাপা অভিযোগ গ'ড়ে তুলছিল। অথচ তৃপ্তিরই বোনকে লিখতে হচ্ছে।

অচেনা-অদেখা অথচ নিকটতম আত্মীয়া একটি মেয়েকে স্নেহসিক্ত ভাষায় তার জীবনের এক সঙ্কট মুহূর্তে জীবনের অর্থ, বাঁচার প্রেরণা, মনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ, অনেক গভীর কথা লিখতে লিখতে পিতৃ-শাসনের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মনটা একদিকে যেমন বিদ্রোহী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি নিভৃতে আরও বেশি ক'রে ভালো লেগে যায় তৃপ্তিকে। ছোটো বোনকে ভালোবাসে তৃপ্তি, শুধু ছোটো বোনকে কেন, যে কোনো মানুষকে ভালোবাসার সহজ প্রেরণায় সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতোই আকুল হয়ে ওঠে। ধৈর্য্যের বাঁধ থাকে না, কারণে-অকারণে চঞ্চল হয়ে প্রকাশ পায়। এই ভালোবাসাই আরও ব্যাপক হয়ে, গভীর হয়ে যার জীবনকে অনু-প্রেরণায় সঞ্জীবিত করবে, কল্যাণ জানে, সে জীবন ওর নিজের।

কখন ঘরে এসে বিছানাটা সাজাচ্ছিল তৃপ্তি, লক্ষ্য করেনি কল্যাণ। হঠাৎ চোখ পড়লো। কল্যাণ জানে, অন্তত আজ রাতের জন্য দুজনের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকালে উঠে দুজনেই রাতটাকে ভুলবে। কিন্তু কেমন ইচ্ছে হলো, আজকের এই সাময়িক অভিমান এই রাতটুকুর জন্যও টিকতে দেওয়া উচিত নয়।

তৃপ্তি আস্তে আস্তে আরশির দিকে এগলো। ঘুমনোর আগে তৃপ্তি রোজই একবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। চিঠিটা লিখতে লিখতে কল্যাণ একবার সেদিকে তাকালো। তারপর লেখা বন্ধ করলো—

'জানো, অমিত ফিরেছে।'

ভারি চুলের মোটা বিনুনিটা বুকের উপর এনে ফিতে খুলছিল তৃপ্তি। স্বামীর দিকে তাকিয়েই বললো—'কি ক'রে জানলে, দেখা হয়েছিল?'

'দুপুরে অফিসে এসেছিল।'

'কি রকম আছে দেখলে।' কথাটা যেন এতক্ষণ বিশ্বাস হচ্ছিল না মনে হলো কল্যাণের। বিশ্বাস ফিরে আসতেই ব্যগ্র হয়ে দু'পা এগিয়ে এলো সামনে।

'কি রকম আর, ওর পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই আছে। একগাল দাড়ি

প্রায় বাবরি চুল। নোংরা বিদ্‌ঘুটে একটা পাঞ্জাবি, গোড়ালি-উঁচু পায়জামা। দেখে তো আমি চমকে উঠেছিলাম।'

'আর কিছু বললো?'

'না।'

'আসতে বললে না কেন?'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমাদের এখানে।'

'আসবে না।'

'কেন?'

'ঘর-সংসার-স্ত্রী, শোবার ঘর, হেঁসেল, এ সব গৃহস্থালি দেখলে নাকি ওর দম আটকে আসে। এখানে ও আসবে না।' কল্যাণ হাসলো।

'এ তো ওর বহুদিনের চালু কথা। অদ্ভুত থিয়োরি।' পুরোনো বাদানুবাদের জের টেনেই তৃপ্তি গম্ভীর রইলো। আবার আরশির দিকে ফিরে যেতে যেতে বললো—'আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?'

'না।'

'আছে কোথায়? ঠিকানা রেখেছো?'

'লোকেনদের মেসে।'

'লোকেন! মানে সেই ইডিঅটটা?'

কল্যাণ হাসলো—'আচ্ছা, ওর ওপর এতো রাগ কেন তোমার বলো তো?'

'ওই তো নষ্ট করেছে অমিতকে। এখনও করছে।'

'তা হয়তো করেছে কিন্তু অমিত নিজেই নষ্ট হ'তে জানে।' কল্যাণ টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিলো—আমরা অমিতের মতো হতে চাই না। চেষ্টা ক'রেও কেউ আমাদের ও রকম ক'রে তুলতে পারবে না। তবু অনেককেই হ'তে হয়। না হয়ে উপায় থাকে না—অন্তত ওদের থিয়োরি তাই বলে।'

'কি ক'রে চলছে ওর ? চাকরি-বাকরি ?'

'পুরোনো চাকরিটা তো গেছে। নতুন খুঁজছে। লোকেনদের মেসের কোন এক ভদ্রলোক নাকি একটি বিলিতি মার্চেন্ট অফিসে কাজ দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল। হয়তো হয়েও যেতো। কিন্তু অমিত সাহেবের সঙ্গে দেখা না ক'রেই ফিরে এসেছে।'

'কেন ?' তৃপ্তি উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকালো।

'ওখানে নাকি ওর পোষাবে না। অতো সেজে-গুজে সাহেব-সুবোদের মধ্যে চাকরি করতে ও পারবে না। দুটো স্কুল-মাস্টারির চেষ্টা করছে। বোধহয়, পাবে।'

'পেলেই ভালো।' খোলা-চুল পিঠের উপব ছড়িয়ে দিয়ে তৃপ্তি কাঁধের আঁচলটা টেনে নিলো একটু।

কল্যাণ কিছুই বললো না আর। সিগারেট ধবালো।

নয়

গোমাংস দামে শস্তা, খেতেও মন্দ নয় তেমন। দুটো তন্দুরি রুটি, একটা শিক্-কাবাব, হাফ-ডিশ কারি। মাত্র আট আনায় রীতিমত মোগলাই-খানা। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে অমিত একবার লোকেনের দিকে তাকালো—'বেড়ে রাঁধে কিন্তু এরা। নিবি নাকি দু'পিস্ ? নে, তুলে নে—'

লোকেন খাচ্ছিল না। মুখোমুখি বসে সিগারেট টানছিল। অতিথি-বন্ধুর জন্য শোবার তক্তপোষ থেকে অর্ধেক ভাগ অনায়াসে দেওয়া যায় কিন্তু মাসের শেষ। আতিথেয়তার মাশুল হিসেবে অতিরিক্ত পয়সা খরচের অবস্থা নেই। প্লেট থেকে একটুকরো মাংস তুলে নিয়ে মুখে পুরলো। আঙুল দুটো টেবিলের কোণে ঘষে নিয়ে বললো—

খেতে তো ভালোই লাগে, কিন্তু শালা, পয়সা কই অতো। একটা লটারি-ফটারি পেয়ে যেতাম। বেশ কিছুদিন মজা লোটা যেতো।'

'কি করতিস?'

'মজা লুটতাম। চরিত্তির ব'লে লোকে যে একটা কথা বলে, ওটা নিয়ে একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম।'

'কিন্তু এখনই তোর বাদ যাচ্ছে কোনটা—' একটু রুটির টুকরো মাংসের ঝোলে ভিজিয়ে কিছুটা পেঁয়াজ দিয়ে চিবোতে-চিবোতে অমিত হাসলো—'এ মাসে কদিন হয়েছে?'

'কি?'

'হুটোই। মাল-টাল—'

'মাল টেনেছি—' সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু হিসেব কষলো লোকেন—'দিন দশেক।'

'মাত্র? আর ওখানে—'

'দূর শালা, টাকা কই? মাইনে তো মাত্তর একশো তিরিশ টাকা।'

'তবু—'

'সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর—মাত্তর হুদিন।

'দাঁড়া, আমিও মাইনেটা পেয়ে নিই। আসছে মাসে আবার যাবো—'

'অমিত হাঁকলো—'ইয়াসিন, ছোটো রুটি লাগাও, থোড়া পিঁয়াজ।'

'গাঁয়ে ছিলি কী ক'রে।'

'কেন?'

'মদ-টদ—'

'গৌর সাহার মুদি দোকান। ওই কোথ্‌থেকে সব ব্যবস্থা করতো। দিশি জিনিস।'

'আর—'

'ছুঃ-শ্‌-শালা, ওখানে ওসব হয় না।'

'তাই নাকি, চল গাঁয়ে গিয়েই একটু চরিত্রবান হই।'

'বিশ্বাস কর, গ্রামে গিয়ে একটা মজা দেখলাম—' একটা হাড় থেকে নখ টিপে মাংস বের করতে-করতে অমিত বললো—'গ্রাম দেশে মেয়েদের দেখলে ও রকম কিছু মনেই হয় না মাইরি। আমি তো শালা রাজা ব'নে গিয়েছিলাম। কত আদর, কত ডাকাডাকি! আজ নারকোলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া, কাল পায়েস, পরশু পিঠে—ডেকে ডেকে খাওয়ায়। আর এখানে পোঁছেও না কেউ। যাক গে—'

একটি ছোকরা ছুটে এসে প্লেটের উপর দুটো রুটি আর কিছু পেঁয়াজ কুঁচি ফেলে রেখে চলে গেলো। ও পাশে দুটো কাবুলিওয়ালা নিজেদের ভাষায় কী যে বকছে তখন থেকে তার যেন শেষ নেই। একটু দূরে পিঠ ফিরিয়ে খাচ্ছে একটা বুড়ো মুসলমান। চিনে-মাটির বাসন-ভাঙা-টুকরো দিয়ে সাজানো দেয়ালে হিন্দী-সিনেমার নায়িকার ফোটো। লোকেন সিগারেটে আরামের টান টেনে সেদিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মতো বললো—'ভাল্‌গার।'

অমিত অবাক হয়ে তাকাল—'কি ভাল্‌গার?'

'পেছন ফিরে ভাখ্।' লোকেন দেখিয়ে দিলো।

অমিত পিছন ফিরে তাকালো এবং হাসলো। আবার খেতে শুরু করলো।

'তোর এখন চলবে কী ক'রে—' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে লোকেনই কথা শুরু করলো আবার—'দিনে মাস্টারি করবি। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলোকে নীতি-উপদেশ দিবি আর রাত্তিরে মদ-মেয়েমানুষ।'

মাথাটাকে টেবিলের উপর উবু ক'রে রেখেই অমিত আড়চোখে তাকালো—'তবু ওই বাচ্চাগুলোকে কেউ যদি সত্যিকারের পড়া পড়িয়ে থাকে, আমিই পড়াবো। ওদের ভালো করার যা কিছু আমিই করবো। সে ওই হেড-মাস্টারও পারবে না, আর সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ হেড-পণ্ডিতও না।

'কিন্তু হেড-মাস্টার জানতে পারলে সব যে গোলমাল হয়ে যাবে। ছাড়িয়ে দিতে পারে।'

'হু সে একটা কথা বটে—' অমিত রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো—'ওই হচ্ছে আরেক ঝামেলা। সেখানেই যাবি যেখানেই এই বুড়োগুলো। আরে বাপু, একটা লোক সম্বন্ধে শেষ কথা বলার আগে ভালো ক'রে বোঝ 'মরালিটি'টা কী বস্তু। তা নয়, মদ খায় শুনেই নাক কোঁচকানো। দেখিস না, ঘরে একটা গৃহপালিত নাদুশ-নুদুশ বৌ রেখে বাইরে যারা লম্পটামি ক'রে বেড়ায়, আমাদের দেশে তারাই সবচেয়ে বেশি সতীত্ব-সতীত্ব ক'রে চেঁচায়। আমার দোষের মধ্যে দোষ, আমি ঘরে বৌ রেখে একটা মেয়ের সর্বনাশ করিনি। এই তো?'

'সেটা তো তোর লজিক। ওরা মানবে কেন?'

'আরে সেই তো ঝামেলা—' বিরক্তিতে অমিত নিজেই চোখ-ভ্রূ-কপাল কোঁচকালো—

—'মানবে কেন, মানলে তো ওদেরই বিপদ। আমার লজিক দিয়ে 'আমি নিজেকে সৎ প্রমাণ করতে পারবো না জানি, কিন্তু ওদের খোলশ যে খুলে পড়বে।'

'আমি কি জানি না মদ্যপান নিন্দনীয় এবং বেশ্যাসক্তি গর্হিত কর্ম। জানি, জেনে-শুনেও করি কিন্তু যা করি খোলাখুলি করি। লুকোই না।'

অমিতের হাত থেমে গিয়েছিল অনেক আগেই। লক্ষ্য করেছে লোকেন অমিত আজকাল কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং কারণে-অকারণে নিজের প্রসঙ্গ টেনে আনে। আত্মপক্ষ সমর্থনে অনর্গল ব'কে যায়, খেয়াল থাকে না কোন দিকে। আত্মহত্যার চেষ্টার আগে অন্তত এতোটা ছিল না। লোকেন শুনে গেলো, বাধা দিলো না। জানে, বাধা দেওয়া বিপদ। অমিতের দাড়িতে মাংসের ঝোল তৈলাক্ত চর্বি ঠোঁটে চিক্‌চিক্ করছে। হাতের সিগারেটে কয়েকটা লম্বা টান টেনে চেয়ারের পাশে ফেলে দিয়ে হেসে বললো—'নে খা, খা—তাড়াতাড়ি কর। খুব বকেছিস্।'

একমাত্র লোকেনের মুখেই বকেছিস বা বক্তৃতা জাতীয় শব্দ শুনে

রাঁগ করে না অমিত। এক নাগাড়ে ব'লে যাওয়ার পর হঠাৎ সেটা মনে করিয়ে দিলে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যেও হেসে ফেলে—'ছাখ, তোকে আবার বলছি। আমার সামনে ও রকম আবোল-তাবোল কথা বলবি তো এ রকম আরও শুনতে হবে। আমাকে চটাসনি।'

হোটেলে এখন একটু ভিড় কম। রাত যতো বেশি হবে, ভিড় ততো বাড়তে থাকবে। লেস দিয়ে কারুকার্য করা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আর তেমনি একটা টুপি মাথায় সাজিয়ে যে লোকটি কাঠের-বেড়া দেওয়া কাউন্টারে ব'সে ছিলো, তার কাছে দাম মেটাতে গিয়ে অমিত একবার ওপাশে তাকালো। রাস্তার ধারে গনগনে আগুনের এক বিরাট উনুনের উপর প্রকাণ্ড একটা লোহার চাটু উপুড় ক'রে রুটি সেঁকছে জল্লাদের মতো বিশালদেহী একজন মুসলমান, পাশে ময়দা বেলছে আরেক পালোয়ান। দাড়ি-গোঁফ-মাথার বাবরি, বুকের লোম, পেটের ভুঁড়ি বেয়ে ঘাম ঝরছে। দু-এক ফোঁটা যে ময়দায় পড়ছে না, এমন কথা বলা যায় না জোর ক'রে। লাল লুঙ্গিটা প্রায় একটা জাঙ্গিয়া হয়ে উঠেছে। শক্ত, ভারি রোমশ কালো দুটো উরু তেজী-ঘোড়ার গর্দানার মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। এখানে কথা মানেই চিৎকার, হল্লা, খিস্তি। ভাষাটা প্রায় ক্ষেত্রেই খাঁটি উর্দু কিংবা পশ্চিমা হিন্দী। তাই রক্ষা।

রাস্তায় নেমে অমিত বললো—'ছাখ লোকেন, আমি মাইনে পেয়ে যখন অন্য একটা হোটেল কি মেসে চলে যাবো তখনও মাঝে মাঝে এখানে খেয়ে যাবো। বেশ খাওয়ায় কিন্তু।'

মোড়ের দোকান থেকে একটা পান কিনলো অমিত এবং এক প্যাকেট চারমিনার। দড়ির আগুনে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললো—'চল্, হাঁটি।'

পার্ক-সার্কাস ট্রাম-ডিপো থেকে মেহের-আলী রোড। বেশি দূর নয়। হাঁটতে-হাঁটতে, কথা বলতে-বলতে একটু পরেই সেখানে

এসে পৌঁছোলো তুজন। একদিকে পাকাপোক্ত একটি নতুন বাড়ি, অন্যদিকে একটা বস্তি। তুটোর মধ্যে দিয়ে সরু একখানি কানাগলি। ঘুঁটঘুটে অন্ধকার, বড়ো রাস্তার লাইট পোস্টের আলোর কণামাত্র আসে না এখানে। একটা গ্যাসলাইটও নেই, কোনো বাড়ির জানলা থেকে উচ্ছিষ্ট আলো পর্যন্ত পড়ে না। জল প্যাচপ্যাচ করে, কেননা গলির মুখেই সরকারি টিউব-ওয়েল। ভ্যাপসা, পচা, তুর্গন্ধময় এই পথে পা বাড়ালে যে-কেউ নাকে রুমাল চাপা দেবে। কিন্তু ওরা দেয় না। অমিতের প্রয়োজন হয় না, লোকেনের অভ্যাস হয়ে গেছে। আর রাতে এপথে হাঁটতে গেলে যে কোনো মুহূর্তে কোনো মরা ইঁতুর বা বস্তির ছেলে-মেয়েগুলোর কুকীর্তির উপর পা পড়তে পারে। পথ চলতি কিছু মানুষ একটু আড়াল পেয়ে বিনা-দ্বিধায় জায়গাটাকে আরও একটু ভিজিয়ে দিয়ে নোংরা ক'রে দিয়ে যায়। সেই অন্ধকার ডিঙ্গিয়ে এসে কানাগলির একমাত্র প্রাসাদ লোকেনদের মেসে পৌঁছোতে হয়। প্রায় আশি কি নব্বুই বছরের পুরোনো জীর্ণ বাড়ি। সদর দরজার পাশেই উপরে ওঠার সিঁড়ি। নড়্‌বড়ে কাঠের হাতল, পায়ে পায়ে খয়ে-যাওয়া প্রতিটি ধাপ। এখানেও অন্ধকার। এতো অন্ধকার যে চল্লিশ-ওআটের একটা বাল্‌বের আলোও যেন লণ্ঠনের মতোই মিটমিট করে। শুধু এখানেই সাবধান হয় অমিত। লোকেনকে অনুসরণ করে।

একই ঘরে আরও তুজনের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে লোকেনকে থাকতে হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে সহজভাবেই সেই কানাগলি, সিঁড়ি, অন্ধকার পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো লোকেন। বললো—'জামা-কাপড় ছেড়ে তুই শুয়ে পড়। আমি খেয়ে আসি।'

একটানে পাঞ্জাবিটা খুলে চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে অমিত জিজ্ঞেস করলো—'বইটা কোথায় ?'

'কোন বই ? আমি কি জানি, ত্যাখ কোথাও আছে।'

শার্ট খুলে, ধুতির বদলে পায়জামা প'রে খোলা গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে-গাইতে বেরিয়ে গেলো লোকেন। আমিত বালিশের তলায় খুঁজে পেলো বইটি। একটি সিগারেট ধরিয়ে সটান শুয়ে প'ড়ে বইটি পড়তে শুরু করলো।

লোকেনের মেসে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছে অমিত—'ফলেন্ এঞ্জেল।' তখন থেকে এই নামটাই চালু হয়েছে সকলের মধ্যে। নেহাতই ঠাট্টা ক'রে সবাই এ নামেই ডাকে অমিতকে। লোকেনও। অমিতের ভাষায় এই অখ্যাত পোড়ো বাড়ির নতুন নাম—'হেল-গেট ক্যাসল্।'

কিন্তু দুজনই আবিষ্কার করলো এবাড়িটায় অন্তত একটু নিভৃত-স্থান আছে। সেটা ছাদ। ছাদে ওঠার সিঁড়ি নেই। এককালে কাঠের সিঁড়ি ছিলো, এখন ভেঙে গেছে। এখন উঠতে গেলে সামান্য একটু ঝুঁকি নিতে হয়। অমিতের প্রেরণাতেই লোকেনও কিছুদিন হলো ছাদে উঠতে শিখেছে। ওদের পথে এগিয়ে আসেনি আর কেউ। এমন কি জয়দেববাবু, কার্তিকবাবুও না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দু'বন্ধু সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে ছাদে ওঠে। আকাশ দেখে, গল্প করে, তর্ক করে। অনেক রাতে, সবার যখন গাঢ় ঘুমে নাক ডাকে, তখন ওরা নামে। মাঝে-মাঝে বাদ যায়, যদি জয়দেববাবু বা কার্তিকবাবুর মেজাজ থাকে অথবা পকেটে পয়সা থাকে। ওদের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত তিন-তাস চলে। সে সঙ্গে আনুষঙ্গিকও।

ছাদে উঠতে হ'লে প্রথমেই ধুতি বা পায়জামা গুটিয়ে নিতে হয়। তারপর বেছে-বেছে কতগুলো জায়গায় হাত আর পায়ের বুড়ো আঙুল রাখতে হয় এবং হাঁপাতে হয় কিছুক্ষণ। ঘামতে হয়।

নিরাপদে উপরে উঠে হাতে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে অমিত বিরক্তির সঙ্গে বললো—'ত্যাখ লোকেন, মাইনে পেলেই আমি অন্য কোথাও চ'লে যাবো। তোর এখানে উঠে হাড়গোড় ভাঙবো

নাকি শেষে।'

'ছাদে না উঠলেই পারিস।'

'হ্যাঁ, তোর ঘরে তোর ওই কতগুলো ডাল রুম-মেটের সঙ্গে রাতের পর রাত কাটাবো। খেপেছিস নাকি তুই! থাকিস কী ক'রে। তোর একা-একা থাকতে ইচ্ছে করে না? একটা ঘরে একদম একা।'

'মেজাজ এলে আমিতো জয়দেববাবু-কার্তিকবাবুদের ঘরে চ'লেই যাই। প্রায়ই তো ওখানে ঘুমোই। আমাব বিছানা খালিই প'ড়ে থাকে।'

'উহুঁ, আমার তাও চলবে না। একা থাকবো। বিলকুল একা।'

আস্তে-আস্তে ছাদের রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলো অমিত। ঝুঁকে প'ড়ে নীচের দিকে তাকালো একবার। অন্ধকার। সামনের বাড়ির দোতলার জানলা দিয়ে কিছুটা আলো বেরিয়ে এসেছে, শুধু ঐটুকুই চোখে পড়লো। সামনের দিকে তাকালো। একতলা, দোতলা, তিনতলা, উঁচু-নিচু, ছোটো-বড়ো অনেক বাড়ি। বাড়ির পর বাড়ি। এরিয়ালের বাঁশ, জলের ট্যাঙ্ক, চিলে কোঠা, কোথাও রোদে-দেওয়া কাপড় রাতেও ঝুলছে, কোথাও কোথাও ইতস্তত আলো। নিঝুম। চারদিকের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে খৃষ্টানদের গোরস্থানের কথা মনে পড়লো। ঠিক এমনি দেখাবে সেখানে দাঁড়ালে। নিস্তব্ধ, দম-আটকানো থমথমে আবহাওয়া। তবু দু-একটা গাছ দেখা যাবে সেখানে। ফুলের গাছ এবং বিস্তর ঘাস। সবুজ নরম-নরম ঘাস।

সঙ্কীর্ণ আকাশ, অগুনতি নক্ষত্র, বিরাট স্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো অমিত। হঠাৎ অতর্কিতেই স্তব্ধতা ভাঙলো—'বুঝলি লোকেন, এবার আমি সত্যি একা থাকতে পারিবো। এতোদিন যা হ'তে চেয়েছিলাম এখন তা'ই হতে পেরেছি।'

'এতোদিন তোর আবার বাদ সাধছিল নাকি কেউ? একাই তো ছিলি? বাপ-মা-ভাই কারও ঝক্কি পোয়াতে হয় না—তোর আবার কি।'

'ননসেন্স—' অমিত ছাদের উঁচু জায়গাটায় এসে বসলো—'বাপ-ভাই-ই সব হলো, আর কিছু নেই? দিনরাত একটা গর্দভের কাছে একশো তিরিশ টাকা মাইনের চাকরি করতে-করতে তাবত ব্যাপারটার ওপর ঘেন্না ধ'রে গেলো। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে একা থাকবো কেউ কাছে আসবে না। আমি একা থাকবো। লোকেন, তুই কখনও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশেছিস্?'

লোকেন মাথা নাড়লো—'না।'

'ওরা যে পাহাড়ে-গুহায়-মন্দিরে স্বার্থপরের মতো একা-একা পুণ্য সঞ্চয় করে, তার কারণ ওরা বিশ্বাস করে, ওদের দায়-দায়িত্ব যা কিছু সব ঈশ্বরের কাছে। আমি ঈশ্বর মানি না। সমাজ মানি। কিন্তু সমাজের কারও কোনো ক্ষতি না ক'রে, যদি একা-একা পাপ করি, নিজেকে নিজে ধ্বংস করি কার কি বলার থাকতে পাবে? লোকে নিভৃতেও পাপ করতে ভয় পায় কারণ গোপনে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। বললাম তো, 'মরাল-অর্ডার' মানি না। অবশ্য 'স্যোশাল-অর্ডার' বলে একটা বস্তুর কথা লোকে ব'লে। কিন্তু ওটার প্রতিও আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। বললাম তো, নাস্তিকের যদি কোনো ঈশ্বর থাকে তো সে হলো মৃত্যু। ইট্ ইজ্ সিলিনেস্ টু লিভ হোয়েন টু লিভ ইজ টরমেন্ট অ্যাণ্ড দেন হ্যাভ উই এ প্রেসক্রিপ্সান টু ডাই হোয়েন ডেথ ইজ আওআর ফিজিসিআন।'

'তাই বুঝি তোর মৃত্যুর সাধনা?'

'মরতে আর পারলাম কই?'

'চেয়েছিলি তো।'

'চেয়েছিলাম। নিজের সম্বন্ধে যে-কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার মানুষের আছে। অন্তত থাকা উচিত।'

"হুঁ—' লোকেন কথাটার ভার সইবার জন্য কিছুটা অবসর চাইলো। তর্ক জুড়তে সাহস পেলো না।

চিরদিনের চাষাড়ে মানুষ লোকেন। যেমন মুখে-চোখে-চেহারায়, তেমনি প্রকৃতিতে। নেহাতই ঝোঁকের বশে একদিন যাকে জুয়া-খেলার রীতিটা শিখিয়ে দিয়েছিল সেই অমিতই আজ পাকা জুয়াড়ি। লোকেন নিজেই আজ অবাক হয়ে যায়। ভাবে এবং এই ভেবে বিস্মিত হয় যে, তলিয়ে যেতে-যেতেও মানুষ এমন চিৎকার ক'রে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে কি ক'রে? অসহায় ভাবে ডুবে যেতেই শিখেছে লোকেন, কিন্তু জাহান্নামে যাবারও যে একটা ভাষা আছে, পদ্ধতি আছে, জানা ছিলো না ওর। অমিতের কথাগুলি শুনতে-শুনতে কেমন একটু নেশার ঘোর লাগে। তর্ক করতে সাহস পায় না। তবু বলে—'তুই যখন হাসপাতালে ছিলি তখন আমরা রাত জাগতাম বাইরে। রোজই আমার সেই আরেকটা দিনের কথা মনে পড়তো। তোর জন্যে আরও কিছু রাত আমাদের হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল।'

'হুঁ, পুলিসের লাঠি খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিলাম কিছুদিন। সে তো ছেলেবেলার কথা। কত কিছু ভাবতাম তখন, মাথা নেই, মুণ্ডু নেই। মিথ্যে 'আইডিয়ালিস্‌মের' পোকা কিলবিল করতো মাথায়। কিন্তু ছাখ, শুধু পুলিসের লাঠি কেন, গুলিও তো খেতে পারতাম। ম'রেও যেতে পারতাম। কিন্তু কি হতো তা'তে? তোরা শহীদ-শহীদ ক'রে দিনকয়েক নাচতিস্‌। কিন্তু তারপর? দেখছি তো শহীদদের অবস্থা। এ জন্যেই কি লোকগুলো মরেছিল? একদিন ভেবেছিলাম, আমি ম'রি ক্ষতি নেই, কিন্তু যারা বেঁচে আছে তারা ভালোভাবে বাঁচুক। কিন্তু কী অদ্ভুত কতগুলো কথা। তখন ম'রে না গিয়ে নিজেই তো দেখছি, কত বিশ্রীভাবে বাঁচতে হচ্ছে আর কী বিশ্রীভাবে মরবার কথা ভাবতে হচ্ছে আমাকে। একটা প্রচণ্ড চাপা আক্রোশ গুমরোচ্ছে ভিতরে-ভিতরে। কিছুতেই

সংযত করতে না পেরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অমিত। ছুটে গেলো রেলিংটার দিকে—'জানিস্ লোকেন, ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে……যাক্ গে,—'

আবার কিছুক্ষণ পরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে, এগিয়ে এসে সুর নরম ক'রে বললো—'শুনেছি, একবার আত্মহত্যা করলে মানুষ নাকি আবার আত্মহত্যা করতে চায়, নইলে পাগল হয়। আমি ওভাবে আর মরবো না, কিন্তু, কিন্তু—আমি কি পাগল হচ্ছি লোকেন, মনে হচ্ছে তোর ?'

'এখনও হস্‌নি।' লোকেন হাসলো অমিতের আচরণ দেখে।

'আর হবোও না। দেখিস, আর হবো না। মরতে হবে। একটু-একটু ক'রে জীবনটাকে লুটেপুটে রসিয়ে-রসিয়ে মরতে হবে। নইলে হবে না—দে, দে, সিগারেট দে—'

ছুজনই সিগারেট ধরালো। বোধহয় উত্তেজনাকে দমন করতেই অমিত একটু দূরে স'রে গেলো। কবরখানার মতোই শান্ত নিস্তেজ এবং মৃত শহরটার দিকে তাকিয়ে রইলো। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে লোকেন অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ। লক্ষ্য করলো অমিতকে। অমিতের চলা-ফেরা, হাঁটা, কথা বলা। একটা তারা দ্রুতগতিতে ছিটকে গেলো আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। লোকেন বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালো—'দূর তুই ওভাবে মরবি কেন ? তুই তো ভাগ্যবান।'

'কেন, হঠাৎ আমি ভাগ্যবান হতে যাবো কেন ?'

'তুই যখন তিনদিন হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে ছিলি, কল্যাণ আমাদের সঙ্গে রোজ রাত জাগতো। তৃপ্তিও রোজ আসতো। প্রায় শেষ বাসে বাড়ি যেতো।'

'থ্যাঙ্কস্ টু হার—' সিগারেটে ছোটো একটা টান দিয়ে অমিত অদ্ভুত ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলো—'পৃথিবীতে তবু অন্তত একটি ভদ্রমহিলা আমার জন্যে চিন্তিত হ'ন। শুনে খুশি হলাম।

'ব্যস্, ওই পর্যন্তই ?'
'আর কি বলবো ?'
'শি ফিল্‌স্ ফর ইউ।'
'আই ফিল্ ফর নান্।'
'শি লাভস্ ইউ।'
অমিত ফিরে তাকালো। অন্ধকারে ওর মুখের সূক্ষ্ম রেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যায় না। কথার সুরে বোঝা গেলো চোখ এবং ভ্রূ কুঞ্চিত—ওই ব্যাধিটার সিম্পটমগুলো যেন কী ? তোরা কী দেখে বুঝিস ?'
'জটিল ব্যাপার। তবু বোঝা যায়।'
'ওসব ছেড়ে দে লোকেন, ছেড়ে দে—'সিগারেটটা ঠোঁট পর্যন্ত তুলতে-তুলতে হঠাৎ নামিয়ে আনলো অমিত। মুখের কাছে মুখ এনে দৃঢ় অথচ শান্ত গলায় বললো—'এদিক কিংবা ওদিক, একটা ভেবেচিন্তে ঠিক ক'রে নে। এখনও সময় আছে। পৌরুষ কোথায় এ যুগে ? খাঁটি পুরুষ যদি হতে না পারিস তবে ওই আজব জীবটাকে ঘৃণা করতে শেখ্, করুণা-অবজ্ঞা করতে শেখ্, নইলে স্ত্রৈণ হয়ে যা। দুটোই এক সঙ্গে হয় না। অসম্ভব। যেখান থেকে একবার ঘা খেয়েছিস্, আঘাত ফিরিয়ে দিতে না পারলে ভুলে যেতে চেষ্টা কর্।'
'কী বলছিস্ তুই ?' লোকেন রুখে দাঁড়াতে চাইলো।
'সহজ বাংলা ভাষা। কি বলছি বোঝা উচিত।'
'বোঝা তো যাচ্ছে না।'
'শোন্ লোকেন—' অমিত হাসলো। বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলো— 'সাধু-সন্ন্যাসীরা আমাদের 'অ্যান্টিথিসিস্'। ওরা পুণ্য খোঁজে, আমরা পাপ করি। লোকে ওদের পুজো করে, আমাদের ঘৃণা করে। আমরা বলি না 'মামেকং শরণং ব্রজ' কিন্তু ওরা বলে। আমরা জানি, আমরা নরকে যাচ্ছি, ওরা জানে না ওরা স্বর্গে কোনোদিনই পৌঁছবে না। ভণ্ডরা ওদের দলে ভিড়তে পারে কিন্তু আমাদের এখানে ভণ্ডামির ঠাঁই নেই। কিন্তু তবু একটা মস্ত জায়গায় আমাদের

মিল আছে। সে এক মস্ত মিল। আমরাও ওদের মতো সংসার-টংসার, স্নেহ-মমতা আবোল-তাবোল ন্যাকামিগুলো ঝেড়ে ফেলে দিই। তফাৎ শুধু এই, ওরা সংসার ত্যাগ করে, আর সংসার আমাদের ত্যাগ করে। মনে-মনে এখনও যদি ওই তৃপ্তি-টিপ্তি হাজারটা তুলসিপাতা মেয়ের কথা ভাববি, তবে ভদ্রলোক হয়ে যাসনি কেন? আবাব একটা এম-এ পরীক্ষা দে। এবাব একটা সেকেণ্ড-ক্লাস নির্ঘাৎ পাবি। একটা প্রোফেসারি কিংবা ভালো মাইনের একটা চাকবি খুঁজে নে। ও রকম অনেক বৌ পাবি। তোব বাপ-মা আছেন। তাঁরাও সুখী হবেন, তুইও সুখী হবি। মনে-মনে ও সব চিন্তা ক'রে হেল-গেট্ ক্যাস্‌লে আসা যায় না। জানিস গীতায় আছে—'কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে·· ··'

'থাক্, আর গীতা শুনিয়ে কাজ নেই। তা হ'লে তুই সুখী হ'তে চাস নি কেন?'

'সুখ আমাকে চায়নি ব'লে।'

'হলপ্ ক'বে বল্ অমিত, তুই কখনও তৃপ্তিকে ভালোবাসিস্ নি। ভালোবাসতে চাস নি?'

অমিত উদাত্ত হাসলো। যেন হামাগুড়ি-দেওয়া শিশুর মুখে একটা অদ্ভুত কথা শুনলো—তুই যেখানে সুড়সুড়ি দিতে চেষ্টা করছিস্, বোধহয় জানিস না লোকেন ওটা একটা মরা-মানুষের শরীর। তুই চাস তোকে কেউ ওই সুড়সুড়িটা দিক।'

'মানে?'

'এবার তুই বল্ তো, ইউনিভারসিটিতে থাকতে তৃপ্তির জন্যে তুই কুকুরের মতো ঘুরেছিলি কিনা। আর একদিন কি বলতে গিয়ে বেমক্কা তৃপ্তির কাছে অপমানিতও হয়েছিলি—' বলতে-বলতে হঠাৎ অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো অমিত। চারদিকের স্তব্ধতায় হাসির শব্দটা ধ্বনিতরঙ্গ তুলে কাঁপলো—'কি রে, গুম হয়ে গেলি কেন? ঠিক জায়গায় আঘাত পড়লো তো?'

'আমার কথা হচ্ছে না। আমি বলছি তোর কথা।' লোকেন বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত বোধ করলো না।

'আমি ? শেষটান না টেনেই হাতের সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে মারলো অমিত—'হুঃশ্ শালা বেশ্যা ঘাটতে-ঘাটতে এমন হয়েছে যে ভদ্র-ঘরের মেয়ে দেখলে কেমন পুতুল মনে হয়। তুই আবার বলছিস্ আমার কথা।'

'অমিত—' লোকেন চিৎকার ক'রে উঠলো।

'খারাপ লাগলো শুনতে না ?' অমিত শান্ত। হাসতে-হাসতে বললো—'তুই ফিরে যা লোকেন, ফিরে যা। পৃথিবীতে যারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সুখে আছে, তারা সুখে থাকুক, তুইও সুখে থাকবি। ওই সুখটা পাবার জন্যে আমিও একদিন শেষ বাজী ল'ড়ে দেখেছি। বুঝে নিয়েছি ওটা পাবার নয়। অন্তত আমাকে দিয়ে হবে না। কিন্তু তোর হবে। তোর মধ্যে এখনও কিছুটা মনুষ্যত্ব আছে। তুই এখনও ভালোবাসার কথা বলিস। একটু শখের নেশা ক'রে লাভ নেই লোকেন। ওতে নিজেকে বড়ো ছোটো করা হয়। গোটা জীবনটাকে নিয়ে বাজী লড়তে পারবি আমার মতো ? সব কিছু ছেড়ে মাতাল হতে পারবি ? পাঁড় মাতাল ?'

'লোকে আমায় লম্পট বলে অমিত। কিন্তু আমি হার মানছি, হ্যাটস্ অফ্ টু ইউ, আমি তোর চেয়ে বড়ো লম্পট নই—' যার সঙ্গে তর্ক করতে ভয় পায় তার মুখোমুখি স্পর্ধা নিয়ে দাঁড়ালো লোকেন। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে নিজেকে শক্ত ক'রে তুললো—'একটি চেনা মেয়ে, শুধু চেনা ব'লেই নয়, বন্ধুর স্ত্রী, তোর বন্ধু—তার সম্বন্ধে এ রকম একটা কথা বলতে পারলি তুই ? যদি তোকে আমিই 'স্কাউণ্ড্রেল' বলি এখন।'

'বল্'

'জীবনটা তোর কাছে এতোখানি অর্থহীন ?'

'সত্যি তাই।'

'তৃপ্তিকে তুই ভুলে যেতে পারবি ? ঘৃণা করিস ?'

আস্তে-আস্তে রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল অমিত। ফিরে তাকালো—'ছাখ লোকেন, এই মানুষটাকে দেখছিস, অমিত গুপ্ত ব'লে যাকে চিনতিস্ সেই মানুষটা। এই মানুষটা একবার মরতে চেয়েছিল। মরতে চাওয়া মানেই মৃত্যু। কিন্তু লোকটা আবার এসেছে। মৃত্যুর আগে মানুষটা যে ভুলগুলো করেছিল, এখন সে আর সেই ভুলগুলো করতে চায় না। করবেও না।'

'কিন্তু এভাবে কি ক'রে বাঁচবি তুই ?'

'কেন, যে ভাবে বেঁচে আছি।'

'ওভাবে বাঁচা যায় না। কিছুই কি ভালো লাগার নেই তোর ?'

'আছে—' শরীরের সমস্ত আবেগকে যেন দু'হাতের মুঠোর মধ্যে ধ'রে এগিয়ে এলো অমিত—'জানি, ভালো লাগার মতো কিছু হয়তো আছে।

বোধহয় ভালো লাগা উচিত। আমিও জানিরে লোকেন—লাইফ ইজ লাইক্ এ বিউটিফুল ওম্যান, হুইচ রিসিডস্ রিসিডস্ রিসিডস, ব্লিডস্, ব্লিডস অ্যাণ্ড ব্লিডস্।' ··কিন্তু দোহাই তোদের, তোদের ওই নীতিশাস্ত্র, আদর্শবোধ, সমাজবিধান ওসবের কথা বলিস না আমার কাছে। প্রেম-ভালোবাসার কথা বলছিস ? কে কাকে ভালোবাসে ? তুই আমাকে ভালোবাসিস ?

'ডু ইউ—'

'রাত হয়েছে অমিত। নীচে চল্।'

'তুই যা, আমি থাকবো —' হঠাৎ বাধা পেয়ে থেমে গিয়েছিল অমিত। আহত হয়নি। নির্বিকারভাবে আবার ফিরে গেলো রেলিং-এর দিকে। একটি উদাসীন রাত আর একটি মৃত নগরী। অমিত আকাশের দিকে তাকালো। দূরের আলোর দিকে, নীচের অন্ধকারের দিকে।

দুর্বোধ্য জটিল ধাঁধার মতো একটি মানুষ। ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত হয়েও জোর ক'রে মানুষটার উপর দাবি জানাতে পারলো না লোকেন।

লোকেন তাকিয়ে রইলো। সিগারেট ধরালো। ইচ্ছে নেই ওর বক্তৃতা শোনার কিংবা নতুন কিছু বোঝাবার। খেয়াল আর মর্জির অপেক্ষা না ক'রে উপায় নেই। লোকেন জানে, ওকে বাধ্য করা যাবে না। তাই ব'সে থাকতে হলো। নিঃশব্দে, চুপচাপ। যতক্ষণ না অমিত নিজে বললো—'রাত হয়েছে। চল্—'

দশ

ঝণ্টু এসেছিলো। চ'লে গেছে। কল্যাণের ইভ্নিং-ডিউটি। রাত হবে ফিরতে।

ঝণ্টু আসে অন্য একটা জগৎ থেকে। সেটা অন্য জগৎ, আরেক পৃথিবী। সেকথা মনে হলেই নির্বাসিতের কান্নাটা বুকের ভিতরে ঠেলে উঠতে চায়। অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গিয়ে একা বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে থাকে তৃপ্তি। ঘুম আসে না। ওদিকে মেঝেতে নিধুর-মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন নিদ্রা। অথচ ভাবনা একদিন তৃপ্তিরও ছিলো না। কতো সহজ, সুন্দর আর নিরাপদ মনে হয়েছিলো জীবনটাকে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলেজ, ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ-ইয়ার পর্যন্ত সেই উন্মাদনার দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সে উন্মাদনা আরও বাড়লো। ছাত্র-আন্দোলন, রাজনীতি, মিছিল, কল্যাণ, অমিত, প্রণব, বিভাস, লোকেন, আশিস, বিনতা, অঞ্জলি, উমা, মীরা, শ্যামলী, অনুরাধা, বন্ধু-বান্ধবী, হাসি-ঠাট্টা, হৈ-হুল্লোড়, কলেজ, ক্লাস, পড়াশুনা, লাইব্রেরি, পরীক্ষার ভাবনা। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত জীবন। খোলামেলা হালকা। দায় নেই, দায়িত্ব নেই। বাধা দেবার কেউ নেই। স্বাধীন।

কিন্তু বাধা এলো একদিন। সংঘাত এলো। বাধা এলো বাইরের জগৎ থেকে। সংঘাত জন্মালো মনের ভিতর। যারা খুব কাছের মানুষ, স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে চিরকাল বেঁধে রাখার অঙ্গীকার যাদের

কাছে, একদিন তারাই বললেন—ভালোবাসা অপরাধ, অবৈধ। ভালো লেগেছিলো। ভালোবেসেছিলাম। মনে মনে ভাবলো তৃপ্তি। কিন্তু কাকে ? অমিত, কল্যাণ, সুনীল, বিভাস—সবাইকে। সবাই বন্ধু। কিন্তু শুধু বন্ধু নয়—তার চেয়ে আরও গভীর ক'রে, আরও নিবিড় ক'রে ভালোবেসেছিলাম। ভালোবেসে আকুল হয়েছিলাম। সে কাকে ? নিজেই সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝিনা। সত্যি কাকে চেয়েছিলাম, কাকে গ্রহণ করলাম। গ্রহণ করেছি কল্যাণকে। কিন্তু আজ মনে হয়—বোধহয় কোথাও একটু ভুল হয়ে গেছে। নইলে কল্যাণ কেন পরিপূর্ণ ভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করে না ? কেন অমিতের জন্য এমন ভাবে শুধু ভাবতে হয় সারাদিনের কাজে বা চিন্তায়, আমার মধ্যে ওর অস্তিত্বকে এমন করে অনুভব করবো কেন প্রতিদিন ? স্মৃতি আমাদের পীড়িত করে, কিন্তু বর্তমানের মধ্যেও মানুষকে ভুলতে চেষ্টা ক'রে ভুলতে না পারার এই যে বেদনা, তার নাম কি ? তৃপ্তি গভীরে ডুবতে চাইলো, তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো নিজের উপলব্ধিকে।

নিজের কাছে নিজের নগ্নতার লজ্জা নেই। আজ অনায়াসে সে সব কথা ভাবতে পারে তৃপ্তি। নিজের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়ে নিজের আরশিতে নিজেকে দেখতে পারে। এই অন্ধকার ঘর, একলা রাত, একা শয্যা। নিধুর-মা ঘুমে অচেতন। একা ঘরে প্রলাপ বকলেও কেউ শুনবে না, কেউ জানবে না। বিয়ের আগে কুমারী-জীবনে এমনি অনেক রাতে বন্ধু হিসেবে অমিতের জন্য ভেবেছি, ভেবে আরাম পেয়েছি, আকর্ষণ বোধ করেছি বারবার। ভেবেছি কল্যাণের জন্যও। বিয়ের পর কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কের রূপ বদলেছে আমার। কিন্তু অমিত ? শুধু কি বন্ধু ? তবে আর সব বন্ধুরই একজন নয় কেন ? কেন ও আমাকে পীড়িত করে ?

অথচ আজ আর প্রশ্নটা সোজাসুজি তুলে ধরা যায় না অমিতের কাছে। কোনোদিনই যায়নি। যখন সতীর্থ ছিলো তখনও না, যখন

পড়াশুনার গণ্ডি পেরিয়ে জীবনের খোলা-মাঠে এসে দাঁড়ালাম, তখনও না। বন্ধুর মতো একটি মানুষ অথচ ভয় করেছি তাকে, সাহস কুড়িয়ে এগিয়েছি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আগে। কিন্তু কল্যাণেরও উজ্জ্বলতা ছিল, প্রখরতা ছিল, সেখানেও মুগ্ধ হয়েছি।

অমিত গরীব। দারিদ্র্য ওকে পঙ্গু করতে চেয়েছে বারবার। মেরুদণ্ড সোজা রেখে, সম্ভ্রম রেখে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে বারবার। ট্যুশানি করতো সকাল-সন্ধ্যা। তবু এরই মধ্যে সময় খুঁজে নিতো বই-পড়ার। পরীক্ষা পাশের বই নয়, আত্মসমৃদ্ধির জন্য সে পড়া। রাজনীতি করতো। নিষ্ঠাবান কর্মী। অবিসংবাদী ছাত্রনেতা। সে সময়ে কল্যাণই বোধহয় বলেছিলো একদিন, কি বলেছিলো আজও মনে আছে—'আর সকলের কাছে রাজনীতি শুধু বুদ্ধিসর্বস্বতার উপকরণ, অমিতের মতো জীবনের তাগিদে মিছিলে নামেনি কেউ।' এই অমিতই একদিন ওকে মিছিলে নামিয়েছিলো—মনে আছে তৃপ্তির। মফঃস্বলের মেয়ে। অকারণ আতঙ্ক ছিলো কলকাতার প্রতি, রাজী হয়নি প্রথমে। কিন্তু আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় আহত অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর পুরোধায় সেই মানুষটিকে দেখে খাঁটি-মানুষ দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা পেয়েছিলো তৃপ্তি। অন্য এক দিন সব জড়তা সব ভীতিকে দূর করে জনতার ভিড়ে নেমে পড়েছিলো। অমিত বাধা দিয়েছিলো। অমিতকে ফাঁকি দিয়েই গোপনে মেয়েদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম। তৃপ্তি সেই দিনটাকে স্মৃতিতে স্পষ্ট খুঁজে পেলো।

সেই মানুষটার, সেই শক্ত মানুষটার আজ এই দশা! সেকথা ভাবতে গিয়েই মাথার শিরা-উপশিরায় প্রতিবাদ অনুভব করলো তৃপ্তি। পাশ ফিরে শুলো। আরও বেশি চিন্তা করলে মাথার ব্যথাটা আরও বাড়বে। কিন্তু নিজের ছায়ার মতোই ভাবনাকে এড়িয়ে চলা অসম্ভব। শরীর-মনের সম্মতি না থাকলেও মাথাটা চিন্তার সঙ্গে বারবার জড়িয়ে পড়ে। সেই শক্ত-মানুষ অমিত অমন বিশ্রীভাবে ভেঙে পড়লো। সেই অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে পরীক্ষায় ভালো

করতে পারলো না। তারপর স্কুল-মাস্টার। আবার দারিদ্র্য। অমানুষিক কষ্ট। মেদিনীপুরের দেশের বাড়িতে নাকি বুড়ি-মা আছে ওর। নিরক্ষর এক দাদা আছেন, বৌদি আছেন, বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে আছে তাদের। তাদের বাঁচানো দরকার। কিন্তু অমিত নিজেই বাঁচতে চায়নি সেদিন। অমন বিশ্রীভাবে মরতে চেয়েছিলো। সেকথা মনে হতেই তৃপ্তি ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠলো আবার।

দেয়ালের কান আছে, মিথ্যা কথা। অন্ধকার অন্ধ। কেউ শুনবে না, কেউ দেখবে না। এই স্তব্ধতার মধ্যে হারিয়ে গিয়ে, জমাট-বাধা অন্ধকারে চোখ খোলা রেখে নিঃসংশয়ে নিজের কথা নিজে ভাবতে পারে তৃপ্তি। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান আর প্রয়োজনীয় জিনিসটি বেছে নিতে গিয়ে মনে হলো, বোধহয় ভুল হয়েছে কোথাও। ভিতরে-বাইরে এক অসহ্য টানা-পোড়েনে সেদিন দগ্ধ হতে হয়েছে অনেক। জীবনের প্রয়োজনে অমিতকে বেছে নিলে আজ এমনি করেই কি জ্বলতে হতো না কল্যাণের জন্য, এ'রকমই কোনো সমস্যার পাকে জড়াতে হতো না নিজেকে? আজ তৃপ্তি মনে-মনে একটা আপসে আসতে চায়। একটা সান্ত্বনা খুঁজতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কল্যাণের চেয়ে, অমিতের চেয়ে বড়ো যে পৃথিবী সে পৃথিবী নিষ্ঠুর। ভালোবাসা বে-আইনী সেখানে।

সেই পৃথিবীকে মনে পড়ে। যে পৃথিবী থেকে ঝন্টু আসে, মমতা চিঠি লেখে। বাবাকে ভীষণ ভয় করতো তৃপ্তি। ভালোও বাসতো। বদমেজাজী মানুষটা যখন ধমকে-গর্জনে গোটা বাড়ি মাথায় তুলতেন, যেখানে মা-ও যেতে ভয় পেতেন, বড়ো মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে সে মানুষটার সুর নরম হয়ে যেতো। মাকে মনে পড়ে। ছেলেমেয়েদের জন্য কী না করতে পারতেন মা। দাদা-বৌদি? ওরা কি আজও ঠিক তেমনি আছেন? দাদা কি সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়র হতে পেরেছেন এতোদিনে। নতুন

কোনো ছেলেমেয়ে হলো বৌদির ? মমতা চিঠি লেখে। কাঁদে। বড়ো মেয়ের উপর রাগ ক'রে ছোটোমেয়েকে শাস্তি দিতে চাইছেন বাবা। অল্পবয়সে বিয়ে দেবেন। পড়তে দেবেন না। সত্যি যদি তাই হয় ? মাথার ব্যথাটা বাড়ছে। চশমার পাওয়ার বাড়ছে। চোখটা দেখানো দরকার। আজকাল প্রায়ই এরকম হয়। মাথাটা চিন্‌চিন্‌ করে। আবাব চিৎ হয়ে শোবার জন্য শবীরে মোচড় দিলো তৃপ্তি। কাঁধের কাছে আঁচলে টান পড়লো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিলো। অথচ শুধু মমতার জন্যই নয়, বাবা-মা-দাদা-বৌদি সকলের জন্য শিশুর মতো কাঁদতে ইচ্ছে করে। আজকের জীবনকে নির্বাসন মনে হয়। কল্যাণকে এতো কাছে কাছে জড়িয়েও সবটুকু ভরে না। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। কল্যাণও ওর মতো আরেক উল্কা। নিজের গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছিঁড়ে-আসা আরেক মানুষ। গ্রহে ঠাঁই নেই ব'লে উপগ্রহ হয়ে ঘুরছে। নিজেদের খুশিমতো তৈরি করা নিজেদের জগতে। প্রেম মানে না অমিত। মনে-মনে ক্ষুব্ধ হয় তৃপ্তি। অমিতের উন্নাসিকতার তবু হয়তো একটা মানে খুঁজে পাওয়া যেতেও পারে। ওকে ক্ষমা করে তৃপ্তি। কিন্তু ওই পৃথিবীটা ? ওই নিয়ম ? যে পৃথিবীতে ওর মা-বাবা-শ্বশুর-শাশুড়ির বাস। যে নিয়মে আজও তারা চলেন।

শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ সব অভিধানের কথা। প্রথম কৈশোরে সেসব কথার মধ্যে কতো ভয়-ভাবনা, কতো রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। কোনো কিছু না দেখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি ভাবলো। বিয়ে করার পরও শব্দগুলো শব্দ হয়েই রইলো।

সেজন্য দোষ দিই না কাউকে, অশ্রদ্ধাও করি না। কিন্তু এই অন্ধকারের মতো কালো, কুৎসিত আর পুরোনো পৃথিবীটার বিরুদ্ধে বিঁষিয়ে উঠছে মন, ওই নিয়মটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। জন্ম থেকে যাদের ভালোবেসে এতো বড়ো হলাম, অন্য এক ভালোবাসার জন্য

তাঁদেরই হারাতে হলো একদিন। তারাই বললেন—ভালোবাসা অপরাধ, প্রেম অবৈধ, এ বিয়ে বে-আইনী। জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ারের আতুরে মেয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ ছেলে, খাঁটি কুলীনবংশে জন্ম নিয়ে অবশেষে একটা ঘোষের মেয়ে—দুদিকের প্রচণ্ড ধিক্কারের মধ্যেও বুকে সাহস কুড়িয়েছিলাম। কল্যাণের কাছ থেকে একটা প্রেরণা পেয়েছিলাম, কল্যাণকে সাহস দিয়েছিলাম। সেদিনের কথাটা আরও মনে পড়ে। বিয়ের পর মাথায় সিঁদুর ছোঁয়াতে কল্যাণই বাধা দিয়েছিলো। বলেছিলো—'যে বিয়েতে শাঁখ বাজলো না, সানাই বাজলো না, সেখানে প্রথা মেনে লাভ?' মনে পড়ে তৃপ্তিও বলেছিলো—'আমি সেকথা ভাবিনা। আমার দুঃখ কি জানো, এমন একটা বিদ্রোহ ক'রে বিয়ে করলাম, কিন্তু মাঝখান থেকে বাসরঘরের রোমান্সটা একদম মাঠে মারা গেলো।'

কল্যাণ হেসেছিলো—'ফুলশয্যার মধ্যে যে একটা মাদকতা আছে তা আমরা পেলাম না। অথচ আমাদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, বাবা-মা পেয়েছেন। কিন্তু এভাবে বিদ্রোহ ক'রে বিয়ে করার মধ্যেও এমন একটা অদ্ভুত স্বাদ আছে যা তারা পাননি। কিন্তু আমরা পেয়েছি।'

কল্যাণ বলেছিলো বটে, কিন্তু তৃপ্তি মানেনি। আধুনিকতার প্রচণ্ড অহঙ্কারের মধ্যেও সিঁথিতে সিঁদুর স্পর্শ করবার নিয়মিত অভ্যাস করেছে। বিবাহিত জীবনে কোনোদিন, কোনো একটি বিশেষ দিনেও মাথায় ঘোমটা তোলেনি তৃপ্তি। গুরুজনের শাসন নেই, কল্যাণেরও দাবি নেই। কিন্তু বধূ-জীবনের এই লজ্জাটুকুর প্রতি কোথায় যেন একটা অনুরাগ আছে। অবাধ স্বাধীনতার সুখ পেয়েও সেজন্য একটু ব্যথা, একটু বেদনা অনুভব করে আজ।

ওধারের বাড়িটার সেই মেয়েটিকে মনে পড়লো। কাঁচা

বয়েস। জোয়ারের টান সামলাতে পারেনি। বহুদিন আগে, বোধহয় মাস চারেক আগে একদিন সুন্দরীদি বলেছিলেন, কাল নিধুর-মা বললো। চোখ দেখেই ওরা মেয়েদের শরীর চিনতে পারে। ওরা সব বোঝে। কথাটা এখন কানে-কানে ছড়াবে, আশেপাশের বাড়িতে আলোচনা শুরু হবে, ধিক্কার উঠবে। মেয়েটিকে অত্যাচার সইতে হবে অনেক। কিন্তু কেন? কী ওর দোষ? প্রেমকে যারা অবৈধ বলে, ওকে লাঞ্ছনা দেবার কোন অধিকার তাদের আছে? সুন্দরকে সুন্দর বলতে যারা ভয় পায়, কুৎসিতকে কুৎসিত বলবে তারা কোন লজ্জায়? তৃপ্তি নিজের দিকে তাকালো। শিউরে উঠলো ভয়ে। ওর নিজের মা-বাবা, কল্যাণের মা-বাবা ওদের বিয়েকে স্বীকার করেননি। কোনোদিন করবেন কিনা কে জানে? তবু নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ তৃপ্তির। রাষ্ট্রের আইন বাঁচাবে ওদের। দুঃখ হয় ওই মেয়েটির জন্য। ওবাড়ির ওই কাঁচা বয়সের মেয়েটি। যে মানুষগুলো ওকে বাঁচতে দিতে চায় না, এমনি একটা অন্ধকার ঘরের খাঁচায় বন্দী রাখতে চায়, মমতার জীবনটাকে নষ্ট করতে চায়, যাদের নিয়ম ওদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, তৃপ্তি তাদের মানে না। তাদের নিয়মকেও না।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে ওঠে চোখ দুটো। ভীষণ গরম। ফ্যানটা ঘুরছে মাথার উপর। তবু অসহ্য লাগছে। তৃপ্তি বুক থেকে শাড়িটা সরিয়ে দিলো। লজ্জা করার কারণ নেই কোনো। অন্ধকার। একা শয্যা। মাথাটা ধরেছে। একটা 'এ্যাস্প্রো' আনিয়ে নিলে হয় না দোকান থেকে? যদি নিধুর-মাকে পাঠাই? তৃপ্তি ওষুধ আনবার যৌক্তিকতা বিচার করতে-করতেই আরও কিছুটা সময় কাটালো। আর এরই মধ্যে বাইরের কড়াটা নড়ে উঠলো হঠাৎ। উঠতে হলো। আলো জ্বাললো। দরজা খুললো। কল্যাণ। এক হাতে ব্যাগ, কাগজ পত্র, অন্যহাতে একটি নতুন টাইপিং মেশিন।

'এটা কিনলে বুঝি ?'

ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর ব্যাগ আর মেশিনটা রেখে কল্যাণ হেসে বললো—হ্যাঁ, অনেক দেখে-শুনে এটাই কিনলাম। বেশ ভালো জিনিস। দেখ—

উৎসাহের আতিশয্যে নিজেই ঢাকনাটা তুলে আন্দাজে দু-একটা বোতামে টোকা দিয়ে তৃপ্তির দিকে তাকালো কল্যাণ—'বেশ হলো। এবার কাজের খুব সুবিধে হবে। আর পারা যাচ্ছিলো না। যাই বলো কাজ এতো বেড়ে যাচ্ছে অথচ হাতে লিখে কাঁহাতক আর পারা যায়। এখন তুমি যদি একটু সাহায্য করো।'

'আমি'—তৃপ্তি অবাক হলো—'আমি সাহায্য করব কি রকম ?'

কল্যাণ অন্যমনস্কভাবে স্পেস-বারটা ঠুকতে-ঠুকতে বললো—'একটু-একটু ক'রে খট্‌খট্ ক'রতে-ক'রতে মোটামুটি কাজ চালানোর মতো শিখে নেবে। খুব একটা স্পিড দিয়ে তো দরকার নেই তোমার। তখন সন্ধ্যেবেলা ব'সে ব'সে লেখাগুলো তুমিই টাইপ ক'রে রাখবে।'

'আমার বয়ে গেছে।'

কল্যাণ খুশি হয়েই হাসলো। মেশিনটা ভালো ক'রে বন্ধ করতে করতে বললো—'জানি তুমি করবে। নিজে থেকেই করবে। জানো তৃপ্তি, সুজয়বাবুকে দিল্লী অফিসে পাঠিয়ে আমাকে ওরা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটর ক'রে নিচ্ছে। সব ঠিক হয়ে গেছে। ভেতর থেকে খবর পেলাম। বেশ কিছু মাইনে বাড়বে। অবশ্য মাইনেই বড়ো কথা নয়, আরও ভালো ভাবে কাজ করার কিছু সুযোগ পাবো। লোক চিনলে না তো। আমার দুঃখ, শুধু তুমিই আমার দাম দিচ্ছো না।'

কল্যাণ পিছনে তাকিয়ে দেখলো, তৃপ্তি ঘরে নেই।

এগারো

বিকেলের দিকে একটা ট্যুটোরিয়াল ছিলো। মঙ্গলবারটা যাচ্ছেতাই। কলেজ থেকে বেরোতে-বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অথচ কালই ঠিকানাটা পাওয়া গেলো। দেরি করতে ইচ্ছা হলো না। অনেকদিন দেখা হয়নি মানুষটার সঙ্গে।

জুপিটার লজ। ভাঙাচোরা চল্‌টা ওঠা একটা টিনের সাইনবোর্ডে প্রায়-বিলীয়মান রঙের উপর নামটা পাওয়া গেলো। ঠিকানাটা মিলিয়ে নেবার দরকার নেই আর। পুরুষদের হোটেল। বড়ো খারাপ লাগে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে। ম্যানেজারের ঘর থেকে দোতলা পর্যন্ত সবগুলো জানলা-দরজা থেকে উঁকিঝুঁকি আসে। লুঙ্গি প'রে খোলা বুকে ঘুরে বেড়ায় লোকগুলো। জটলা করে, চিৎকার করে, তর্ক করে, শিস দেয়, গানের সুর ভাঁজে।

সিঁড়ির মুখে এক ভদ্রলোক চড়া গলায় চাকরকে ধমকাচ্ছিলেন, তৃপ্তিকে দেখেই এক মুহূর্তে থেমে গেলেন। খড়ম পায়ে তিনতলা থেকে নামছিলেন কে একজন, হঠাৎ মহিলা দেখে টাল খেয়ে সামলে নিলেন। হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। যেন মহিলা দেখার অভিজ্ঞতা জীবনে এই তার প্রথম। দোতলার করিডোরে কোণের ঘর থেকে একটা অশ্লীল উক্তি কানে এলো। নিঃসন্দেহে কোনো ভদ্রলোক। তৃপ্তি হন্‌হন্ ক'রে পালিয়ে বাঁচলো সেখান থেকে। দূরের একটা ঘর থেকে বেসুরো গলায় গানের কলি শোনা গেলো। আধুনিক গান—'তুমি আসবে জানি আজ সন্ধ্যে বেলায়, ব'সে আছি তাই একা এই নিরালায়।'

গান হচ্ছে এগারো নম্বর ঘরে। দশ নম্বর ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়লো তৃপ্তি। ভিতর থেকে অনাসক্ত সাড়া এলো—'কে, আসুন।' দরজাটা ভেজানো ছিলো। একটু ঠেলতেই খুলে গেলো।

তক্তপোশের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিলো অমিত। বাইরে যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে খেয়াল করেনি। হয়তো পড়ছিলো অনেকক্ষণ থেকে, তাই বোধহয় কালো অক্ষরগুলো এখনও কিছুটা দেখা যায়। ভিতরে ঢুকে পিছনের দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলো তৃপ্তি।

'এই অন্ধকারে পড়ছো কেন। কিছু দেখতে পাচ্ছ? সুইচ কোথায় তোমার?' তৃপ্তি দরজার এপাশে-ওপাশে দেয়ালের দিকে তাকালো।

'এখানে তোমাকে কে আসতে বলেছে?'

'বলো না, সুইচটা কোনদিকে?'

'তুমি কেন এলে? কে তোমাকে আসতে বলেছে?' অমিতের কণ্ঠস্বর গুরুজনেব তর্জন-গর্জনের মতো শোনালো।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সুইচটা আবিষ্কার করলো তৃপ্তি। এগিয়ে গিয়ে আলোটা জ্বাললো। আলোর ঝাঁঝটা হঠাৎ সইতে না পেরে কপাল কুঁচকে বই দিয়ে চোখ ঢাকলো অমিত। একজন ভদ্র-মহিলার সামনে সাধারণ সৌজন্য বোধেও যে উঠে বসা দরকার তার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করলো না। বরং যথেষ্ট বিরক্তি এবং অশোভন আচরণই প্রকাশ পেলো কণ্ঠস্বরে, কপালের বলিরেখায়।

একটা ছেঁড়া ধুতিকে ত্রুভাঁজ ক'রে লুঙ্গির মতো ক'রে পরেছে অমিত। অস্থি-চর্মসার এক্স্-রে প্লেটের মতো বুকটা ছেঁড়া একটা গেঞ্জি দিয়ে ঢাকা। কোণে টেবিলটা ফাঁকা। বিছানার উপর একরাশ বই, কাগজপত্র, সিগারেটের প্যাকেট। সারা ঘরে পোড়া সিগারেট, বিড়ির টুকরো। বিছানা বলতে একটা মাতুর, একটা নোংরা চাদর। মাথার নীচে রাখার জন্য যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাকে ঠিক বালিশ বলা চলে না। অনেকটা বালিশের অনুকরণ। মাতুরের সঙ্গে মিশে গেলেও মাথার নীচে

একটা কিছু যে আছে, এটুকুই সান্ত্বনা। এক কোণে একটা টিনের চেয়ার। টেবিলের উপর হাতের ব্যাগটা রেখে চেয়ারটা টেনে বসলো তৃপ্তি। ব'সে খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করলো—'কেমন আছো এখন?'

'রোগী দেখতে এসেছো?'

'রোগীই তো ছিলে এতো[redacted]—'কোমরের কষি থেকে ছোটো রুমালটা বের ক'রে মুখের উপর একটু বুলিয়ে নিলো তৃপ্তি—'প্রায় মাস পাঁচেক ধ'রে কোনো খবর পাইনি। তোমার গ্রামের ঠিকানায় দু-দুটো চিঠি লিখলাম, একটারও উত্তর দিলে না। আজ প্রায় দুমাস হলো কলিকাতা এসেছো, দেখা-সাক্ষাৎ তো দূরের কথা কেমন আছো' 'কোথায় আছো' জানালে না পর্যন্ত।'

'এ থেকেই কি বুঝতে পারোনি, তোমার সম্বন্ধে আমার বিন্দু-মাত্র মাথা-ব্যথা নেই। কেন এসেছো এখানে?'

'তোমাকে দেখতে।'

'ভালো আছি। দিব্যি আছি। ব্যস, আর কিছু জানার আছে?

'এবার যাও—'অমিত নির্লজ্জভাবে কাৎ হয়ে শুলো—[redacted] সময় আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যেয়ো।'

'কি করবে অন্ধকার ঘরে?'

'আপাতত ঘুমোবো। দরকার হলে জ্বেলে নিতে পারবো। যাও—'

'বিরক্ত হচ্ছো?'

'আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে?'

'আমি এসে কী এমন ক্ষতি করেছি তোমার?'

'ঘুমোতে দিচ্ছো না।'

আরও ধৈর্য, আরও সহিষ্ণুতা মনে-মনে সংগ্রহ ক'রে শক্ত হ'তে চেষ্টা করলো তৃপ্তি। বিছানার উপর টান হয়ে প'ড়ে আছে অমিত। তৃপ্তি তাকিয়ে রইলো। নিজেকে জটিল মনস্তত্ত্বের ডাক্তার কল্পনা ক'রে কিছুটা সুখ পেলো। যদি তাই হতাম, হ'তে পারতাম,

তাহলে মানুষটার মনের অলি-গলিগুলো জেনে নিতাম। ওর মুখ ফেরাতাম আমার দিকে।

অনেকক্ষণ ব'সে রইলো তৃপ্তি। চুপচাপ। মনিবন্ধের ছোটো ঘড়িতে সময়টা দেখলো একবার। কিছুক্ষণ পরে আরও একবার। দু মিনিট সময় কাটিয়ে মনে হলো পাঁচমিনিট, পাঁচ মিনিটকে আধঘণ্টা। দুটো ক্লাসের মধ্যবর্তী সময়টুকুতেও এতো ক্লান্ত লাগে না অধ্যাপকদের ঘরে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে। কথা বলার মতো আর কেউ যদি নাও থাকে, পড়ার মতো কোনো বইও যদি না পাওয়া যায়।

হঠাৎ ন'ড়ে উঠলো অমিত। চিৎ হয়ে শুলো। কনুই-এ ভর দিয়ে মাথাটা তুলে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিলো। নিঃশব্দেই একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালো—'তুমি এখনও ব'সে আছো?'

'তপস্যা করছি।'

অমিত উত্তর দিলো না। উঠে বসলো। পা-দুটো তক্তপোশের নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিলো। হাতটা মুঠো ক'রে, মুঠোর সামনের দুটো আঙুলের ফাঁকে সিগারেট রেখে গাঁজা টানার মতো শব্দ ক'রে সিগারেট টানে অমিত। প্রত্যেক টানে গলার হাড় বের হওয়া গর্তটা আরও ভয়ানকভাবে নীচের দিকে গেঁথে যায়। ভয় হয় দেখলে। তক্তপোশের তলা থেকে পা দিয়ে খুঁজে-খুঁজে স্যাণ্ডেলটা বের ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলো বাইরে।

দেয়ালের একটা পেরেক থেকে জানলার শিক্ পর্যন্ত একটা দড়ি টান ক'রে টাঙানো। তারই উপর কিছু ধুতি, শার্ট, আণ্ডার-ওয়ার অযত্ন-রক্ষিত। অপরিচ্ছন্ন এলোমেলো নোংরা একটা ঘর। সাজিয়ে-গুজিয়ে সুন্দর ক'রে রাখবার মতো আসবাবও

নেই। কিছুই নেই। আছে কিছু বই। কিন্তু বই যারা ভালোবাসে তারাও কত যত্নে রাখে নিজের সংগ্রহটা। কিন্তু এ মানুষটার যেন সে ইচ্ছাও নেই। তৃপ্তি উঠে গিয়ে কয়েকটা বই ওল্টালো। প্রায় সবই ইংরেজি। দু-একটা বাংলা কবিতার বই। নইলে আর সবই কোনোটা রাজনীতি, কোনোটা দর্শন, কোনোটা বিদেশি উপন্যাস। তৃপ্তি চারদিকে তাকালো। কড়ি-কাঠে একটি ফ্যানও চোখে পড়লো। কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠমাসের সন্ধ্যাতেও যে কেন সেটা বন্ধ বুঝতে পারলো না। তৃপ্তি জানলার দিকে এগিয়ে গেলো। ওধারে হ্যারিসন রোড। ট্রাম-বাস গাড়ির বিরক্তিকর শব্দ আসছে। তৃপ্তি আবার সেই টিনের চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়ালো। টিনের চেয়ারটাকে আরামদায়ক করার জন্য নিজেরই ভালো-ভালো কিছু জামা-কাপড় দিয়ে কুশন তৈরি করেছে অমিত। সেসব লক্ষ্য না ক'রেই এতক্ষণ সেখানে ব'সে ছিলো তৃপ্তি। আবার বসতে গিয়ে সেগুলো দড়ির উপর টাঙিয়ে রেখে বসলো।

গামছা দিয়ে এলোমেলো ভেজা-চুল ঘষতে-ঘষতে অমিত ঘরে এসে ঢুকলো। তৃপ্তি বললো—'এগুলো কি? এ-ও কি তোমাদের বোহেমিয়ানিজ্‌মের অঙ্গ নাকি?'

'কেন, কি হয়েছে?'

'ওই যে, ওগুলো।'

অমিত তাকালো। কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পেলো না চোখে-মুখে—'আছে, থাক না। ফেলে দিলেই চলবে।'

একটি হাতল-ভাঙা কাপে সেফ্‌টি-রেজারের যন্ত্রপাতি। সাবান-গোলা জল, কুচিকুচি দাড়ির গুঁড়ো ভাসছে। তৃপ্তি ভালো ক'রে লক্ষ্য করলো অমিতের গাল ছুটো। দেখে মনে হয় তিনদিনের পুরোনো।

'ওগুলো ক'দিনের পুরোনো?'

'হবে দিন-কয়েকের—তৃপ্তির প্রশ্নের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকুই যথেষ্ট মনে করলো অমিত। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার ক'রে ডাকলো—বনমালী, বনমা· ·

চাকরকে ডেকে দরজা বন্ধ ক'রে দেবার পর অমিত এগিয়ে এলো তক্তপোশের দিকে। টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা অজস্র দাঁত-ভাঙা চিরুনি বের ক'রে লম্বা-লম্বা চুলে আঁচড় কাটতে লাগলো।

'এই যে শুনেছিলাম, দাড়ি রেখেছো। গালভবা নাকি দাড়ি—' তৃপ্তি মৃদু হেসে বললো—'হঠাৎ এ' সুবুদ্ধি হলো কেন? কামিয়ে ফেললে।'

'স্কুলের থ্রি-ফোরের বাচ্চা ছেলেগুলো গালপাট্টা দাড়ি দেখলে ভীষণ ভয় পায়। ওতে ওদের আপন হওয়া যায় না। সে জন্যেই কামিয়েছি। তোমাদের ভদ্র সমাজকে খুশি করার জন্যে নয়।'

'ভদ্রসমাজকে খুশি কবার মতো কিছু কবতে পারো না?'

'ক'রে লাভ?'

'লোকসান তো নেই।'

'যেখানে লাভ আছে সেখানে আমার লোভ নেই। যেখানে লোকসান আছে তাও আমি করি না। কারও আপত্তি করার তো কিছু নেই। আমার যা ভালো মনে হয় আমি করবো।'

লম্বা চুলে ছোটো চিরুনি চালাতে গেলে চুলের গোড়ায় ব্যথা লাগে। অমিতেব চোখে-মুখে তা স্পষ্ট প্রকাশ পেলো। ঘাড়ের চুলগুলো বাবরির মতো ঢেউ তুলেছে, অমিত বোধহয় জানে না। তৃপ্তির চোখে পড়লো। কিন্তু কিছু বললো না। জানে, এখানে উত্তরে প্রশ্নের মর্যাদা থাকে না।

বনমালী ঘরে এসে ঢুকলো। একটা বাচ্চা ছেলে। অমিত ওকে ভাঙা কাপটা দেখিয়ে দিলো। বালিশের নীচ থেকে গুনে পয়সা তুললো কিছু।

'এক কাপ চা খাওয়াবে?' তৃপ্তি বললো।

অমিত তৃপ্তির দিকে তাকালো। বনমালীর হাতে কিছু পয়সা দিয়ে অমিত ওর পিঠ চাপড়ে দিলো—'তোর ছ'আনা বক্‌শিশ্। ছটো চা নিয়ে আসিস্ তো আর একপ্যাকেট চারমিনার।'

বনমালী চলে গেলে অমিত তৃপ্তির দিকে তাকালো—'এক কাপ চা-এর নামে তুমি আরও কিছুটা সময় এখানে বসতে চাও। কিন্তু কী দরকার বলো তো তোমার? কলকাতা শহরে কি আর কোনো জায়গা নেই? এই সন্ধ্যেবেলা একটা চরিত্রহীন, মাতাল, লম্পটের ঘরে---'

'অমিত—'

'কেন বোঝো না, ভদ্রসমাজের জন্যে কিছু করার থাকলে সে তোমাদেরই করা দরকার। আমার নামে চারিদিকে যে লোকশ্রুতি আছে সেটা অপবাদ, কুৎসা, নিন্দা। জেনে রেখো, আমি যেখানে থাকবো সেটাই শুঁড়িখানা, সেটাই জুয়ার আড্ডা, সেখানে অন্য ধরনের মেয়েছেলে আসে, তোমরা নও। আর তুমি যখন এঘর থেকে বেরিয়ে যাবে তখন লোকে তোমাকে অধ্যাপিকা তো দূরের কথা, ভদ্রমহিলাও বলবে না। বাজে মেয়েমানুষ ঠাওরাবে। যাও—'

'অমিত—' ক্ষোভে-অপমানে উন্মত্ত হয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়তে গিয়ে তৃপ্তি বিষম খেলো। কণ্ঠনালীটা চেপে ধ'রে একটু কেশে সামলে নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে উচ্চারণ করলো,—'তুমি এতো ছোটো হয়ে গেছো অমিত, এতো নীচ? ছি' ছি-–'

'থামলে কেন, ধিক্কারের ভাষা আর জানা নেই?'

'একজন ভদ্রমহিলাকে তুমি আর কতো ভাবে অপমান করতে পারো, দেখতে চাই।'

'কিন্তু জানো না, একটা বুনো জানোয়ারকে নিয়ে তুমি পরীক্ষা করছো।' তাতে ফল এতো খারাপ হতে পারে যে তখন আর আফশোশের সীমা থাকবে না।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো তৃপ্তি। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে আর উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস বইছে নাকে-মুখে। সবগুলো অনুভূতিকে এক করতে না পারায় একটা জমাট কান্না যেন ঠেলে উঠতে চাইছে ভিতর থেকে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলো তৃপ্তি। গোটা শরীর কাঁপছে। দাঁতে ঠোঁট চেপে স্থির পলকে তাকিয়ে রইলো অমিতের দিকে। প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখ নিয়ে তৃপ্তি যেন বিরাট এক ধ্বংসাবশেষ স্তম্ভেব দিকে তাকালো।

পায়ের উপর পা তুলে বসেছিলো তৃপ্তি। তাঁতের শাড়ির গোড়ালির পাড় ছুঁয়ে উঁকি দিচ্ছে কু'শ-কাটায় বোনা শায়ার লেস। স্পষ্ট দেখা যায়। শায়ার নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে ধবধবে মোলায়েম নরম একটি পা। কোথাও কোনো খুঁত নেই। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অমিত চোখ সরিয়ে নিলো।

'তুমি কি এখন উঠবে?' অমিত কটাক্ষে তাকালো।

'যদি না উঠি?'

'তাহলে আমি উঠব।'

তৃপ্তি ভ্রূকুটি তুললো—'না থাক্‌, তোমাব ঘর, তুমিই থাকো।'

তৃপ্তি উঠে দাঁড়ালো। পিঠ থেকে শাড়ির আঁচলটা বাঁ-কাঁধ ঘিরে টেনে এনে বুকটা ঢাকলো—'ভেবেছিলাম, আর যাই হোক, অন্তত আগের মতোই আছো। ভাবিনি, ভাবতে পারিনি অমিত, তুমি আমাকে অপমান করবে।'

অমিত সাড়া দিলো না। ব'সে ছিলো, গড়িয়ে পড়লো। যে বইটা পড়ছিলো সেটা আবার তুলে নিলো।

চৌকাঠ ডিঙোবার পথেই বনমালীর সঙ্গে ধাক্কা খাবার উপক্রম। ছেলেটির হাতে দুকাপ চা। তৃপ্তি দেখলো কিন্তু থামলো না।

একটা কান্নার চাপ হৃৎপিণ্ডের ভিতর আলোড়ন তুলেছে। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো তৃপ্তি। 'অ্যাট্রোফিন'এর দংশন চোখের মণিতে। চোখ-কান বুঁজে, নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দ্রুত পায়ে

বাস্তায় নেমে এসে হাঁপ ছেড়ে দাঁড়ালো। তখনও ঝাঁঝাঁ করছে কান দুটো, ধমনীতে উষ্ণ রক্তের স্রোত। রাস্তায় আলোর বন্যা বইছে। দু'পাশের বাড়িতে দোতলায়-তিনতলায়, একতলায় দোকানে প্রচুর আলো। বাত হয়েছে। ঘড়িব কাঁটায় পৌনে আটটা। মির্জাপুব ষ্ট্রীট ধ'বে সোজা গেলে একটু শর্ট-কাট হয়। পুবো হ্যারিসন বোডটা ঘুবতে হয় না তাহলে। যতোদূব সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো তৃপ্তি। এখান থেকে ভবানীপুব। বাসে গেলে খুব কম হলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অথচ এখনই, ঠিক এই মুহূর্তেই যদি ঘবে গিয়ে পৌছোনো যেতো, শুয়ে পড়তাম। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম কবছে। কিন্তু বাসে যদি ভিড় হয়? লেডিস্-সিটে যদি জায়গা না থাকে? ট্রাম বড়ো মন্থব। তাছাড়া নতুন ক'বে পাল্টাতে হবে এস্‌প্লানেডে। একটা ট্যাক্সিব মাথাব আলো জ্বলতে দেখে অতর্কিতে, কিছুটা নিজের অসম্মতিতেই হাতটা তুলে ধবলো হঠাৎ। ব্রেক কষে গাড়িটা পাশ ঘেঁষে সামনে এসে দাঁড়ালো।

ওয়েলিংটন, ওয়েলেস্‌লি, পার্ক ষ্ট্রীট, ক্যামাক্ ষ্ট্রীট, সার্কুলার রোড, চৌরঙ্গী। চেনা-অচেনা অনেক রাস্তা পেরিয়ে গাড়িটা হাওয়ার মতো তীব্রবেগে ছুটে খোলা ময়দানের সামনে এসে পড়লো। এরপব পরিচিত পথ। একটা অজানা-অচেনা লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত। লোকটাকে টাকা দেবো। মিটাবে যতো উঠবে ঠিক ততোটুকু। কিন্তু অমিত? যার জন্য গত পাঁচটা মাস আমি রাতের পর রাত ভেবেছি। যার জন্যে স্বামীর উপরও বিবক্ত হয়েছি কিছুদিন। কল্যাণ ভালো মানুষ। সহজ, স্বাভাবিক এবং উদার। কিন্তু এতোটা উদার কেন? কেন আমায় শাসন করে না? উঃ—

তীরের মতো পিছনের দিকে ছুটে যাচ্ছে চৌরঙ্গীর আলো, মানুষের মিছিল, বাস-মোটরের শোভাযাত্রা, অন্য দিকে অন্ধকারের ময়দান। বাতাসের ঝাপটা আসছে গাড়ির জানলা গলিয়ে। গাড়ির নরম

গদিতে গা এলিয়ে চোখ বুজতে চাইলো তৃপ্তি। একটু আরাম চাইলো। অসহ্য যন্ত্রণা দেহে আর মনে। স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি। গাড়ির গতিটা হঠাৎ একটু বেড়ে গেলো। অদূরে নীল-বাতির নিশানা। বোধহয় বিনা বাধায় পেরিয়ে যেতে চায় এলগিন রোডের মোড়।

অমিত আমাকে অপমান করলো। কী চায় ও? আমার অপরাধ? সমস্ত ঘটনাটার সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলো তৃপ্তি এবং শরীরের জ্বালাটা সইতে না পেরে ছটফট করতে লাগলো স্থির হয়ে ব'সে থেকে। সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেও একটা মানুষ একটি মহিলাকে কিছুটা মর্যাদা দেয়, চেয়ার এগিয়ে দেয়, কথাবার্তায় সচেতন হয়। দীর্ঘ পরিচয়ের কিংবা গাঢ় বন্ধুত্বের সব দাবিগুলো বাদ দিয়ে শুধু মাত্র নারী হিসেবে প্রাপ্য অধিকারটুকুর জন্যেই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো তৃপ্তি। ভুলে যাওয়া যায় না অমিতকে, যে মানুষটা আমার অস্তিত্বকে বিদ্রূপ করেছে, অকারণে অপমান করেছে। আস্তে আস্তে দৃঢ় সংহত কঠিন হতে চেষ্টা ক'রে সমস্ত শক্তিকে এক ক'রে মনে মনে একটা কঠোর শপথ নেবার জন্য তৈবি হলো তৃপ্তি। অমিতকে ভুলবো, ভুলতে হবে। কল্যাণ, আর কল্যাণকে নিয়ে সংসার। কল্যাণ, সংসার এবং কলেজ, সহকর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা অসংখ্য ছাত্রী। এই আমার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিমণ্ডল। আমার সব নিয়ে, সব কিছু দিয়ে আমি কল্যাণকে খুশি করবো। শুধু কল্যাণ, আমার স্বামী, আমার প্রেরণা, আমার দেবতা—তৃপ্তি অনুচ্চারিত ভাষায় শব্দগুলো আবৃত্তি করলো এবং একটি তীব্র তীক্ষ্ণ বেদনায় খোঁচা খেলো বুকের ভিতর। জোর ক'রে চোখ বুজে, কপাল কুঁচকে, নরম গদিতে মাথাটা রেখে ধীরে ধীরে আকস্মিক ব্যথাটা সামলে নিতে চেষ্টা করলো। কান্না জমছে বুকের ভিতর। অথচ বড়ো হয়েছি, বয়স বেড়েছে। অনেক বয়স। কাঁদতে ভুলে গেছি। কতদিন কাঁদিনি। চোখের জলে বকটা

হালকা হতো। কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা নয়, জ্বালা। ব্যথা সেখানে আরও বেশি তীব্র, আরও বেশি গভীর। জল হয়ে তা ফতুর হয় না, বাষ্প হয়ে ভিতরে ভিতরে গুমরোয়। আর সেই জ্বালা সইতে হয় একা-একা, নিভৃতে।

গাড়িটা ব্রেক কষলো হঠাৎ। ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলো তৃপ্তি। কিছু না। সামনের ট্রামটাকে ডান দিকে ওভার-টেক্ করতে গিয়ে গাড়িটা একটা বাসের মুখোমুখি এসে পড়লো। বাসটা চ'লে গেলো। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা আবার ছুটলো। তৃপ্তি এবার রাস্তার দিকে তাকালো। ভবানীপুর। এবার গলিটা চিনিয়ে দিতে হবে ড্রাইভারকে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তৃপ্তি চিন্তার স্রোতকে মাথা থেকে সরিয়ে দিলো। মন দিলো অন্য দিকে।

ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে ক্লান্ত, অবশ আর অবসন্ন বোধ হলো। বাড়ির ভিতর ঢুকে পা ফেলতে গিয়ে মনে হলো শরীরটা অসম্ভব রকমের ভারি। পা দুটো বইতে পারে না। সিঁড়ির মুখে ঝণ্টুর সঙ্গে দেখা।

'বৌদি—'

'কখন এসেছো?'

'এই তো একটু আগে। তোমরা কেউ নেই দেখে চ'লে যাচ্ছিলাম।' ঝণ্টু মুচকি হাসছে।

'হাসছো কেন?'

'না, এমনি—' ঝণ্টু সামান্য অপ্রতিভ কিন্তু ঋজু এবং স্বাভাবিক।

তৃপ্তির মনে পড়লো। আজ ঠিক মনে পড়ার কথা নয় তবু ঝণ্টুকে দেখেই যেন মনে প'ড়ে গেলো। সেদিন বিকেলে কলেজ থেকে ঘরে ফিরছিলো তৃপ্তি। ইউনিভারসিটির কাছে এসে ছাত্র-ছাত্রীদের আসা-যাওয়া, আরও সব পথচারীর আনাগোনা লক্ষ্য করছিলো বাসের জানলা থেকে। সেই ভিড়ের মধ্যেই চোখে চোখ পড়লো। ঝণ্টু সিগারেট টানছে। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই পিছনে হাত নিয়ে সিগারেটটা

ফেলে দিলো, তৃপ্তি দেখলো। কিন্তু মেয়েটিকে সরাতে পারলো না। রোগা ছিমছিমে চেহারার একটি মেয়ে। আকাশি-রঙের আটপৌরে শাড়ি আর সাধারণ একটা ব্লাউজ। বুক-চাপা বই। খুবই সামান্য একটা ঘটনা। হাল্‌কা মেজাজে একটু কৌতুক করা যায় এবং অনায়াসে ভুলে যাওয়াও চলে।

'এসো—' তৃপ্তি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-উঠতে প্রশ্ন করলো—'মেয়েটি কে?'

'বন্ধু, এক সঙ্গে পড়ি।' ঝণ্টু হাসলো।

'কি নাম?'

'শান্তা মিত্র।'

'শুধু বন্ধু?'

'তাছাড়া আর কি হবে?' ঝণ্টু উচ্ছ্বসিত হলো— বড়ো জোর্ সতীর্থ বলতে পাবো।'

'আলাপ করিয়ে দেবে না?'

'সময় হয়নি বৌদি। যদি তেমন সময় হয় নিশ্চয় দেবো। সকলের আগে তোমাব কাছে আসবো। ঝণ্টু সশব্দে হেসে ফেললো।

'সময় তোমাদের কি দেবে ঝণ্টু?'

ঝণ্টু উদাত্ত আর প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লো এবার—'জানো না, কী দেবে? জানো না? স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'বে?'

উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়েই হঠাৎ লক্ষ্য করলো, বৌদি গম্ভীর। একটু অস্বাভাবিক।

'বৌদি—'

'থামলে কেন ঝণ্টু। ওভাবে হাসতে হলে হঠাৎ থামতে নেই।'

'তোমার কি হয়েছে? তুমি অসুস্থ?

'কই না তো—' তৃপ্তির বিবর্ণ মুখের হাসিটা ম্লান দেখালো—'কিচ্ছু হয়নি। এসো, ঘরে এসো।'

দরজা খুলে দিলো নিধুর-মা। ঘরে ঢুকেই ফ্যানের সুইচটা টিপে দিলো তৃপ্তি। বুক-শেলফের উপর হাতের ব্যাগটা রেখে মিধুর-মার দিকে ফিরে তাকালো—'বাবু এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, বিকেলে ফিরে সন্ধ্যেবেলা চা-জলখাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন।'

'আচ্ছা, তুমি যাও। ও কি, তুমি বোসো ঝণ্টু। বোসো, চা খাওয়াব।'

ঝণ্টু বসলো না, বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। তৃপ্তি টেবিলের দিকে এগোলো। বিকেলের ডাকে কোনো চিঠি এসেছে কিনা দেখতে। খান কয়েক চিঠি। সবই কল্যাণের, শুধু একটি ছাড়া। হাত থেকে সব চিঠি ফেলে দিয়ে নিজের চিঠিটা তুলে নিয়ে ব'সে পড়লো চেয়ারে। দেয়ালের আলো জ্বললেও টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালালো। একটা খাম। মমতার চিঠি। ব্যস্ত হাতে খুলে ফেললো। ছোটো চিঠি, মাত্র গোটা দশেক লাইন—'দিদি, মরতে পারলাম না রে। ভয় লাগলো। কিন্তু এ ভাবেই কি বাঁচতে চেয়েছিলাম ? গত বুধবার আমার বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, ডিগবয় শহরে সাহেবসুবো থেকে নাগা কুলি পর্যন্ত কেউ বাকি ছিলো না। সবাই এসেছিলো। এখন আমি চীফ্-ইঞ্জিনিয়ার মজুমদার সাহেবের সুন্দর বাংলোটার একটা ঘর থেকে কাঁদতে-কাঁদতে তোকে এ চিঠি লিখছি। যে মানুষটাকে তোর বিয়ে করতে হলো না ব'লে আমি হাপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম, এখন সে মানুষটাই আমার বর। কেন এমন হলো ? এখন আমি কী নিয়ে বাঁচবো। দিব্যি করে বলছি দিদি, আমি আবার মরতে চেষ্টা করবো। তোকে আমার হিংসে হয়। আমাদের সংসারের সব পুণ্য, সব ভাগ্য কি তুই একাই কেড়ে নিয়েছিস ? ভেবেছিলাম, এখন যখন হলো না, বিয়ের পর একজন সত্যিকারের বড়ো মানুষের বৌ হয়ে কলকাতায় যাবো। সেখানে থাকবো, সেখান থেকে এম-এ পড়বো। আমার হলো না। আবার

ডিগবয়েই গোটা জীবনের জন্য বাধা প'ড়ে গেলাম। জামাইবাবুর একটা ফোটো পাঠাবি। বাবা জানতে পারবেন না, কেউ জানবে না। আমি লুকিয়ে রাখবো।'

স্নায়ু যন্ত্র শিথিল হয়ে আসছে। ভাবতে ভুলে যাচ্ছে তৃপ্তি। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। নিজের উপর নিজের সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলছে। আস্তে আস্তে, একটু একটু ক'রে মাথাটা ঢ'লে পড়ছে। ঢ'লে পড়ছে। বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠছে সেই কান্নার বাষ্প। আচ্ছন্নের মতো মাথাটা আছড়ে পড়লো টেবিলের উপর। তবু কাঁদতে পারলো না তৃপ্তি। আর্তনাদ করতে পারলো না একবার।

ঝণ্টুর চোখে পড়লো। ধড়ফড় ক'রে উঠে এগিয়ে এলো কাছে—

'বৌদি।'

পীড়িত, ক্লিষ্ট বেদনার্ত মুখটা তুললো তৃপ্তি। ঝণ্টু ভয় পেলো সেই মুখের দিকে তাকিয়ে—'কী হয়েছে বৌদি? বাড়ির চিঠি? কোনো দুঃসংবাদ?'

তৃপ্তি মাথা নাড়লো।

'কারও অসুখ?'

'না।' প্রায় শোনা যায় না এমনি আলতোভাবে তৃপ্তি শব্দটা উচ্চারণ করলো।

'তবে?'

অনেক কষ্টেও যেন তৃপ্তি হাসতে চাইলো একটু। ঝণ্টুর কাঁধে হাত রাখলো। রুগ্ন গলায় টেনে-টেনে বললো—'রাগ কোরো না ভাই। তুমি এলে অথচ—'

'না, না, তাতে কি। তুমি একটু বিশ্রাম করো বৌদি। আমি যাই। কাল-পরশু আবার আসবো।'

'চলে যাবে।'

'হ্যাঁ যাই।'

ঝণ্টু চ'লে যাচ্ছিলো। তৃপ্তি পিছু ডাকলো—'ঝণ্টু।'

'কিছু বলবে?'

'তোমার বান্ধবীকে নিয়ে আসবে না একদিন?'

'আনবো।'

'এনো।'

ঝণ্টু দেখলো না। দেখলেও বুঝলো না, শেষ কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে বৌদি কেঁপে-কেঁপে উঠলেন এবং টাল সামলাতে না পেরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শব্দ এড়িয়ে সন্তর্পণে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঝণ্টু আড়াল হবার পর তৃপ্তি উপুড় হয়ে পড়লো বিছানার উপব। ভুলে গেলো সকালের ভাঁজ-ভাঙা তাঁতের শাড়িটা এখনও পরনে, সারাদিনের গরমে ব্লাউজটা চামড়ার সঙ্গে আঠার মতো এঁটে আছে।

তৃপ্তি আবার কাঁদতে চাইলো। ডুকরে-ডুকরে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে নয়, তারস্বরে চিৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছা করলো। প্রচণ্ড ব্যথার চাপ বুকের ভিতর, কান্না জমছে। তবু চেষ্টা ক'রেও কাঁদা যায় না। নখের আঁচড় পড়ছে পাঁজরা দুটোয়। কামড়ায়। অসহ্য যন্ত্রণা।

মমতা! মমু! মমতা! স্মৃতি খুঁড়ে-খুঁড়ে অনেক গভীর থেকে যে মেয়েটির অস্পষ্ট মুখের ছবি ভেসে উঠলো, তৃপ্তি তার সঙ্গে স্বপ্নের ঘোরে কথা বলতে চাইলো। সে মেয়েটি হাসছে, ছুটোছুটি করছে, চুল বেঁধে দিচ্ছে কিংবা নিজেরটা বাঁধছে। অনেক চেষ্টা ক'রেও কল্পনা করতে পারলো না—মেয়েটি বধূ এবং ঘোমটার আড়ালে কাঁদছে। যদি ওকে কাঁদানো যেতো আর যদি সেই কান্নার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো তৃপ্তি, তবে বোধহয় কান্নাটা সংক্রামিত হতে পারতো নিজের মধ্যে। তৃপ্তি কাঁদতে পারতো। বেদনা লাঘব হতো। এর পর আচ্ছন্নতায়, তন্দ্রায়, ঘুমে তৃপ্তি ভুলে গেলো, রাত কত হলো। কল্যাণ এলো। ঘুম থেকে জেগেই কল্যাণকে গম্ভীর দেখলো তৃপ্তি। বোঝা গেলো, ও চিঠিটা পড়েছে। বাকি সময়টুকু, প্রাত্যহিক

নিয়মে খাওয়া-দাওয়ার পর সব কাজ সেরে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত দুজনেই দুজনের ব্যথার অংশীদার হলো। কথা বললো না কেউ। তৃপ্তি জানে, কল্যাণ সান্ত্বনা দেবে। তবে আজ নয়, এখন নয়, বুকের কান্নার বাষ্প নিঃশেষ হয়ে গেলে। তৃপ্তিকে কাঁদতে হবে তার আগে।

অনেক রাতে, অনেক গভীর রাতে যখন ঘুমে অচেতন হবার কথা, তখনও নিরলস চিন্তায় আত্মমগ্ন তৃপ্তি। ঘর অন্ধকার। অন্ধকারে চোখ খোলা রেখে তাকিয়ে রইলো। একটু নড়লে কল্যাণের গায়ে হাত ঠেকে। কল্যাণ কি ঘুমিয়েছে? একটু আগেও জোনাকির মতো জ্বলছিলো ওর হাতের সিগারেট।

তৃপ্তি ভেবে পেলো না কী নিয়ে ভাববে, কী নিয়ে ভাবা উচিত আগে। ধ্ব'সে ধ্ব'সে যাচ্ছে অমিত। অথচ কেউ নেই যে ওকে সেই বিরাট ধ্বংস থেকে উদ্ধার করে, আবার নতুন ক'রে ফিরিয়ে আনে। সেই ভীষণ শক্ত মানুষটা, তৃপ্তি মনে মনে মিছিলের অমিতকে স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে আনলো, সেই মানুষটা তিলে তিলে ম'রে যাচ্ছে। অমিত আমাকে বিশ্রীভাবে অপমান করেছে। নারীত্বের অপমান। বিশেষত পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে। মমতার চিঠি। সানাই বেজেছিল মমতার বিয়েতে, এখন থেমে গেছে। আরও একটা জীবনের অপচয়, আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু। তৃপ্তি স্থির করতে পারলো না আজকের এই অশান্ত মানসিকতায় কোন্ চিন্তাটা প্রাধান্য পেয়েছে বা পাওয়া উচিত—বন্ধুর ক্ষতি, নিজের নারীত্বের অসম্মান, ছোটো বোনের কান্না। অথচ ত্রিকোণের কোথাও সিদ্ধান্ত দানা বাধলো না বলেই ত্রিভুজের মধ্যে ছটফট করতে হচ্ছে। মাথাটা গরম হয়ে উঠছে। আজ রাতে ঘুম হবে না। অথচ ঘুমনো উচিত। যদি কাঁদা যেতো। তৃপ্তি আরও একবার কাঁদতে চেষ্টা করলো। ফ্যানটা ঘুরছে মাথার উপরে। অন্ধকারে দেখা যায় না। হাওয়া আসছে অফুরন্ত। স্তব্ধতায় ফ্যানের সামান্য শব্দটুকুও একঘেয়ে

হয়ে কানে বাজছে। তৃপ্তি বিরক্তিতে পাশ ফিরে শুলো। টান পড়লো কাঁধের আঁচলে। আঁচলটা নামিয়ে দিলো।

রাত-দুপুরের স্তব্ধতা কাঁপিয়ে হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ হলো বাইরে। কড়া নাড়ার আওয়াজ। ও বাড়ির সেই মাতাল লোকটা। অসভ্য জানোয়ার। ঘর-ভরা অন্ধকার সত্ত্বেও সমস্ত শরীরে একটা মোচড় দিয়ে দুজনের বালিশের মাঝখানে মুখটা গুঁজে রইলো তৃপ্তি। ভয়ে নয়। কান ঢাকার চেষ্টা। শব্দটা জঘন্য। অসহ্য।

'কি হলো?'

অবাক হলো তৃপ্তি, কল্যাণ জেগে আছে এখনও। আবার ঠিক হয়ে বালিশে মাথা রেখে লঘুস্বরে বললো—'না, কিছু না।'

'ঘুমোও নি?'

'না।'

'ঘুমোও—'

কল্যাণের একটা হাত উঠে এলো তৃপ্তির কাঁধে। আস্তে আস্তে মোলায়েম স্পর্শে হাতটা নেমে গেলো কনুই পর্যন্ত। তৃপ্তির অনুভূতিতে নাড়া দিলো। আদর করছে কল্যাণ, স্নেহ। দিনের শেষে একটা মানুষ আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছে। অন্ধকারেব মধ্যে তৃপ্তি নিজের হাতটাও কল্যাণের বুকের উপর রাখলো। কল্যাণের চওড়া রোমশ বুকে হাত বুলিয়ে, গলা বেয়ে সেই হাত উঠে গেলো কল্যাণের মুখের উপর। নিয়মিত-কামানো দাড়িটা নরম হাতে একটু-একটু লাগে। ভালো লাগে বুলোতে।

'তৃপ্তি—'

'বলো।'

'ঘুমোও।'

তৃপ্তির কান্না পেলো। এবার কান্নার বাষ্প গলা পর্যন্ত উঠে এলো। অমিত, মমতা, মমতা, অমিত। তৃপ্তি ওদের ভুলতে চেষ্টা করলো। হঠাৎ প্রচণ্ড আবেগে কল্যাণকে জড়িয়ে ধরলো। কেঁপে-কেঁপে

উঠলো। বুকের নরম চাপ পড়লো কল্যাণের শরীরে। আর স্বাস্থ্যবান স্বামীর প্রশস্ত বুকে মাথা গুঁজে অবোধ শিশুর মতো নিজের বয়স, মর্যাদা, সম্মান ভুলে, সব বিস্মৃত হয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো তৃপ্তি। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলো। পরম আদরে, স্নেহে, প্রেমে, আবেগে, অনুরাগে স্ত্রীর পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে কল্যাণ ডাকলো,—তৃপ্তি।'

তারপর সেই রাত গভীর হলো। আরও গভীর। গভীর এবং আদিম। আদিম এবং গভীর। এই রাত ওরা চেয়েছিলো। এই রাত কামনা করছিলো কল্যাণ, প্রতীক্ষা করছিলো তৃপ্তি। মনে হলো, এই অন্ধকার রুদ্ধগৃহের বাইরে যে পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষের কোলাহল, দুঃখ-যন্ত্রণা-কান্না-হতাশা-ব্যর্থতা সব মিথ্যে, তাব চেয়ে বড়ো এবং মহৎ এই অন্ধকার, এই নির্জনতা, এই মিলিত জীবন। মনে হলো, যেন এক সমুদ্রের শয্যায় শুয়ে আছে ওরা। ডুবে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। জীবনের, যৌবনের অনাস্বাদিত উত্তাপের সুখে, প্রীতিকর ক্লান্তিতে, হাঁসফাঁশ করা রোমাঞ্চে শিরায়-শিরায় উপশিরায়, শরীরের অণুতে-অণুতে চঞ্চল রক্তের স্রোতে আলোড়িত মথিত হয়ে ওরা ডুবে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। ডুবতে-ডুবতে চেতনা অবশ হয়ে এলো। পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, কান্না হতাশা-ব্যর্থতা একে একে মিলিয়ে গেলো চিন্তা থেকে। শুধু মনে হলো—'আমি আছি, আমি থাকবো। এই সুখ আমার একার নয়, এই সুখের জন্য প্রয়োজন দ্বৈত জীবনের। আমি থাকবো, কল্যাণ থাকবে, আমি আছি, তৃপ্তি আছে। সমস্ত অনুভূতি শিথিল হয়ে এলে তৃপ্তির দংশনে শরীরের স্বাদ পেলো কল্যাণ। তৃপ্তি নিজেকেই নিজের মধ্যে হারালো।

বারো

একটা ইঁদুর সারারাত ধ'রে ঘুরে বেড়িয়েছে ঘরের আনাচে-কানাচে, তক্তপোশে, শরীরে। ভোর হলো। বেলা বাড়লো। মুখ থুবড়ে প'ড়ে ছিলো অমিত ঘুম ভাঙার পরই পায়ের কাছে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব ক'রে মাথা তুলে বসলো। পায়ের কাছে আবিষ্কার করলো ছোটো একটু ক্ষত, শুকনো রক্তের দাগ। ইঁদুরের দংশন। এবং চারদিকে তাকিয়ে ঘরটাকে ডালা-বন্ধ-করা একটা সিন্দুক বলে বোধ হলো। দরজা ভেজানো, একটি মাত্র জানলা। সেটা খোলা। ওদিকে চটের পর্দা টাঙিয়ে বাইরের বারান্দায় আব্রু ঢাকা হয়েছে। জানলা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। অথচ ঘরের আব্রু কে রাখে? পায়ের ঘা-টাকে নিয়ে বেশি না ভেবে একটা সিগারেট ধরানোই ভালো মনে করলো অমিত এবং তক্তপোশের কোণ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে আনতে গিয়েই চোখে পড়লো দেয়ালে টাঙানো সম্পূর্ণ উলঙ্গ, অশ্লীল ভঙ্গিতে আধশোয়া চীনা-মেয়েমানুষের ফোটোটা। ঐ দেয়ালে সেটা যত্ন ক'রে বাঁধানো। মান্ধাতার আমলের একটা ড্রেসিং-টেবিল। বোধহয় পঁচিশ বছর আগে কোনো চোরা-বাজার থেকে কেনা। আরশিতে ইতস্তত পারা-ওঠার ক্ষতচিহ্ন এবং কাঠ-গুলো ফেটে-ফেটে, কোথাও চল্‌টা উঠে মোটামুটি একটা মানানসই নক্সা তৈরি করেছে। তাতে কিছু শস্তা স্নো-পাউডার, চিরুনি, চুলের ফিতে, চুলের কাঁটা এবং চীনে-মাটির ফ্লাওয়ার-ভাস দুটো। সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে আনতে গিয়ে বালিশের পাশে একটা বেলফুলের মালাও দেখতে পেলো অমিত। কাল তাজা ছিলো। এখন শুকিয়ে লালচে হয়েছে। কাল খোঁপায় বেঁধে মেয়েটা সেজে-ছিলো। এখন বিবর্ণ, কিছুটা হলদে, অথবা ঈষৎ লাল্‌চে।

খালি পেটে সিগারেটের ধোঁয়া পেটের নাড়িভুঁড়িতে পাক দেয়। প্রথম টানের পরই অসহ্য বিরক্তিতে বিতৃষ্ণায় ঘরের কোণে সিগারেটটা ছুঁড়ে মারলো অমিত। হঠাৎ একটা চোয়া-ঢেঁকুর উঠে কণ্ঠনালীটা কামড়ে ধরতেই মনে প'ড়ে গেলো কাল রাতে বড়ো বেশী হয়ে গেছে। নইলে এখনও, ভোর হয়ে যাবার এতক্ষণ পরেও মুখটা তেতো লাগবে কেন ?

ভেজানো দরজা ঠেলে সরযূ এসে ঢুকলো। ওর দিকে তাকিয়ে আরও একটা বিষাক্ত উদ্‌গার চাড়া দিয়ে বুক আর গলায় জ্বালা ধরিয়ে দিলো। এক হাতে গলাটা চেপে ধ'রে অন্য হাতে বুক হাতড়াতে হাতড়াতে চোখ বুজে সইতে চেষ্টা করলো। তারপর সরযূর দিকে তাকিয়ে ঘৃণা বোধ হলো। কী কুৎসিত একটা মেয়েমানুষ। অথচ এই মেয়েটাই কাল আমাকে ঠকিয়েছে। ঠিক এমনি ক'রে প্রায়ই ঠকায়, প্রতারণা করে। প্রতারণা! অমিত শব্দটার ওজন যাচাই করলো কিন্তু বদলালো না। প্রতারণাই তো। নইলে সন্ধ্যে বেলা অমন সেজেগুজে, শরীরে উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে নেশার ঘোর লাগাবে কেন ? আর সারারাতের চুক্তিতে উল্টে-পাল্টে, দ'লে-ম'লে সকালে উঠে দেখবো একটা ডাইনি। অমিতের বিশ্বাস হলো না, এই মেয়েটাই সরযূ। একে নিয়েই কালকের রাতটা কেটেছে। মুখ ধুয়ে আসার পরও মনে হচ্ছে চোখের পিচুটি যায়নি এবং চোয়াল-ভাঙা ব্রণ-ভরা গালে বোধহয় এখনও লালা লেগে আছে। চোখের নীচের কালি পেণ্ট ক'রে ঢেকে দেওয়া সম্ভব কিন্তু চোখ দুটো যে এতোখানি গেঁথে গেছে, কোন্ জাদুতে সেটা ধোঁকা দেয় সন্ধ্যাবেলা ? ভেবে বিস্মিত হলো অমিত। শরীরের সেই গড়ন, সেই ছাঁচই বা কই ? যাকে যুবতী ব'লে ভুল হয়েছিলো কাল। কিংবা প্রায়ই যে ভুলটা হয় বা হয়ে থাকে। রীতিমতো ঢিলে একটা ব্রেসিয়রের উপর শাড়ি জড়িয়ে ঘরে ঢুকেছে সরযূ। অথচ এখন কোনো আকর্ষণ বা উত্তেজনাই বোধ করা যায় না ওকে দেখলে। টর্চের ব্যাটারির

ছাপ মারা বসন্তের টীকার দাগ ওর হাতের উপরের দিকে। দুহাতের কনুই-এ কালচে সোনার আড়াই-প্যাঁচ সাপের কুণ্ডলি। চারদিকের চামড়াই ঝুলো-ঝুলো, পুঁটিমাছের আঁশের মতো খুব ছোটো ছোটো খড়ি, খশখশে কালো ত্বক। সব কিছুর দিকে তাকিয়ে ঘৃণায়, বিদ্বেষে ধিক্কারে মনটা বিষিয়ে উঠলো। যতক্ষণ মাতাল থাকি ততক্ষণই ভালো। মদ নেশা ধরায়, বেলফুল তাজা থাকে, আর সরযূর মতো মেয়েমানুষকেও যুবতী ব'লে ভ্রম হয়। নেশা কাটলেই ভুল ভাঙে। কেমন বিস্বাদ লাগে সব কিছু। তখন পালাতে ইচ্ছে করে এ নরক থেকে।

ঘরে ঢুকেই সরযূ তক্তপোষের নীচে মাথা গলিয়ে কী যেন খুঁজছে। খালি বোতলগুলো থাকে তক্তপোশের নীচে, আর ওর বাক্‌শো-প্যাঁটরা। মৃদু মৃদু কাচের চুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওকে জেগে ব'সে থাকতে দেখেও সরযূ যে কোনো কথা বললো না সেজন্য মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করলো অমিত। নামবে ব'লে নুলোর মতো তক্তপোষে কোমর ঘষতে-ঘষতে একেবারে ধারের দিকে এলো। বোধহয় বমি হবে। তাড়াতাড়ি বাইরে যাওয়া দরকার।

বমি হলো। পেটের ভিতরে যাবতীয় যন্ত্রগুলি উথাল-পাথাল ক'রে গমকে-গমকে বমি উথলে উঠলো। সরযূ সহানুভূতি দেখালো না, পিঠে বুকে হাত বুলোলো না। অন্যান্য ঘরের আরও কয়েকজন রসিকতা করলো, টিপ্পনি কাটলো। মুখ ঘুরিয়ে, কোমর দুলিয়ে চ'লে গেলো। সরযূ হয়তো অনেক কিছুই বলতো, আর কিছু না হোক কিছু অশ্রাব্য গালি-গালাজ, যদি বেগ সামলাতে না পেরে ঘরের মধ্যেই সব ভাসিয়ে দিতো অমিত।

কিছুটা সুস্থ বোধ ক'রে অমিত দোতলার ফাঁক থেকে নীচের দিকে তাকালো। একতলায় কল-চৌবাচ্চা-পায়খানা। একটা গামছা প'রে এইমাত্র যে মেয়েটা কলতলা থেকে এলো, তাকে দেখে কী যেন বললো স্নানরতা অন্যান্য মেয়েরা। এক কোণে

কাপড় কাঁচছিলো যে মেয়েটা সে এক লাফে উঠে এলো। তখনই গলার স্বর চড়লো ওদের এবং যে ভাষায় ওদের বাক্য বিনিময় শুরু হলো সেটা বাংলা ভাষা হলেও অমিতের অভ্যস্ত কানে পর্যন্ত বিঁধলো। বিরক্তিতে স'রে আসতে হলো। এখানে সকাল হলেই কেমন বিশ্রী হয়ে যায় সব কিছু। রাতে আর রাতের অন্ধকারেই এজায়গাটা লাগে ভালো। আলোতে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করে।

কড়ায়-ক্রান্তিতে পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে এবং প্রায় ফতুর হয়ে অমিত সেই নরকের দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। প্রথমেই মনে হলো—যাক, পৃথিবীতে আরও একটা রাত কাটলো। গুনে-গুনে রাত আর দিন, মাস আর বছর কাটায় বুড়োরা। আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? অমিত ভাবলো। ভাবতে-ভাবতে সেই উৎকলি-বামুনের চায়ের দোকানের দিকে এগোলো। নিজেকে রুগ্ন, অসুস্থ, অকেজো আর ক্লান্ত চিন্তা ক'রে বারবার মনে হলো একবার হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লে বাঁচা যায়। কালকের রাতের জঘন্য দুঃস্বপ্নটা ভোলা যায় কিছুক্ষণের জন্য।

মহানগরী কলকাতার বুকে প্রকাশ্য অথচ নিষিদ্ধ অঞ্চল এপাড়া, এই অন্ধ গলি এবং আরও অন্যান্য অনেক গলি-উপগলি। শিব-মন্দির আছে, পূজারীও আছেন। সর্ব্বজনীন কার্তিক পূজো এপাড়ার বাৎসরিক উৎসব। কিন্তু সারা বছর ধ'রে এপাড়ার প্রাণশক্তিকে ধারণ ক'রে আছে নরেন পাণ্ডার তেলে-ভাজার দোকান, ভোলা-গোপাল-হারাধনের পানের দোকান এবং ভজহরি দাসের চায়ের দোকান। আরও একটি দোকান ছিলো। কিন্তু নিষিদ্ধ পানীয়ের কেনা-বেচার দায়ে তার মালিক এখন হাজতে। অমিতকে এখানকার সবাই চেনে না কিন্তু একে-একে অমিত সকলকেই চিনে নিয়েছে। নিয়মিত খদ্দের না হলে এখানে বিখ্যাত হওয়া কঠিন।

দোকানের সামনে দুটো কাঠের বেঞ্চ লম্বা ক'রে পাতা। একদিকে ছোটো একটা জলচৌকিতে আড়াই মণ ওজনের শরীরটা চাপিয়ে একটা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে তেল মালিশ করছিলেন এপাড়ার সেই বিখ্যাত পুরুষ। বাবরি চুল, মোগলাই গোঁফ, আসমানি বেলুনের মতো বিরাট ভুঁড়ি, কানে-নাসায়-বুকে-পিঠে জন্তুর মতো লোম। একমাত্র পুলিশী জুলুম ছাড়া আর সব রকম অত্যাচার থেকে এপাড়ার অবলাদের রক্ষার কাজে তিনি এবং তাঁর বিশ্বস্ত সাকরেদরা ব্যস্ত। বয়স পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ। কিন্তু স্বাস্থ্যে-শক্তিতে এখনও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। এ অঞ্চলে তিনি অনুগত শিষ্য-অনুচরদের ওস্তাদ, বাড়িউলিদের দাদা, মেয়েদের পাইকারি খুড়ো, কারও কারও হয়তো বা বাবাও। পৃষ্ঠপোষকরা সবাই তাকে চেনে অথবা চিনতে বাধ্য হয়। অমিতকে দেখে লাল লাল ঘোলাটে চোখ তুলে একবার তাকালেন। কোনো রকম আমল না দিয়ে অমিত এগিয়ে এলো। ভিতরে ঢুকেই চমকে উঠলো—'তুই!'

চা-টুকু শেষ হবার পর মাটির ভাঁড়টাকে আসট্রে তৈরি ক'রে ব'সে ছিলো লোকেন। তর্জনি ঠুকে সিগারেটের ছাই ফেলে বন্ধুর দিকে না তাকিয়েই বললো—'তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

শরীরটা অসুস্থ। তবু অমিত হাসতে-হাসতে বললো—'কাল তুইও এসেছিলি বুঝি। বাবা, ডুবে-ডুবে জল খাও। আগে বলিসনি কেন? কোথায় কার ঘরে?'

শেষ শব্দ কটা কানের কাছে মুখ এনে ফিশফিশিয়ে ব'লে বন্ধুর পাশে বেঞ্চের একটু অংশ জুড়ে বসলো অমিত। লোকেন আগের মতোই চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে সিগারেটে একটা টান দিয়ে নীচু গলায় প্রশ্ন করলো—'কাল রাতে যাসনি কেন? এতোরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।'

'কোথায়?'

'আমাদের মেসে।'

'ভালো লাগলো না।'

'বললেই হলো, ভালো লাগলো না—'সক্রোধে মুখোমুখি তাকালো লোকেন—'সব কিছুবই একটা মাত্রা আছে। সবে কাল তোব চাকরি গেলো। মাস ফুরোলে আসছে মাসে হোটেলের টাকা জোগাবি কোথ্‌থেকে তার ঠিক নেই, আর তুই এক রাতে এতো-গুলো টাকা উড়িয়ে দিলি।'

'তোবও তো টাকা নেই। কাল ধার চাইছিলি। তুই এলি কেন?'

'আমি আসিনি।'

'আসিসনি! সাধু সাধু—' অমিত লোকেনের পিঠে হাতেব তেলো ঠুকলো—' তাহলে এতো ভোবে এই কাশীধামে যে হঠাৎ—

'রাতে আমার ওখানে এলি না তাই ভোরে উঠেই তোর হোটেলে ছুটলাম। গিয়ে শুনলাম কাল গোটা রাতই নাকি ঘরে ফিরিসনি। অগত্যা এখানে না এসে উপায় আছে? অমিত—'

'বল—'

'কাজটা ভালো করিসনি।'

কোন কাজ।'

হেড-মাস্টারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নে।'

'কী—দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠলো অমিত—' ওই বুড়োটার কাছে ক্ষমা চাইবো? ক্ষমা! বলছিস কি তুই?

অম্লস্বাদের একটি বিশ্রী ঢেকুর উঠলো আবার। মুখ-চোখ বিকৃত হয়ে উঠলো। অমিতকে বুকে হাত দিয়ে ঝাঁঝ সামলাতে দেখে লোকেন বললো—'চল উঠি। সে সব পরে ভাবা যাবে। কিছু খাবি? চা—'

অমিত মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালো। লোকেন নিজের চায়ের দাম মিটিয়ে একটা রিকশা ডাকলো।

রিকশার ঝাঁকুনিতে শরীর দুলছিলো। অনেক কষ্টে বুকের আর কণ্ঠনালীর জ্বালা দমন ক'রে অমিত স্বাভাবিক হয়ে উঠলো—'আমাকে নাকি কে মদের দোকানে মদ খেতে দেখেছে। আরে বাপু, যদি দোকানের মধ্যেই দেখে থাকে তবে নিশ্চয়ই সে নিজেও সেখানকার খদ্দের। আর তিনি যদি কোনো মাস্টারমশাই হন তবে দোষটা আমার একার হবে কেন। লোকটা কে জানতে চাইলাম, বললো না। আমি সেজন্য তর্ক করলাম তাই আমার অপরাধ হয়ে গেলো। আমার খুশি আমি মদ খেয়েছি, বেশ করেছি। কিন্তু আমি আর ক্লাসে যাবো না শুনে ছেলেরা যদি আজ স্ট্রাইক করে কে ওদের রুখবে।'

'তোর খুশিটাই তো আর সব নয়। স্কুলের তো একটা ডিসিপ্লিন আছে।'

'রাখ তোর ডিসিপ্লিন—' তীব্র প্রতিবাদে অমিত ধমকে উঠলো। ওর শরীরের মোচড়ে রিকশাটা এমনভাবে কেঁপে উঠলো যে রিকশাওয়ালা ভার সামলাতে না পেরে একটু বেঁকে গেলো—'শালা সব ব্যাটাকেই চিনি। স্কুলের টাকা চুরি ক'রে-ক'রে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স মোটা করছে, কোন মাস্টারটা তার খোঁজখবর না রাখে। শুধু চাকরির ভয়ে মুখ বুঁজে আছে। সেদিন দুটো কথা শুনিয়েছি আর অমনি আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি। আর তুই ওই বজ্জাতটার কাছে ক্ষমা চাইতে বলছিস।'

'আহা, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তোর চলবে কি করে? খাবি কি?'

'তাই বলে, ওই বজ্জাতটার গোলামি করবো।'

'বেশ তো—' লোকেন বন্ধু শান্ত করবার চেষ্টা করলো—'কিন্তু এখন খাবি কি, থাকবি কোথায় সে সব কথা ভাববি তো।'

'এ'মাসটা হোটেলেই থাকবো।'

'কিন্তু তারপর?'

‘তারপর তোর ওখানে থাকবো আর সেই মুসলমানের দোকানে খাবো।’

‘ওভাবে কদিন চলবে।’

‘যতোদিন কোনো চাকরি না পাই।’

‘যে সামান্য খরচটা দরকার, তাই বা পাবি কোথায়।’

অমিত চুপ করলো। বাকি পথটুকু নিঃশব্দেই কাটলো। ট্রাম-রাস্তায় এসে রিকশা থামিয়ে নিজে নামলো লোকেন। ধ’রে-ধ’রে অমিতকেও নামালো। জিজ্ঞেস করলো—‘বাসে যেতে পারবি তো? কষ্ট হবে না? না ট্যাক্সি ডাকবো?’

অমিত বললো—‘ট্রাম।’

তেরো

‘তবু, তবু আমরা বাঁচবো। আমাদের দাঁড়াতে হবেই—’ কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য দৃঢ়তা আর গাম্ভীর্য এনে শপথ নেবার ভঙ্গিতে ঝণ্টু বললো। পকেট থেকে টাকাগুলো বের ক’রে বন্ধুর হাতে তুলে দিলো। দুটো দশটাকা আর একটা পাঁচটাকার নোট—‘এতে চলবে না?’

কুণ্ঠিত হাসিতে বিমল ওর কৃতজ্ঞতা জানালো—‘আমার কাছে প্রায় টাকা পঞ্চাশেক আছে। লাগবে বাহাত্তর। বাড়তি তিনটে টাকা তুই রেখে দে বরং।’

‘না ওটা তোর কাছেই রাখ। তোর দরকার বেশি।’

‘‘কিন্তু তোর? টিউশানির টাকা আমাকে দিয়ে দিলে তোর চলবে কী ক’রে।’

‘সব টাকা—?’ ঝণ্টু ভ্রূকুটি তুললো—‘প্রসূন মুখুজ্জে পঁচিশ টাকার টিউশানি করে না। পেলেও ছেড়ে দেয় জেনে রাখিস। চল্, ক্যান্টিনে চা খাবো।’

তখন প্রায় দেড়টা। ঘরে ঘরে ক্লাস হচ্ছে। ইউনিভারসিটি হলটা বেশ ফাঁকা আর নিস্তব্ধ। পাম গাছগুলোর ধার ঘেঁসে যেতে যেতে বাঁ-দিকে 'বেগম-বাহার' লতায় আচ্ছাদিত তোরণ থেকে লাফিয়ে একটা পাতা ছিঁড়ে নিলো ঝন্টু এবং পাতাটা কুচিকুচি করতে করতে আবার এগোতে লাগলো।

বিমল ওর দুঃখের কথা বলছিলো। যে কাহিনীর মধ্যে ঘটনাসাম্য না থাকলেও নিজের পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে একটি চরিত্রসাম্য খুঁজে পাচ্ছিলো ঝন্টু। এই ভেবে অবাক হচ্ছিলো যে, যে-কোনো সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকাই এযুগের ব্যক্তির ধর্ম। সমস্যা আমাদের সকলেরই আছে। রকম হয়তো আলাদা, মাত্রার দিক থেকে হয়তো কোনোটা কম, কোনোটা বেশি, সমাধানের পদ্ধতিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক নয়। তবু যেযুগে জন্মেছি এবং যে সামাজিক অবস্থার মধ্যে বাস করছি তাতে সমস্যাকে এড়িয়ে চলার মতো কোনো উপায় নেই। সহোদর-অগ্রজ ব'লে পরিচয়, দাদা ব'লে ডাকতে হ'তো যাকে—সেই ভদ্রলোক চাননি বিমল এম-এ পড়ুক। তবু যখন জোর ক'রে পড়তে এলো, একদিন সামান্য ছুতোয় স্বার্থ-পরের মতো বৌ-মেয়ে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মাইনে সংগ্রহ করতে যাকে সারা মাস ভাবতে হয়, সেই ছেলেটির উপর পড়লো একটা সংসারের ভার। অশীতিপর বৃদ্ধ বাপ্, একটি ছোটো বোন, কলেজে পড়ে। সকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রে সারাক্ষণ ট্যুশানি, শোভাবাজার-মানিকতলা-পার্কসার্কাস, এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাশ—পরিশ্রমে-পরিশ্রমে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

বিমল গল্প লেখে এবং কয়েকটি নামজাদা পত্র-পত্রিকায় সেগুলো ছাপাও হয়। ঝন্টু অবশ্য সেসব গল্প প'ড়ে খুব যে তারিফ করেছে তা নয়, বড়োরকমের কোনো প্রতিভাবানের দুর্লভ বন্ধুত্ব পেয়েছে ব'লেও মনে করেনি কোনোদিন। খুব সাধারণ এবং সকলের

মতোই একজন ভেবে বিমলকে একটি কারণে মনে মনে শ্রদ্ধা করেছে। বিমল লড়তে জানে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা সোজা রেখে, ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পারে। এতো কষ্ট, এতো ভাবনা-চিন্তা তবু এম-এ পড়বার আশা ছাড়েনি, যেমনই লিখুক তবু সাহিত্য করে, দু'চারটে দেশী-বিদেশী বই পড়ে, রাজনৈতিক সচেতনতাও অটুট, এবং ভবিষ্যতে আস্থাবান। ছ'মাসের মাইনে বাকি। খাতা থেকে নাম কাটা গেছে। পার্সেণ্টেজ যাচ্ছে। চিন্তিত এবং বিচলিত হয়ে বিমল টাকা খুঁজছিলো। নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিঃশেষ ক'রে যে ক-টা টাকা সংগ্রহ করতে পারলো, প্রয়োজনের অঙ্কের তুলনায় তা সামান্য। খুবই সামান্য। তখনই বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করতে নিজের ট্যুশানির আয় থেকে কিছু টাকা দিতে হলো ঋণ্টুকে। পরিশোধের আশা রইলো, কেননা ঋণ্টু বন্ধুর সততায় বিশ্বাসী। কিন্তু সে আশা যে সুদূর ভবিষ্যতের, ও সে সম্বন্ধেও সচেতন।

কাতারে কাতারে ছেলের ভিড়ে একটা টেবিলের দুটো চেয়ার কেড়ে নিয়ে দুজন বসলো। চা খেতে খেতে নিতান্ত অপ্রয়োজনেই বিমল বললো—'তুই আমার সত্যি একটা উপকার করলি প্রসূন। দেখি যদি আসছে মাসে---'

'উপকার!' ঋণ্টু কথা টেনে নিলো এবং নিজের উক্তিটি যে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বিমল তা অনুভব করলো বন্ধুর উত্তর দেবার ভঙ্গি দেখে—'কে তোর উপকার করেছে? পঁচিশটা টাকা? আরে ধ্যেৎ, তোর দরকারের তুলনায় ওর কতটুকু দাম? আমার কে উপকার করে তার নেই ঠিক, আমি করবো তোর উপকার। এ ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরি আছে বুঝলি? আমরা কেউ কারও উপকার করি না, করতে পারি না। অবশ্য সাধারণভাবে উপকার বলতে তোরা যা বুঝিস্। তবে ভুল ক'রেও কারও কোনো অপকার না করাই মানুষের প্রতি মানুষের সবচেয়ে বড়ো

উপকার। তোকে টাকা দিয়ে উপকার করেছি কিনা জানি না, কোনো অপকার বোধহয় করিনি। কি বলিস্? ব্যস্, তা হলেই আমি খুশি। এই যাঃ, খুব বড়ো-বড়ো কথা ব'লে ফেলছি না? এই আরেক বদ-অভ্যাস হয়ে গেছে। সুযোগ পেলেই বক্তৃতা আর জ্ঞানদান—'

'নে, নে, চা খা—একটা সিগারেট আন তো—'

বিমলের মুখোমুখি বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। পরিমিত হাসি, এমন কি কথায় কথায় শালা বলতে পর্যন্ত ঠোঁট কাপে—এরকম নরম-নরম ভেজা-ভেজা ছেলেদের ভালো লাগে, ভালোবাসা যায় কিন্তু ওদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া অসম্ভব। ঝণ্টু বিরক্ত বোধ করলো। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে এবং সিগারেটটা ধরিয়েই তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলো। মফস্বলের একটি কলেজ থেকে কয়েকটি ছেলে আসবে ওদের ইউনিয়ানের ব্যাপারে কথা বলতে। ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই একটা ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাতে হচ্ছে এতক্ষণ। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝণ্টু এলো ইউনিয়ন অফিসে।

অফিস ঘরটা মোটামুটি ফাঁকাই ছিলো। কী একটা টাইপ করছিলো গৌরাঙ্গ। কোণের বেঞ্চিতে বসে গা এলিয়ে পরামর্শ করছিলো অতুল আর বৃন্দাবন। বড়ো টেবিলের উপর বড়ো বড়ো নিউজপ্রিণ্ট কাগজ ছড়িয়ে লাল-কালো সবুজ রঙে পোস্টার লেখায় ব্যস্ত রঞ্জিত, শোভনা আর শান্তা।

সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই চড়াগলায় কৃত্রিম অনুযোগ জানালো ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট অতুল ঘোষাল—'এই যে প্রসূন, জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছো আর এই বুঝি দায়িত্বজ্ঞান।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'বৃন্দাবন কখন থেকে এসে ব'সে আছে। ওকে আসতে বলেছিলে।'

কলকাতারই অন্য একটি কলেজের ইউনিয়নের সেক্রেটারি বৃন্দাবন।

অতুলের কথায় একটু ব্যস্ত হয়ে ঝণ্টু হেসে বললো— 'তোমাকে আসতে বলেছিলাম না বৃন্দাবন, না ভাই, ভুলে যাইনি। কতক্ষণ এসেছো ?'

'বেশিক্ষণ না—বৃন্দাবন হাসলো—'সিটি এস্-এফ্-এর কন্ফারেন্স নিয়ে কথা বলার জন্যে আমাদের একটু বসা দরকার প্রসূনদা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। তুমি একটু বোসো—'ঝণ্টু অতুলের দিকে তাকালো—'ওরা এসেছিলো ? নৈহাটি থেকে যাদের আসার কথা ছিলো ?'

'না। আসবে এক্ষুনি।' অতুল ওর স্বভাবসুলভ হাসি নিয়ে ঝণ্টুর দিকে তাকালো।

'এবার আমাদের বর্ষা-মঙ্গল উৎসব হবে না প্রসূনদা ?' ওদিকে লিখছিলো শোভনা। বললো।

'হবে, আলবৎ হবে। ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে, জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে—'উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতেই আলমারির ডালা খুললো ঝণ্টু। আলমারি থেকে দু'টো ফাইল থেকে কয়েকটি কাগজ তুলে নিয়ে চেয়ার টেনে বসলো। কয়েকটা টুকিটাকি কাজ আছে, সারতে হবে। কাজ করতে করতে হঠাৎ বললো—'একবার ভি, সি'র সঙ্গে দেখা করা দরকার অতুল। চলো আজ বিকেলে একবার যাই।'

ইতিমধ্যে ছুটোর ঘণ্টা পড়লো বাইরে। শাস্তা বই-খাতা হাতে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো—'একটু শোনো।'

'একি চলে যাচ্ছো ?'

'বাঃ ক্লাশ করতে হবে না ? স্পেশাল পেপার। তোমার মতো উড়নচণ্ডী হয়ে ঘুরলেই চলবে ?'

ঝণ্টু শাস্তার সঙ্গে বাইরে এলো একটু। অলক্ষ্যে ওরা স্থির ক'রে নিলো ক্লাশের পর কোথায় দেখা হবে। কে কার জন্যে অপেক্ষা করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের ফটকে এবং রাস্তার ধারে পোস্টার আঁটছিলো ঝন্টু। সঙ্গে আরও কয়েকটি ছেলে, অদূরে শান্তা। পোস্টারগুলোর কাজ শেষ হলেই দুজনে একসঙ্গে হাঁটবে কিছুক্ষণ। তারপর যে যার পথে বাসে উঠবে।

খবরের কাগজের উপর রক্তের রঙে লেখা কয়েকটি অক্ষর। বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা। দেয়ালে আঁটতে গিয়ে অক্ষরগুলো চিনতে পারলো ঝন্টু—শান্তার হাতে আঁকা—'খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি করা চলবে না।'

হঠাৎ কাঁধে একটা হাত পড়তেই চমকে ফিরে তাকালো ঝন্টু, কাঁধের দিকে হেলে-পড়া কাগজটা আর পরিপাটি ক'রে এঁটে দেওয়া হলো না। সেটা করলো পলিটিক্সের অতীন।

'অমিতদা আপনি?'

একগাল দাড়ির ফাঁকে অমিত হাসলো—'কি করছো?'

'এই তো, এগুলো লাগাচ্ছি—'ঝন্টু একপলক তাকালো দেয়ালের দিকে। তারপর হেসে বললো— 'সে থাকগে, উঃ—কতোদিন পরে দেখা। কোথায় আছেন এখন?'

'এই তো কাছেই। জুপিটার লজ।'

'বাঃ সে তো খুব কাছে। যাবো আপনার কাছে।'

'স্বচ্ছন্দে—না, না যেয়ো না। বোধহয় আর থাকবো না সেখানে।'

আকস্মিক সাক্ষাতে উচ্ছ্বাসের প্রথম ঝোঁকটা সামলাতে এক নাগাড়ে কিছু কথা বিনিময় হলো। তারপর লক্ষ্য করলো অমিতকে। অপরিচ্ছন্ন বেশভূষায় ঋজু অথচ শীর্ণ দেহ। বড়ো বড়ো চোখদুটোয় সেই আগুন এখনও আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকবার অবসরে একের পর এক কতগুলো শোনা-কথা এবং নানা ঘটনা দ্রুতগতিতে নাড়া দিয়ে গেলো মগজের ভিতর।

'কি দেখছো—'অমিত ঝন্টুর কাঁধে হাত রাখলো—'মুখ দেখে চিনতে ভুল করোনি। মানুষটাকে চিনতে পারছো না। না?'

'সত্যি কি বিশ্রীরকম রোগা হয়ে গেছেন অমিতদা।'

'তাহলে কোনোদিন স্বাস্থ্যবান ছিলাম বলছো—সম্মান দিলে।'

দুজনেই হাসলো। অমিত বললো—'তুমিও তো কী ভীষণ বড়ো হয়ে গেছো। এই সেদিনও তো ছেলেমানুষ দেখেছিলাম তোমাকে। কী নিয়ে পড়ছো? বাংলা?'

'তাছাড়া আর উপায় কি?'

'ওসব কি হচ্ছে?

'কোন সব?' ঝণ্টু দেয়ালের দিকে তাকালো -'এগুলো? পোস্টার। ষোলো তারিখে খাদ্যের দাবিতে মিছিল বেরোবে তারই প্রস্তুতি।'

'তাতে তোমাদের কি? ছাত্রদের?'

ঝণ্টু বিস্মিত হলো। এমন ভরাট বিহ্বলতায় তাকালো যেন বহু শোনা-কথার মতোই কোনো একটা গর্হিত কাজ এইমাত্র সকলের সামনে ক'রে বসেছে অমিত। তবু সহজ হবার ভঙ্গিতে সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিলো—'কেন, ছাত্ররা কি খায় না?'

'খায়, কিন্তু পড়েও। পড়াশুনাটা ভালো ক'রে করা দরকার ঝণ্টু।'

'শুধু শহরের মানুষ ছাড়া আর কোথাও যেখানে শিক্ষিত মানুষ নেই, আর শহরের মানুষও যেখানে সবাই শিক্ষিত নয়, সেদেশে ছাত্রদের রাজনৈতিক অধিকার মেনে না নিলে সে অধিকারটা কাদের জন্যে থাকে অমিতদা? আধুনিকতার আয়ু তো পনেরো বছরও নয় আমাদের দেশে। পঁয়ত্রিশ পেরোলেই রক্ষণশীলদের খাতায় নাম লেখায় আমাদের পণ্ডিত লোকেরা। যেকদিন যুবক আছি সে কদিনই মুখ বুজে থাকি কেন। আপনি ছিলেন?'

'কিন্তু ওসব আন্দোলন ক'রে, পোস্টার সেটেও যে খুব বেশি কিছু হয় না সেটা বুঝেছি। সেসব বোঝার জন্যে তোমাদেরও আর একটু বয়স্ক হতে হবে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে ঝণ্টু।'

'অমিতদা?'

'না, আজ থাক। আমার সময় নেই। যেতে হবে অনেক দূর। এসো একদিন, কথা হবে।'

'আপনি এসব কথা বললেন?'

ঝণ্টুর কাঁধে দু-একটা মৃদু চাপড় দিয়ে অমিত হাসলো—'আচ্ছা চলি।' অমিত চ'লে গেলো এবং সেদিকে তাকিয়ে রইলো ঝণ্টু। দুপুরের কলেজ স্ট্রীটে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যেতে বেশিক্ষণ সময় নিলো না অমিত।

ঝণ্টু হঠাৎ যেন কেমন একটু বিষন্নতা বোধ করলো। অন্তত সাময়িক ভাবেও উদ্যমহীন। বাকি পোস্টারগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এপাশে-ওপাশে দেয়ালে এঁটে আর সব ছেলেরা কোথায় চ'লে গেছে। বোধহয়, আবার ইউনিয়ন অফিসে। কিছুক্ষণ শান্তার সঙ্গে কথা বলছিলো মৃন্ময় আর সুভাষ। অমিতের সঙ্গে কথা বলার সময়ই লক্ষ্য করেছিলো ঝণ্টু। ওরা চলে যাবার পর শান্তা উশখুশ করছিলো সেটাও দৃষ্টি এড়ায়নি। এবার শান্তা নিজেই এগিয়ে এলো—'কে ভদ্রলোক? রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ বক্‌বক্ করছিলো।'

'দাদার বন্ধু।'

'দাদার বন্ধু তো এরকম কেন? খুব কাজের লোক বুঝি? চুল-দাড়ি কামাবার সময় হয় না। তেল না দিয়ে তো চুলে জট পাকিয়ে ফেললেন। লণ্ড্রি, জামা-কাপড় নষ্ট করে ব'লে, জামা-কাপড়টা ঘরেও কাচতে পারেন না।'

ঝণ্টু এমন ভঙ্গিতে তাকালো যার স্পষ্ট অর্থ—নিঃশব্দ শাসন। পকেট হাতড়ে দুম্‌ড়োনো-মচ্‌কানো একটা সিগারেট বের ক'রে পরম স্নেহে আঙুল বুলোতে-বুলোতে বল্‌লো—'যার সম্বন্ধে কিছু জানো না, না জেনে-শুনে অনর্থক তার সম্বন্ধে বাজে বোকো না। চলো—' হাঁটতে-হাঁটতে কিছুটা এগিয়ে এসে একটা দোকানের পাশে দেয়ালে ঝোলানো দড়ির আগুনে সিগারেট ধরালো ঝণ্টু। আবার পা

বাড়িয়ে বান্ধবীর দিকে তাকালো—'জানো শান্তা, এই ভদ্রলোক কে?
'তোমার দাদার বন্ধু।'
'না, তার চেয়েও বেশি। আমারও বন্ধু—'কলুটোলার রাস্তা পেরোতে গিয়ে একটা বাসকে আগে যেতে দিতে হলো। এপারে এসে ঝণ্টু বললো— আমি যখন স্কুলে পড়ি, অমিতদা তখন থেকে সেজদার বন্ধু। আমাদের বাড়ি যেতেন। মা ভীষণ ভালোবাসতেন। আমাকে নিয়ে কতো গল্প করতেন। মুখে মুখে আমাকে শেক্সপিয়রের নাটকের গল্প শোনাতেন। সে' সঙ্গে আরও কতো কি। তারপর যখন আরও বড়ো হলাম, স্কুল ফাইনাল দিয়ে সবে কলেজে ঢুকলাম তখন একের পর এক বই এনে দিতে লাগলেন, মুখে বোঝাতে লাগলেন। তাঁর কাছেই আমার রাজনীতির প্রথম পাঠ। শুধু থিয়োরি নয়, কাজেও। জানো, ভদ্রলোক কবার জেল খেটেছেন। একবার তো পুলিশের লাঠিতে মরেই গিয়েছিলেন প্রায়।'
বিপরীত পথের এক ভদ্রলোকের শরীর থেকে ছোঁয়া বাঁচাতে একটু বেঁকে গিয়ে আবার সোজা হয়ে চলতে-চলতে শান্তা প্রশ্ন করলো—'এখন কি করেন?'
'এখন!' কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে গিয়ে ঝণ্টু একটু বিব্রত বোধ করলো। সিগারেটে একটা টান দিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললো—'বোধ হয় মাস্টারি। অনেক আগে বৌদির কাছে, ওরকমই তো শুনেছিলাম।'
'সে কি, এককালে যিনি তোমার গুরুজন ছিলেন তার সম্বন্ধে এখন তো কোনো খোঁজই রাখো না মনে হচ্ছে।'
'কি করবো, বৌদিকে জিজ্ঞেস করলে বৌদি অন্য কথা পাড়েন। আমিও অনর্থক আর চাপ দিই না।'
'নিজে যাও না আর? কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?
'কোথায় থাকেন, দু-তিন বছর পরে জিজ্ঞেস ক'রে আজ তার হদিশ

পেলাম—'আরও কিছু বলবে কিনা সে কথা ভাবতে গিয়ে ঝন্টু একটু ইতস্তত করলো এবং বললেও কিভাবে বলবে সেকথা ভাবলো—'মজা কি জানো, এককালে যে-অমিতদা আমার আদর্শ ছিলেন, ছুটে গিয়ে যখন-তখন দোকান থেকে সিগারেট কিনে এনে দিতে পারলে কৃতার্থ হতাম, এখন তার সম্বন্ধেই খুব কম জানি। যেটুকু জানি, সেটুকুও লোকের মুখে শুনে জেনেছি। অমিতদা এখন আলাদা মানুষ একেবারে আলাদা। মানুষ যে কি ভাবে বদলায়, আর কি অদ্ভুতভাবে একেবারে এপিঠ ওপিঠ হয়ে পাল্টে যেতে পারে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। আচ্ছা শান্তা, তুমি কখনও বিশ্বাস করবে, ভাবতে পারো—আমি, হ্যাঁ আমি, এই প্রসূন মুখার্জি এক সময় রাজনীতিকে ঘৃণা করবো, মিছিল-স্লোগান আন্দোলনকে পাগলের কাণ্ড ব'লে ঠাট্টা করবো।'

বলতে-বলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ঝন্টু। সিগারেটটা শেষ না হতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ঝন্টুর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু বিচলিত হলো শান্তা—'এই রাস্তার ওপর কি পাগলামি শুরু করলে আবার। লোকে দেখবে যে।'

ঝন্টু পরিবেশ লক্ষ্য ক'রে আবার হাঁটতে শুরু করলো—'ঠিক এমনি আমিও একদিন বিশ্বাস করতে পারিনি, এখনও কল্পনা করতে কষ্ট হয়—অমিতদা আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করবেন। আর এভাবে পেসিমিজমের বাতে ধরবে তাঁকে। এভাবে নষ্ট করবেন জীবনটা।'

'কী বললে, আত্মহত্যা—' শান্তা চমকে তাকালো—'এই ভদ্রলোক সুইসাইডের চেষ্টা করেছিলেন?'

ঝন্টু গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথাটা উপরে-নীচে দুবার নাড়লো—'হ্যাঁ'।

'কেন?'

'যদি ঈশ্বর মানো তবে তার কারণ জানেন দুজন। আর যদি নাস্তিক হও, তবে একজনই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন—তিনি অমিতদা নিজে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা কাটিয়ে, কয়েক পা এগিয়ে এসে শান্তা চোখ তুলে তাকালো—'কিন্তু তুমি এতো কথা বলো, কই এই ভদ্রলোকের কথা তো বলো নি কখনও।'

'ভয় হতো।'

'ভয়?'

'হ্যাঁ, তাঁর আর্ধেকটা আমি জানি আর বাকি আর্ধেকটা আমার কাছে একটা ধাঁধা।

বৌ-বাজারের মোড়ে এসে ওরা বাস-স্টপে দাঁড়ালো। শান্তা বললো—'দাঁড়ালে যে, চলো না ওয়েলিংটন পর্যন্ত হাঁটি।'

'না, তোমার সঙ্গে যাবো।'

'কোথায়? ভবানীপুর, বৌদির কাছে?'

'নইলে আর কোথায়।'

'ওই তোমার এক বৌদি। তোমার মুখে রোজ রোজ তাঁর কথা শুনে ইচ্ছে হচ্ছে আলাপ করি।'

'নিয়ে যাব তোমাকে। বৌদি বলেছেন।'

'সেদিন বাস থেকে আমাদের দেখেছিলেন। তারপর তোমাকে কিছু বলেন নি?'

'কি বলবেন?'

শান্তা ওর কৌতূহলী প্রশ্ন ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো। ঝণ্টুর অস্বাভাবিক গম্ভীর আর চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইলো—'বৌদি তোমাকে খুব ভালোবাসেন। না?'

ঝণ্টু শান্তার দিকে তাকালো। ওর কুমারী-সিঁথি আর ছোটো কপালটার উপর চোখ পড়লো। সেখান থেকে একরত্তি নাক আর পাতলা ঠোঁট, ছুটো গাল, তারপর চশমার মধ্যে দিয়ে চোখের মণিটা আবিষ্কার ক'রে ঝণ্টু বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। কিছু একটা বলার জন্য তৈরি হলো কিন্তু ভাবলো বলবে কিনা—কিন্তু ঝণ্টু তা বললো না। ওদিকে মস্ত একটা দোতালা বাস প্রায়

গা ঘেঁসে সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর দরজার দিকে এগোতে এগোতে নিচু গলায় উচ্চারণ করলো—'বৌদির সম্বন্ধে আমি বলবো না। আলাপের পর তুমিই বলবে।'

চোদ্দো

বুকের ভিতর একটা ঝড় তোলপাড় করে সারাদিন, সারারাত। অকারণেই যেন সুখী হতে পারছে না বলে মনে হয় তৃপ্তির। এই ছোটো ঘরে কল্যাণকে নিয়ে নিজের সংসারটা ইচ্ছেমতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েও যেন মনে হয়—এই সব নয়। শুধু এই নিয়ে আত্ম-প্রসাদ খুঁজতে চাইলে পুতুল-পুতুল লাগে নিজেকে। তখনই মনের উপর চাপ পড়ে। দুশ্চিন্তার ভার জমে। ক্লান্ত বোধ করে। সারাদিনের কাজের ভিড়ে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলে নিজেকে একা মনে হয়। তখন আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে শুধু। অন্ধকার ভালো লাগে।

কিন্তু কাজ থাকে। জোর ক'রে কুঁড়েমি কাটাতে হয়। গা-হাত ধুয়ে, শাড়ি বদলে পড়তে বসতে হয়। পড়ানোর জন্য পড়া। তৈরি হয়ে না গেলে মুশকিল। মেয়েরা প্রশ্ন করে ক্লাসে। তার চেয়েও বড়ো বিপদ সুমনাদির এভাবে চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া। আই-এ-এস্ স্বামী পেয়ে গেলেন হঠাৎ। মফস্বলের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। নতুন জায়গায় গেলেও কাজ খুঁজে পাওয়া এমন কঠিন নয় কিছু। সরকারি সার্কুলারের মতো কাজ করবে স্বামীর লেখা চিরকুট। কিন্তু এদিকে সব বোঝা পড়লো তৃপ্তির উপর। বি-এ ক্লাশে নতুন প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে। অনার্স ক্লাসে 'মহুয়া' পড়াতেন সুমনাদি, সেকেণ্ড ল্যাংগুয়েজ ক্লাসে 'বৈষ্ণব পদাবলী'। হেড-অব-দা-ডিপার্টমেণ্ট জ্যোৎস্নাদি রবীন্দ্রনাথ পড়ান। সে তার একচেটিয়া।

কিন্তু 'মহুয়া' পড়ানোতেই তার আপত্তি। খিটখিটে মেজাজের ওই স্থূলাঙ্গী মহিলাটিকে শুধু ছাত্রীরাই নয়, তৃপ্তিও ভয় করে। অসম্ভব কালো, অসম্ভব মোটা, বয়স পঞ্চাশ তো বটেই। অবিবাহিতা। সহকর্মিণী ইন্দিরা বলছিলো কাল—প্রচণ্ড একটা হাহাকার বুকে চেপে রয়েছেন জ্যোৎস্নাদি। মহুয়া পড়াতে পারবেন না তিনি। মেয়েদের কাছে ধরা পড়াব ভয়। কি ক'রে বলবেন—'যাবো না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী, আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিণী।' একথা বলতে গলা কাঁপবে তাঁ'র। কোন্ দাবিতে বলবেন, কোন অহঙ্কারে—'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।' তাই সেকথা বলতে হবে তৃপ্তিকে। সগর্বে আবৃত্তি ক'রে ছাত্রীদের শোনাতে হবে, বোঝাতে হবে।

কলেজ-লাইব্রেরি থেকে আনা কিছু বই নিয়ে বসলো তৃপ্তি। বই খুলে মনে হলো—একা একা হবে না। এজন্য কল্যাণকে চাই। এককালেব সমবয়সী ছাত্রবন্ধু হলেও ওরা অনেক বেশি বোঝে। এক ডজন বই পড়ার চেয়ে ওদেব মুখের কথা শুনলে অনেক বেশি কাজ হয়।

কিন্তু কল্যাণ ঘরে নেই। নাইট-ডিউটি। জীবিকা ওর সহবাস কেড়েছে। এই ঘরে, এই উত্তপ্ত শয্যার পাশে ব'সে রাতদুপুরে পদাবলীব প্রেমলীলা নিয়ে আলোচনা করা পরিহাস। বিশেষ ক'রে কল্যাণের সঙ্গে। কল্যাণ ওর ছাত্র নয়—ওর পুরুষ। সেদিনের রাতটাকে মনে পড়লো। বিয়ের পর প্রথম যেরাতে শরীরের স্বাদ পেয়েছিল ওরা সে-রাতের পরে আরও অনেক রাতের অভিজ্ঞতায় সেসুখ পেয়েছে। শাড়ির পাকে পাকে জড়ানো এই শরীরটা মিথ্যে নয়, অভিজ্ঞতা মিথ্যে নয়। তৃপ্তি ওর দেহের আর রক্তের ধমনীতে উষ্ণতা অনুভব করলো। পদাবলীর পাতায় দৃষ্টি মেললো। মন দিতে চেষ্টা করলো পড়ায়। গুটি গুটি অক্ষরের এই কাব্য, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস,গোবিন্দদাস,

শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত-ভগবান, স্বরূপ থেকে শ্রীরূপে রূপান্তর, রাগাত্মিকা ভক্তি—এসব সত্য। কিছুই মিথ্যে নয়। কাল দুপুরে অন্তত একথাই পরম বিশ্বাসে বলতে হবে ক্লাশে।

'বৌদি—'

'কে…'চমকে ফিরে তাকালো তৃপ্তি—'ঝণ্টু! ভেতরে এসো।'

'কি করছো?'—নিজেই টেবিলের দিকে এগিয়ে এলো ঝণ্টু। খোলা বইয়ের উপর একটু ঝুঁকে প'ড়ে দেখে নিয়েই নাক সিঁটকে উঠে দাঁড়ালো—'উঃ,……

'কী হলো—'তৃপ্তি অবাক হয়ে তাকালো—'নাক কোঁচকাচ্ছ কেনো?'

'কী পড়ছো তুমি।'

'আর বলো কেন, আমাদের এক লেকচারার হঠাৎ চাকরি ছেড়ে চ'লে গেছেন। এখন আমার উপর ভার পড়েছে এসব পড়াবার। বৈষ্ণব-পদাবলী, মহুয়া। এই একটু দেখে নিচ্ছি। কালই ক্লাশ আছে। কিন্তু তোমার অতো ঘেন্না কিসের?'

'ঘৃণা? বলো কি বৌদি'—ঝণ্টু হাসতে-হাসতে টেবিলের কোণে অপরিসর স্থানটুকুতে লাফিয়ে উঠলো। মুখোমুখি তাকিয়ে হেসে বললো—'বৈষ্ণব পদাবলী, বিশেষ ক'রে জ্ঞানদাস আমার প্রিয় কবি আর মহুয়া? সে না হয় ছেড়েই দাও, রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সেরা কবিতার বই-এর মধ্যে আমি 'মহুয়া'র নাম করবো।'

'তবে?'

'তবে আবার কি। তাই ব'লে এসব বই পড়বো? এসব আবোল-তাবোল—ঝণ্টু অকাতরে একজন প্রখ্যাত অধ্যাপকের লেখা বৈষ্ণব-কাব্যের সমালোচনাগ্রন্থ অবহেলায় সরিয়ে দিলো—'কাব্য পড়ি, কারণ ভালো লাগে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা? নৈব নৈব চ—আমি জ্ঞানদাস পড়ি, বিদ্যাপতি পড়ি, আমি আমার নিজের মতো ক'রে একটা অর্থ খুঁজে পাই, তাই পড়ি। ওদের ব্যাখ্যা আমি মানি না, বুঝিও না ছাই। আর জানো বৌদি, এরা যে

সত্যি ভালো কবি তার প্রমাণ এতোকাল পরেও তাদেব কবিতার মধ্যে আমি আমার নিজের কথাটা খুঁজে পাই প'ড়ে আনন্দ পাই।'

'তোমার সে নতুন ব্যাখ্যাটা কি?'

'বলবো না।'

'কেন?'

'তোমরা, মানে অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা চমকে উঠবে শুনলে।'

'বলো না শুনি – তৃপ্তি পরিহাসে হাসলো।

'সত্যি বলবো?'

তৃপ্তি ঘাড় নাড়লো—'বলো।'

'বৈষ্ণব-পদাবলীকে তোমবা যতোই পূজো-আর্চা ক'বে মাথায় ঠেকাও আর প্রণাম করো বৌদি, আমার কাছে কিন্তু ওটা নিছক প্রেমের কবিতা। মধুর নয়—একেবারে আদি রস। শ্রীকৃষ্ণ নামক জনৈক ভদ্রলোক আর—'

'থাক, থাক হয়েছে—' তৃপ্তি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো—'তোমার ওই নতুন তত্ত্বকথা শুনলে আমাকে আর মাস্টারি করতে হবে না। মেয়েগুলোকে পাশ করাতে হবে তো।'

'না, না, তোমার আর দোষ কি। আমাকেও তো পরীক্ষার খাতায় ওসবই লিখতে হয়েছে বোধহয়, এম-এ-তেও লিখতে হবে। নইলে উপায় কি, আমাকেও তো ক'রে খেতে হবে—'তৃপ্তি চ'লে যাচ্ছিলো। ঝন্টু শাড়ির আঁচল টেনে থামালো—'জানো বৌদি, কম তো নয়, জীবনে প্রায় ডজন কয়েক অধ্যাপকের কাছে তো পড়েছি, তা থেকেই অধ্যাপক হবার স্বপ্নটা মাথা থেকে উবে গেছে।'

'কেন?'

'তোমাদের মিথ্যাচার।'

'মিথ্যাচার?' তৃপ্তি ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

'নয় তো কি, চারশো বছর আগের পুরোনো কতগুলো তত্ত্বকথা তোতাপাখির মতো ক্লাশে-ক্লাশে আউড়ে কী লাভ? পাঁচশো বছর

আগে মানুষ যখন ধর্ম-ধর্ম ক'রে পাগল হতো তখন তাদের কাছে প্রেমের অন্য একটা অর্থ ছিলো। আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই ব্যাখ্যা মেনে নেবো নাকি? বলো সাহিত্যের ইতিহাস পড়াচ্ছো, আপত্তি করবো না কিন্তু তাই ব'লে এগুলো আমাদের বিশ্বাস করতে, মেনে নিতে বাধ্য করো কেন। আমি ভেবে পাই না বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণই কি একমাত্র আরাধ্য দেবতা? কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ধর্মের ইতিহাসে অনুপস্থিত কেন? তাঁর পূজো নেই। আর যদি বৃন্দাবনের কৃষ্ণেব কথাই বলো, এযুগে আমাদের অনেক যন্ত্রণা বৌদি। পুরোনো ধর্মরীতি এ যন্ত্রণার মলম হ'তে পারছে না। আমাদের সব কিছু—এমন কি, প্রেম বলো, ভালোবাসা বলো, তারও যে কি অসহ্য যন্ত্রণা সে রাধাব মতো মিষ্টি যন্ত্রণা নয়। পুরোনো ভাবনা-চিন্তা দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে চাইলে তা দ্বিগুণ হয়ে বাড়ে। শুধু বাড়ে।'

'ঝণ্টু, চা খাবে?'

'অ্যাঁ—'

'চা—তুমি খেলে আমিও এক কাপ খেতে পারি।'

মোটামুটি একটা বক্তৃতা শুরু ক'বে দিয়েছিলো ঝণ্টু এবং বেশ জমিয়েও ফেলেছিলো। বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো প্রতিক্রিয়া শুভ নয়। টেবিল থেকে নেমে মাথার চুলে তু'হাতের আঙুল ডুবিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হাই-তোলার সুরে ভেঙে ভেঙে বললো—'দাও না, সে তো খুব ভালো প্রস্তাব।'

'তাহলে তুমি একটু বোস ভাই, নিধুর-মা রান্না-বান্না সেরে নীচে গেছে। আমি নিজেই স্টোভ জ্বেলে তু'কাপ ক'রে আনছি। এই মিনিট-পনেরো।'

'যাও না, আমি বসছি।'

ঝণ্টুর উপর মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হলো তৃপ্তি। রান্না ঘরে এসে স্টোভ, স্পিরিটের বোতল আর দেশলাই নিয়ে ব'সে একটু রেহাই

পেলো।' পোকার দিয়ে স্টোভের অদৃশ্য ফুটোটা খোঁচাতে-খোঁচাতে তৃপ্তি ভাবলো। নেহাতই হালকা মেজাজে, ঠাট্টার সুরে কথা শুরু করে ঝণ্টু। বলতে-বলতে এক সময় অনেক ব'লে ফেলে, থামতে ভুলে যায়, গম্ভীর হয়ে ওঠে, গভীরে ডোবে। এ'কি বললো ঝণ্টু! শেষ কথাগুলো! তৃপ্তি আবার কথাগুলো মনে করতে চেষ্টা করলো। একি ওর অভিজ্ঞতার, উপলব্ধির কথা? এরই মধ্যে কী এমন ঘটতে পারে যার জন্য এভাবে কথা বলতে পারে ছেলেটা? ঝণ্টু অমিতের মতো, কল্যাণের মতো। অসংখ্য বই প'ড়ে আরাম পায়, 'জীবন নিয়ে ভাবে। বয়স ছাপিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করতে শেখে। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ব-অহঙ্কার সব নিয়েও সেখানে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয় তৃপ্তির। এমনকি ঝণ্টুর কাছেও। ঝণ্টু আমাকে সাহস দিতে পারে, সাহায্য করতে পারে। যদি সব খুলে বলি ওর কাছে। স্পিরিটে আগুন ছোঁয়ালো তৃপ্তি। দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেই স্টোভের মাথায় আগুনটা শান্ত-সংযত হলো। পরিমিত জল নিয়ে কেটলিটা চাপিয়ে তৃপ্তি ভাবলো—কিন্তু ছোটো ভাই। স্নেহভাজন। ওর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে গিয়ে এক সময় থামতে হবেই।

ঘরে ঢুকে চায়ের কাপটা ঝণ্টুর হাতে তুলে দিতে-দিতে তৃপ্তি প্রশ্ন করলো—'কটা বাজে ঝণ্টু?'

'হবে—সাড়ে সাতটা-আটটা। কোথায় রেখেছো ঘড়ি। দ্যাখো না—'

'তোমার হাতে ঘড়ি নেই?'

'না।'

'থাকা উচিত। এম-এ পড়ছো।'

'উচিত তো অনেক কিছুই—' 'ঝণ্টু হাসলো—'কোথায় পাবো ঘড়ি? ট্যুশানি ক'রে রেস্তোরাঁয় দু'এক কাপ চা খাওয়া যায় মাত্র: এর বেশি কিছু নয়।'

'তুমি টিউশানি ছেড়ে দাও ঝণ্টু।'

'তারপর।'

'টিউশানি করলে পড়াশুনার ক্ষতি হয়। তোমাকে ফার্স্ট-ক্লাসের চেষ্টা করতে হবে। ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু চলবে কি ক'রে?'

তৃপ্তি নিজের চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রাখলো। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো ঝন্টুর কাছে—'আমি চালাবো। তোমাকে সুন্দর একটা ঘড়ি উপহার দেবো। খোঁজ নিয়ো তো কতো দাম হতে পারে। আর মাসে মাসে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নেবে। লজ্জা কোরো না ভাই। তোমার হাত-খরচ।'

'কি বলছো বৌদি? তুমি—'

'হ্যাঁ আমি—' তৃপ্তি আদর ক'রে দেবরের কপালের প্রান্তে মাথার চুলের উপর হাত বুলিয়ে নিলো—'তোমার দাদা, আমি দুজনেই চাকরি করি। শুধু দু'জনের জন্যে হলে আমরা অনেক রোজগার করি। অ-নে-ক টাকা। কিন্তু—'

ঝন্টু একটা চুমুক দিলো কাপে। তৃপ্তি ঘন নিশ্বাস টেনে নিলো—'কিন্তু আমরা তা চাইনি। আজও চাই না। কারও জন্যে তো কিছু করার উপায় নেই আমাদের। শুধু তুমি ছাড়া—'

'আমার দরকার হ'লে আমি চেয়ে নেবো বৌদি। তুমি তো জানো তোমার কাছে চাইতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই।'

'কিন্তু কোনোদিনই তো চাওনি।'

'বোধহয় দরকার পড়েনি। তুমি জানো, ট্যুশানি ক'রে আমি কতো পাই। এর বেশি আমার দরকার হয় না।'

'কিন্তু টিউশানি ছাড়লে তো সবটাই দরকার হবে ভাই—'তৃপ্তি নিজের কাপটা আবার হাতে তুলে নিতে নিতে বললো—'ছিঃ লজ্জা কোরো না। আমি বলছি, আমার কথা রাখো। বড়ো বেশি স্বার্থপরের মতো আমরা বাঁচছি। এ' আমার অসহ্য লাগে। শুধু আমি, আমার ঘর, আমার সংসার—এতো বেশি 'আমার-আমার' করলে সুখে থাকা

যায় না।' আমি দিতে চাই, কেউ নেবার নেই, আমি ভালোবাসতে চাই কিন্তু ভালোবাসার মানুষ নেই—এর চেয়ে বড়ো দুঃখ আর কী হতে পারে। ঝণ্টু, আমাব অনুরোধ রাখবে না?'

অনুনয়ের সুরে বলা তৃপ্তির কণ্ঠস্বর যেমন কান্নার মতো করুণ হয়ে এলো, তেমনি একটা গভীর আকৃতি নিয়ে বৌদির দিকে তাকালো ঝণ্টু। ভালোবাসার কথা যেখানে গভীর হয় মানুষ সেখানে স্তব্দ। বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গিয়েই ঝণ্টু বুঝতে পারলো। কিন্তু কী বলবে ভেবে না পেয়ে তাকিয়ে রইলো এবং তাকিয়ে থাকতে-থাকতে এক সময় মনে হলো কিছু বলা দরকার—তোমার আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তাতে টাকার কোনো ভূমিকা নেই বৌদি। টাকার সম্পর্ক ছাড়াও যে মানুষে-মানুষে কতো গভীর আন্তরিকতা থাকতে পারে তার অন্তত একটা প্রমাণ থাক।'

'ব্যাপারটা এত গোলমেলে করছো কেন ঝণ্টু। এতো খুব সামান্য একটা ব্যাপার।'

ঝণ্টু অল্প একটু হেসে বৌদির হাতের চুড়িটা অনমনস্ক ভঙ্গিতে নাড়তে-নাড়তে বললো—'তোমার কথা না রেখে তো উপায় নেই আমার। সব আদেশ শিরোধার্য।'

'বাঃ, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা—'তৃপ্তি উচ্ছ্বসিত হলো। অনেক্ষণ পরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে পেরে খুশি হয়ে বললো—'এবার অন্য কথা বলো।'

'কী কথা?'

'যা তোমার খুশি।'

'ও হ্যাঁ, তোমাকে তো বলাই হয়নি একটা কথা! সুসংবাদ—' ঝণ্টুও চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বৌদির দিকে তাকালো—'আজ বিকেলে য়ুনিভার্সিটির গায়ে রাস্তার ওপর পোস্টার আঁটছিলাম। হঠাৎ অমিতদার সঙ্গে দেখা—'

'কে ?' আবার হাতের কাপটা টেবিলের উপর রেখে ভ্রূ-কুঁচকে তাকালো তৃপ্তি।

'অমিতদা। উঃ, কতোদিন পরে দেখা। বিশ্রী কেলেঙ্কারিটার পর তোমাদেরও যে কি হলো অমিতদার কথা উঠলেই মুখ ঘুরিয়ে নাও।'

কতোদিন দেখা হয়নি অমিতের সঙ্গে। তৃপ্তি মনে মনে হিসেব কষলো। অনেকদিন। কিন্তু একি হলো! কেন অন্য কথা পাড়তে বললাম ঝণ্টুকে। ভাবতেই পারিনি, এ প্রসঙ্গ উঠবে বা উঠতে পারে। এ আকস্মিক ধাক্কাটা সামলাতে গিয়ে ঠোঁটে দাঁত ঘষতে-ঘষতে বারদুয়েক কণ্ঠনালীর ওঠা-নামা অনুভব করলো তৃপ্তি। তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ধরা-গলায় বললো—'কিরকম দেখলে।'

'সত্যি বৌদি, কী মানুষ কী হয়ে গেছেন। না দেখলে বিশ্বাসই হতো না—'শান্তার কথাগুলো মনে পড়লো ঝণ্টুর। কিন্তু ঠিক সেই কথাগুলো বলা সমীচীন হবে কিনা ভেবে, কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলো— 'আমি চিনি ব'লে। নইলে আমার সঙ্গে যেসব বন্ধুরা ছিলো ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায়নি এমানুষটার এরকম একটা দুর্ধর্ষ জীবন ছিলো। সেটা আমাকে ব'লে বোঝাতে হয়েছে। কী ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে স্বাস্থ্যটা। বেঁচে আছেন কী ক'রে? তার ওপর চুলে তেল নেই, নোংরা একটা পায়জামা-পাঞ্জাবি, মুখে একগাল দাড়ি—'

চুপ ক'রে শুনছিলো তৃপ্তি। হঠাৎ বাধা দিলো—'দাড়ি? আবার দাড়ি হলো কবে থেকে? আমি তো জানি, আজকাল ও নিয়মিত শেভ্ করে। স্কুলের ছেলেরা নাকি ভয় পায়।'

'আমিতো দেখলাম দাড়ি। বোধহয় আবার রাখছেন। খেয়ালি মানুষ। কিছু কি ঠিক আছে—'

ঝণ্টু ঠাণ্ডা-হয়ে আসা চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললো

—'সে না হয় যাক, কিন্তু কিসব কথা বলেন আজকাল জানো। মরবার চেষ্টা করেছিলেন জানতাম। কিন্তু মানুষটা সে সত্যি ম'রে গেছেন জানতাম না।'

'তাতে আমরা কি করবো ভাই। কী করতে পারি।' একটা দীর্ঘশ্বাসে তৃপ্তির বুকটা দু'লে উঠলো।

'তোমরা কিছু করতে পারো না। অমিতদা শুধু তোমাদের বন্ধু। কিন্তু আমার কে জানো? ছেলেবেলায় যে ওই মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, বড়ো হয়ে অমিতদা হবো। সেই মানুষটাকে যে এখন করুণা করতে ইচ্ছে করে। সেটা কি কম দুঃখ?'

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একহাতে অন্য হাতের একমাত্র চুড়িটা নাড়ছিলো তৃপ্তি। স্থির হয়ে ঝণ্টুর কথাগুলো শুনছিলো। কিছু ভাবছিলো। হঠাৎ মাথা তুলে বললো—'আমার একটা কাজ করবে ভাই?'

'বলো।'

'একদিন যাবে অমিতের কাছে? একদিন নয়, মাঝে মাঝে গিয়ে খবর এনে দেবে আমাকে। ও কোথায় থাকে, কেমন থাকে।'

'কেন, আমি যাবো কেন? তুমি যাও না?'

'না।'

'সে কী, সেজদা?'

'জানি না।'

'বৌদি!' কুঞ্চিত ভ্রূ-নিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠলো ঝণ্টু—'বলছো কি তুমি? তোমরাও তাকে বয়কট করেছো। তোমরা না ওর বন্ধু? এ' তোমাদের অন্যায় বৌদি। সত্যি অন্যায়। বিছানায় শুয়ে না থাকলে কি মানুষ অসুস্থ হয় না? মানুষটা অসুস্থ। তার সব কিছু না জেনে না বুঝে তাকে অবহেলা করলে অবিচার করা হয়।'

'ও বিশ্বাস করে না, ও অসুস্থ।'

'কিন্তু সেটা তোমরা বোঝ। অসহায়, রুগ্ন একটা মানুষ—' বৌদির সঙ্গে নিজের অমন বয়সের কথা ভুলে গেলো ঝণ্টু। সোজাসুজি চোখ রেখে বললো—'একটু আগে তুমি আমাকে একটা ঘড়ি উপহার দিতে চেয়েছিলে। তুমি স্বার্থপরের মতো বাঁচতে চাও না, আমাকে আরও ঘনিষ্ঠ ক'রে পেতে চাও। সামাজিক হতে চাও। কিন্তু বৌদি, আমার প্রতি তোমার এই অনুরাগের মধ্যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কিন্তু অমিতদা তোমার আত্মীয় নন বন্ধু। সত্যিকারের বন্ধু আত্মীয়ের চেয়ে অনেক বেশি আপন। বন্ধুকে ভালোবাসা সেখানে কোনো মতেই অপরাধ নয়।'

'ঝণ্টু—' তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো তৃপ্তি। এবং নিজের কণ্ঠস্বরটা যখন এই ফাকা ঘরে নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো তখন ভয় পেলো। ঝণ্টু কি বুঝতে পেরেছে কিছু? চিৎকার ক'রে কি নিজের দুর্বলতাটা আরও বেশি স্পষ্ট ক'রে তুললাম ওর কাছে? তৃপ্তি দেবরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঝণ্টুর আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেটের প্যাকেটটা স্পষ্ট দেখতে পেলো। ঝণ্টু আমাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। সিগারেট খায় না আমার সামনে। কিন্তু ও কি জানে, আমি সব জানি, সব ধ'রে ফেলেছি। ঝণ্টু কি কিছু বুঝতে পেরেছে এমনি কোনো আভাষে। যা আমি নিজে জানি না। অথচ আমারই কোনো কথার ইঙ্গিতে কিংবা মুখের ভাবে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর কাছে।

'ঝণ্টু—' তৃপ্তির স্বর আবার নিচুতে নেমে এলো-'ওসব কথা এখন থাক।'

ঝণ্টু বললো—'থাক। অমিতদাকে আমি সমর্থন করি না বৌদি। ওভাবে তিলে-তিলে নিজেকে নষ্ট করার পেছনে যে কি যুক্তি থাকতে পারে, আমার ছোটো মাথায় তা ঢোকে না। কিন্তু

একঝালে তাঁকে বেশি ভালোবাসতাম ব'লেই আজকের এই অধঃপতনটা বেশি ক'রে লাগে।'

'এ কি, তুমি উঠছো না কি?'

চেয়ার ছেড়ে উঠবার ভঙ্গি করেছিলো ঝন্টু। এবার উঠলো—হ্যাঁ যাই।'

ঝন্টুকে বিদায় দিয়ে তৃপ্তি নিজেকে অসহায় বোধ করলো। ঝন্টু যাই বলুক, কথাগুলো যতোই পীড়ন করুক, তবু একজন মানুষের সঙ্গে কথা ব'লে সময় কাটাবার সুযোগ ছিলো। কিন্তু আবার নিঃসঙ্গতার মধ্যে এসে হাঁপিয়ে উঠলো তৃপ্তি।

তৃপ্তি আস্তে-আস্তে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। নীচের রাস্তায় গ্যাসের আলো, দু'চারটে মানুষের আনাগোনা। ওদিকে বিলাসবাবুর সংসার। জানলায় সেই বিষণ্ণ মেয়েটি। তৃপ্তিকে দেখেই চকিতে স'রে পড়লো। জানলায় স্পষ্ট হলো রামকৃষ্ণের প্রশান্ত মূর্তি, পেরেকে ঝোলানো রেন-কোট। যেন একটা মরা-মানুষ ফাঁসিতে ঝুলছে।

অসহ্য বিরক্তিতে ঘরে ফিরে এলো তৃপ্তি। দুঃসহ সেই একা ঘরে। একা অমিতই যেখানে জীবনকে বোঝা ক'রে তুলেছে সেখানে সেই মেয়েটি আবার নতুন ক'রে মনে করিয়ে দেয় মমতার স্মৃতি। মাথার শিরা-উপাশিরার দাপাদাপিতে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লো তৃপ্তি। আচ্ছা, সুন্দরীদির কথা কি সত্যি? নিধুর-মা এখনও বলে! কই মেয়েটিকে দেখে তো বোঝা যায় না কিছু। মমতা কেমন আছে? কতোদিন চিঠি লেখেনি। অমিত! কতোদিন দেখিনি। কণ্ঠনালীতে আর বুকে একটা কান্নার বেদনা অনুভব ক'রে তৃপ্তি। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পনেরো

'কলকাতা। আমার কলকাতা।'

অফিসের নির্দিষ্ট চেম্বারে ব'সে নিজের লেখাটা শেষবারের মতো পড়ছিলো কল্যাণ। বম্বের একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিকের জন্য কলকাতার উপর লেখা একটি রিপোর্টাজ। শহর নয় কলকাতা —মহানগর। পর্বতকে পাহাড় বললে পর্বতের অপমান। কলকাতার ইতিহাস, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের গোড়াপত্তনের ইতিহাস। ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যে, সংস্কৃতির সম্পদে, পূর্বাঞ্চল ভারতের মুকুটমণি অর্থনৈতিক স্নায়ুকেন্দ্র এ মহানগর। প্রতিবাদে দাবানল হয়ে জ্বলতে জানে, পরবাসী বিদেশীকে জননীর মতো আপন ক'রে স্নেহে শীতল হ'তে পারে। সারা ভারতের অহঙ্কার হয়েও, একটু-একটু ক'রে তিলে তিলে পৃথিবী তাকে গড়েছে। এ নগর পৃথিবীর। তাই দমদম বিমান বন্দরকেই মনে হয় কলকাতার প্রতীক। বহুদিন, বহুবার সাংবাদিকতার কাজে সেখানে গিয়ে, সম্মানিত রাষ্ট্রিয় অতিথিদের সম্বর্ধনা উৎসবে যোগ দিয়ে একথাই বারবার মনে হয়েছে কল্যাণের। ভালো লেগেছে আর গভীর ক'রে ভালোবেসে ফেলেছে এ মহানগরকে। নানা কাজের ভিড়ে জড়িয়ে যদি কাজের মধ্যেই নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করা যায় তবে জীবনের প্রসারতা বাড়ে, বাঁচতে ভালো লাগে। আর তখনই ছড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে নগরের আলোকিত রাজপথ থেকে অলি-গলির অন্ধকার পর্যন্ত। যেখানে বাঁচার জন্য সংগ্রাম ক'রে প্রাণান্ত হয় মানুষ, তবু বাঁচতে চায়। দুবেলা খেতে না পেয়েও সন্তানকে স্কুলে পাঠায় ; অন্ধকারেও ভবিষ্যৎ খোঁজে।

নিজের রচনা, নিজের হাতে টাইপ করা দীর্ঘ প্রবন্ধ। পড়তে পড়তে

প্রতিটি অক্ষরই যেন মুগ্ধ করে। মোহিত হতে হয়। পড়া আর হলো না। এরই মধ্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো লোকেন, প্রেমাংশু, বিভাস। কল্যাণ অবাক হলো—'কি রে, তোরা হঠাৎ!'

'এলাম—' ভূমিকা না ক'রে টেবিলের উল্টোদিকে চেয়ার টেনে লোকেন বসলো। প্রেমাংশু, বিভাসও।

'এলি তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ কি মনে ক'রে?'

'দরকার আছে।'

'তার আগে চা খাবি?'

'আনাতে পারিস। আপত্তি নেই।'

কল্যাণ বেয়ারাকে ডেকে চায়ের হুকুম দিলো। হাতের কাগজটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে মন দিলো বন্ধুদের দিকে—'বল কি বলবি।'

বিভাস আরশুলা-রঙের মেশোনেট-ঘেরা চেম্বারটার চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলো। বললো, 'তুই তো মস্ত মানুষ আজকাল। ভি আই. পি.।

সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে কল্যাণ মৃদু হাসলো, 'নে, সিগারেট খা।' চায়ের সঙ্গে দু'চার কথার ফাঁকে উদ্দেশ্য বর্ণনা করলো লোকেন। কথায় কথায় প্রসঙ্গটা উঠলো এবং স্বভাবতই আসল কথায় পৌঁছলো ওরা—'অমিতের সঙ্গে দেখা করিস্ না কেন? ভুলে গেছিস?'

'ভুলবো কেন!'

'যাস্ না ওর কাছে?'

'গিয়েছিলাম মাস দু-তিন আগে। কি হবে গিয়ে? ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না আজকাল। সিগারেটে মোলায়েম একটা টান দিয়ে কল্যাণ কথার জের টেনে নিলো। তাছাড়া সময় কোথায় আমার। এতো কাজ। তৃপ্তি তো প্রায়ই যায়। ওর কাছেই খোঁজ-খবর নিই।'

'তৃপ্তি যায়। সেটা তৃপ্তির কথা। কিন্তু তুই ?'

'তৃপ্তি প্রায়ই যায়। আমি মাঝে মাঝে। ব্যস্, এর বেশি আর কি চাস্ তোরা। আমার তো রোজ যাবার সময় নেই।'

'কিন্তু কল্যাণ বুঝে দ্যাখ' বিভাস আরও ঘনিষ্ঠ এবং আরও গুরুগম্ভীর হবার জন্য কণ্ঠস্বর ভারি ক'বে বললো—'আমরা বন্ধুবান্ধব ছাড়া ওর তো দুনিয়ায় কেউ নেই। আমবাও যদি খুব 'সিরিয়াস' না হই তবে ছেলেটা যে ম'বে যাবে।'

'তাতে আমি কি করতে পাবি ?'

'আমরা সবাই ওব কথা ভাববো।'

'একে কি বলে ? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খোকাকে মানুষ করা ?' কল্যাণ পরিহাসে হাসলো।

'এতো ক্রুড হচ্ছিস তুই ?'

'আচ্ছা তাতে আমি কি করতে পারি—' চাপা বিরক্তিতে যেন ফেটে পড়তে চাইলো কল্যাণ—'ছেলেটা উন্মাদ নয় যে গারদে পাঠাবো, রুগ্ন-পঙ্গু নয় যে হাসপাতালে দেবো, বাচ্চা-খোকাটিও নয় যে শাসন করবো, ধমক দেবো, বোকা বা নির্বোধও এমন নয় যে অবজ্ঞা করবো। কি করবো বল্, কি করার আছে এতে। তোরা যে মিশন নিয়ে এসেছিস্, মানি সেটা মহৎ কাজ। কিন্তু তোদের ধাবণার সঙ্গে আমার পার্থক্য, তোরা অমিতকে যেভাবে ভালোবাসিস্ আমি সেভাবে বাসি না।'

'তোর ভালোবাসার নমুনা ?' লোকেন ভ্রূ কোঁচকালো।

'তোরা ভাবিস্, ও যেভাবে চলে, বলে, জীবন কাটায়, সেটা ওর স্বভাব। আমি মানি না, ওভাবে স্লো-পয়জন ক'রে তিলে তিলে মরার কোনো সার্থকতা আছে ? মানে ওর কাছে গেলেই তর্ক হয়। অনর্থক একটা কুৎসিত আবহাওয়া গ'ড়ে ওঠে। কী লাভ গিয়ে। তাছাড়া অমিত ওর নিজের দিকটা সমর্থন করার জন্য এমন কতগুলো যুক্তি সাজিয়ে রেখেছে, যার জন্য ওকে বুঝিয়েও কিছু হবে না।'

'ওকে বোঝানোর কথা তো হচ্ছে না—' প্রেমাংশু ওর অধ্যাপকসুলভ

নম্রতায় বললো—'ওর এখনকার বিপদে তো কিছু সাহায্য করতে পারিস্।'

'এখনকার বিপদ ? ওর দর্শনে এখনকার বিপদ ব'লে কিছু আছে নাকি ?' কল্যাণ ওর সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঠুকলো। মুচকি হাসির জের টেনে বন্ধুদের দিকে তাকালো—'মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়াটই তো ওর মতে একমাত্র বিপদ। আর সেই বিপদের মধ্যেই তো ছোটো-খাটো সব বিপদ তুচ্ছ হয়ে আছে। যাক, ওর বিপদটা কী শুনি ? অসুস্থ ?'

'ওর চাকরি নেই।'

'কেন, মাস্টারি তো করছিলো।'

'না, সেটা গেছে অনেকদিন।'

'কেন, কেন গেল ?' আস্তে-আস্তে চিন্তিত হয়ে উঠলো কল্যাণ—'তাহলে ও করছে কি এখন ?'

'কিছু না।'

'চলছে কি ক'রে ?'

'এতোদিন ধারে-ধুরে চালিয়েছে। এখন আর চলছে না। ও অবশ্য কোথায় কোন এক বই-এর দোকানে খাতা লেখার, প্রুফ দেখার কাজ ঠিক করেছে একটা। বড়ো কম মাইনে।'

মনে মনে তৃপ্তির উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো কল্যাণ। অমিতের কথা বহুদিন ধ'রেই বলছে না ও। অথচ এতো কাণ্ডও যে ঘটে গেছে এর মধ্যে, তারও কোনো হদিশ হয়নি। হঠাৎ লোকেনের কথায় ভাবনাটা নাড়া খেলো। লোকেন বললো—'এর জন্যই তোর কাছে এলাম।'

'আমার কাছে। কেন বল্ তো ?'

'তোদের অফিসে যদি কোনো কাজ-টাজ দিতে পারিস। কাগজের অফিসের কাজ! বেশ অনারেবল কাজ।'

'কিন্তু ওকে জিগগেস করেছিস্। ও করবে এখানে কাজ ? ওর তো আবার বড়ো বড়ো অফিস সহ্য হয় না।'

‘ওকে রাজি করাতে হবে।’

কথাটাকে বড়ো রকমের একটা ঠাট্টা ভেবে এবার সশব্দেই হেসে উঠলো কল্যাণ—‘তোরা যে আমার চেয়েও অমিতকে কম বুঝিস্ জানতাম না তো। আমার যতোটুকু অভিজ্ঞতা আর ওকে যতোদূর চিনেছি তাতে বলতে পারি, ও রাজি হ'লে ওকে দিয়ে কিছু করানো যেতে পারে কিন্তু ওকে কোনো কিছুতে রাজি করানো অসম্ভব।’

‘সে ভারটা যদি আমরা নিই ?’

‘সেদিন আমিও ওর জন্যে যতোদূর সম্ভব চেষ্টা করবো।’

‘তার আগে কিছু পারবি না ?’

কল্যাণ গম্ভীর হলো—‘মিথ্যে কপটতা ক'রে তো লাভ নেই। খোলাখুলিই কিছু সত্যি কথা বলি—অমিতকে আমি এককালে খুব ভালোবাসতাম, এখনো ততোখানিই বাসতে চাই। কিন্তু ক্ষমা করবি আজকাল ওর ওপর আর আমার বিশ্বাস নেই। চেয়ার তো আর একেবারে ফাঁকা প'ড়ে নেই যে ওকে এনেই বসিয়ে দেবো। আর তার মালিকও আমি নই। তবে এটুকু বলতে পারি, একটা সুযোগ পেলেই আমি ওর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু তারপর যদি এখানে এসে কোনো গোলমাল ক'রে বসে ? ওর মেজাজের সঙ্গে যে এখানকার আবহাওয়া মানিয়ে যাবে তার কি নিশ্চয়তা আছে ? তখন আমার প্রেস্টিজ—’

‘ওর জন্যে তুই তোর প্রেস্টিজের ভয় করছিস্!’ লোকেন যেন নিজেই অপমানিত বোধ করলো কথাটা শুনে।

কল্যাণ অকুণ্ঠিত—‘মাপ করিস্। কিছু স্পষ্ট কথা বলতে হলো। নইলে উপায় ছিলো না শুধু এটুকু বিশ্বাস করিস্, একদিনের গভীর বন্ধু অমিত আজও আমার বন্ধু। তোদের মতো আমাকেও ও ভাবায়। আই লাভ হিম্ স্টিল্। কিন্তু ভালোবাসলেও ওর ওপর রাগ হয়। সেটাই সইতে পারি না। ওভাবে বেঁচে থাকার পেছনে যে কোনো যুক্তি থাকতে পারে আমি মানি না।’

'আচ্ছা—' একটা অব্যয়োক্তির মতই সনিঃশ্বাস উচ্চারণ ক'রে লোকেন উঠে দাঁড়ালো। সেই সঙ্গে প্রেমাংশু, বিভাসও।

'রাগ না ক'রে আমাকে বোঝার চেষ্টা করিস্ তোরা।' ওদের দাঁড়াতে দেখে শেষ কথা বললো কল্যাণ।

'হুঁ, দেখবো।' বন্ধুর দিকে না তাকিয়েই লোকেন দরজার দিকে এগোলো।

ওরা চ'লে গেলে, কল্যাণ নিজের কাজে মন দেবার আগে বেল টিপলো। টেবিল থেকে চায়ের কাপগুলো সরিয়ে নেওয়া দর্‌কার।

কয়েকটি ট্যুটোরিয়ালের খাতা দেখছিলো তৃপ্তি। টেবিল-লাইটের আলোটা সারা ঘরে কিছুটা অন্ধকার ছড়িয়ে রাখে। সেই অন্ধকারে কখন যে ঘরে ঢুকেছে কল্যাণ হদিশ পায়নি। শেলফের উপর ফোলিও ব্যাগটা রাখার শব্দে চমকে উঠলো। ফিরে তাকিয়ে দম নিয়ে বললো—'দেখেছো, এভাবে আসতে হয়? উঃ, কী ভয় পেয়েছিলাম।'

সেদিকে কোনোরকম পাত্তা না দিয়েই কল্যাণ পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে লাগলো। কিছুক্ষণ নীরবতার পর স্তব্ধতা ভেঙে বললো—

'অমিতের কাছে গিয়েছিলে?'

আকস্মিক প্রশ্নে তৃপ্তি ঝাপটা মেরে ঘুরে বসলো, 'না তো, কেন, কিছু হয়েছে নাকি ওর?'

'তুমি ওর কাছে যাওনি?' কল্যাণ ভ্রূকুটি করলো।

'না।'

'কতোদিন যাওনি?'

তৃপ্তি মনে মনে দিন গুনতে চাইলো। একটু ভেবে বললো, 'তা হ'বে অনেকদিন। মাস তিনেক তো বটেই।'

'তিন মা—স! সত্যি বলছো?'

'কী বলছো তুমি? আমি তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাবো কেন?'

'ওর চাকরি গেছে তুমি জানো না?'

'চাকরি গেছে? কবে?'

কল্যাণ ঠোঁটের কোণে ভাঙা হাসি হাসলো—'আমার চেয়েও যে তুমি অবাক হলে বেশি।'

তৃপ্তি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো—'তুমি কী ক'রে জানলে?'

'লোকেনরা এসেছিলো অফিসে। ব'লে গেলো—' কল্যাণ পাঞ্জাবিটা ব্র্যাকেটে রেখে আলনা থেকে লুঙ্গিটা টেনে নিলো— 'কিন্তু খবরটা তোমার কাছে পেলেই খুশি হতাম।'

'জানলে তো তোমায় বলবো।' তৃপ্তির কণ্ঠস্বরে একটা চাপা উষ্মা প্রকাশ পেলো এবার। কল্যাণ নিঃশব্দে ধুতিটা বদলে যখন কিছু বললো, তখন কথার মোড়টা অন্য দিকে ঘুরে গেছে 'ওরা এসেছিলো উমেদারি করতে। আমাদের কাগজের আপিশে কোনো কাজ-টাজ পাওয়া যায় কিনা।'

'তুমি কি বললে?'

'দেখবো চেষ্টা ক'রে।'

'সত্যি দেখবে তো?'

'বলতে পারি না।'

'মানে—'

'সাংবাদিকতার কাজ শুধুমাত্র একটা চাকরি নয়। তার অন্য কতোগুলো দায়িত্ব আছে। যার নিজের কোনো পজিটিভ বিশ্বাস নেই, পারিবারিক বা সামাজিক জীবন হিসেবে যার কোনো চরিত্র নেই, মানুষকে যে ভালোবাসতে জানে না, এসব চাকরি তার জন্য নয়।'

ভিতরে ভিতরে তৃপ্তি কাঁপছিলো। স্বামীর কথাগুলোর প্রতিবাদ করতে চাইছিলো। চোখদুটো বড়ো হতে-হতে দৃষ্টির তেজটা যখন স্তিমিত হয়ে এলো, তখনই দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা আশ্রয় পেলো তৃপ্তি। কিছুক্ষণ স্বামীকে লক্ষ্য করলো। ওর গেঞ্জি খোলা, আলনার ধুতি-শাড়ির ভিড় থেকে গেঞ্জি-আণ্ডারওয়ার খুঁজে

নেওয়া। কল্যাণ যখন বাথরুমে যাবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠলো, ঠিক তখনই প্রশ্ন করলো—'তোমাদের অফিসে কেরানি নেই ?'

'থাকবে না কেন ? অসংখ্য।'

'তারাও কি সাংবাদিক ?'

'না, কিন্তু চাকরি করার জন্য যতোটুকু নিষ্ঠার দরকার তা তাদের আছে।'

তৃপ্তির নতুন কিছু কথা খুঁজে পাবাব আগেই কল্যাণ বেরিয়ে গেলো।

ষোল

ঘরে আরশি নেই। ছাতা-পড়া জানলার শার্সিতে মুখ দেখার চেষ্টা করলো অমিত। সজোরে গালের উপর হাত বুলিয়ে ঘরের মধ্যেই বারবার পায়চারি করতে লাগলো। এখন উপায় ? ধার-বেড়ে গেছে। হোটেলের টাকা মেটাতে না পারলে ঘব ছেড়ে চলে যেতে হবে। চ'লে যাবো ? যতোই বদ্ধ, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে কুৎসিত খুপরি হোক, একটা ঘরে একা থাকার সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। যদি একটা মাস কোনো মতে কাটানো যেতো। মাত্র একটা মাস। সামনের মাসে বই-এর দোকানে চাকরি ক'রেই সব ঠিকঠাক ক'রে নিতাম। শুধু একটা মাস। মাত্র......নিজের আচরণে হঠাৎ নিজেই কেমন কৌতুক বোধ করলো অমিত। অট্টহাস্যে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করলো। কী করছি আমি ? আমি কি পাগল হয়ে গেছি ? আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। কাল কি হ'বে তার কথা !

অমিত একটা শস্তা সিগারেট ধরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুটা ধোঁয়া ছড়ালো। আজ যদি কয়েকটা টাকা থাকতো একটু মদ খেতাম। লোকেন যদি আসতো এমন সময় ওকে ভোলাতে চেষ্টা করতাম।

প্রায়ান্ধকার ঘরে অমিত কড়ি-বরগাগুলোকে আবছা দেখতে পেলো। সেদিকে তাকিয়ে রইলো। ছ'টি কড়িকাঠ এবং একটি বরগা। জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিসর। বাইরের বিরাট পৃথিবী থেকে ধাক্কা খেতে-খেতে এখানে এসে আটকে পড়েছি। এ দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলার শক্তি আমার নেই। সেজন্য প্রচণ্ড ক্ষমতা চাই। আমি ক্লান্ত। অবশেষে তক্তাপোষের উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে প'ড়ে অন্ধকারেব দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু।

'কিরে, অন্ধকারে কি করছিস্?'

'কে লোকেন—' উল্লসিত হয়ে লাফিয়ে উঠলো অমিত।

'আমি কল্যাণ।'

'কল্যাণ!' অমিতেব উদ্যম নিভে গেছে। অনাসক্তভাবে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালেব সুইচটা টিপে দিলো—'বোস।'

'তোব নাকি চাকরি নেই?'

'তুই কি ক'রে জানলি?'

'তৃপ্তিব কাছে।'

'তৃপ্তি কি ক'বে জানলো?' চোখ-মুখ খিঁচিয়ে অমিত তাকালো। কল্যাণ মুহূর্তে সংশোধন কবলো নিজেকে—লোকেন-বিভাস-প্রেমাংশু আমার অফিসে গিয়েছিলো। ওদের কাছে শুনলাম।'

'কেন বললো ওরা?'

'কথায় কথায় উঠলো, তাই বললে।'

'আমার চাকরি থাক না থাক, সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওরা প্রচাব ক'রে বেড়াবার কে?'

'সে কৈফিয়ৎ ওরা দেবে।' কল্যাণ শান্ত ভঙ্গিতে নড়বড়ে চেয়ারটাতে বসলো।

'কিন্তু তুই কেন এসেছিস্? তোকে ওরা আসতে বলেছিলো?

না। আমি একটা কথা বলতেই এসেছি।'

'কি কথা?'

'চাকরি করবি ?'

'কোথায় ?'

'আমাদের অফিসে।'

'কি করতে হবে ?

'এখন কি ক'রে বলবো ? কোথাও কোনো ভেকান্সি হলে তোর জন্য চেষ্টা করতে পারি।'

'জানি তুই একজন বড়ো অফিসাব। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এডিটব। চাকবি দেবার ক্ষমতা তোর আছে।

'যদি জোগাড় ক'রে দিই, তরে করবি ?'

'না।' অমিত তক্তপোশের উপব আবার শুয়ে পড়লো।

কল্যাণ বিব্রত হলো, 'না, কেন ?'

'চাকরি আমি পেয়েছি।'

'সে তো বাজে কাজ। অল্প মাইনে। তোর মদেই চলে যাবে।'

অমিত উঠে বসলো পা ছড়িয়ে। 'যা জানিস্ নে সে সম্বন্ধে কথা বলিস্ নে। যাবা মদ খায়, টাকার অভাবে তাদের নেশা করা বন্ধ থাকে ? থাকে না। কিন্তু দয়া ক'বে আমাকে আর অনুগ্রহ করিস্ নে তোরা। দোহাই তোদেব।'

কেন ভালো চাকরিতে আপত্তি কি তোর ?'

'আমি যা চাইনে তেমনি অবাঞ্ছিত পরিবেশ, কিছু শৌখিন ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়তে হবে। দোহাই তোদের, আমাকে ক্ষমা কর্। আমাকে একা থাকতে দে।'

'এখানে একা আছিস্ ?'

'আলবৎ।'

'একা থাকতে পারে মানুষ ?'

'কেন পারবে না ? আমি তো আছি। দিব্যি আছি।'

কল্যাণ মৃদু হাসলো—'কলেজে পড়তে-পড়তে তুই ই সা আমাকে একদিন বলেছিলি অমিত তোর ছেলেবেলার কথা। কোট-প্যাণ্ট-

টাই-নেকটাই আর মোটর-গাড়িওলা লোক দেখে তোর ঈর্ষা হতো। ভাবতিস্ বড়ো হয়ে ব্যারিস্টার হবি। মনে পড়ে না তোর সেই শিশুটিকে যে ওসব ছাই-ভস্ম স্বপ্ন দেখতো ?'

'ছেলেমানুষিটা মানুষ ছেলেবেলাতেই করে।'

'আর বয়স্ক মানুষের কাজ বুঝি শুধু মদ আর জুয়া ? ভালো ভালো, কল্যাণ বন্ধুর দিকে তাকালো, 'কিংবা ধর্ সেই মানুষটাকে, সেই অমিত নামক যুবকটি যে এক সময় ছাত্র-নেতা ছিলো, মাঠে-ময়দানে-মিছিলে নেতৃত্ব করতো, পুলিশের লাঠিকেও ভয় করতো না, শহীদ হয়ে মরতে পর্যন্ত চেয়েছিলো। সেই মানুষগুলো তোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে না ? তোকে একা থাকতে দেয় ?'

'থাক্, থাক্ বুঝেছি,' অমিত ওর চারমিনারের প্যাকেটটা টেনে আনার জন্য শিয়রের বালিশের দিকে ঝুঁকে পড়লো এবং হাত দিয়ে দেখলো প্যাকেট শূন্য।

অন্যদিকে নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অমিতের দিকে ছুঁড়ে দিলো কল্যাণ। আলোর নীচে সিগারেটটা নেড়ে-চেড়ে কপাল কোঁচকালো অমিত, 'দামি সিগারেট। বহুদিন খাইনি।' তুজনেই সিগারেট ধরালো। পুরোনো কথার জের টেনে অমিত বললো—'যে মানুষগুলোর কথা তুই বললি তাদের আমি চিনি। আমার সঙ্গেই ওরা থাকে। কিন্তু ওরা আমাকে কী বলে জানিস্ ? শিশুটি বলে, 'ডোণ্ট বি এ ফুল।' শিশুর মতো সরল মন বলে লোকে যে একটা কথা বলে, আসলে ওটা একটা বুজরুকি। এ তুনিয়ায় আজ আর সে মানুষ কেউ নয়। আর সেই যুবকটি বলে— কতকগুলো এই যে এতোসব আমি করলাম এগুলো কিন্তু সব বাজে। ফাঁকা আওয়াজ। কিছু না, কিছু না। স্রেফ স'রে পড়ো। তোমার যদি বুদ্ধি থাকে তবে বুঝে নাও কত মিথ্যে আশ্বাস খুঁজে আমরা মরছি। যা পাওয়া যায় না, পাবার নয় তারই পিছনে আমার ঘুরে ঘুরে হন্যি হচ্ছি দিনরাত।'

'কিন্তু জীবনের যদি সত্যি কোনো অর্থ থাকে তবে সেটা ওখানেই— কল্যাণ সিগারেট থেকে এক মুখ ধোঁয়া শুষে নিয়ে অমিতের দিকে তাকালো—'দুর্লভ আর দুষ্প্রাপ্য একটা কিছু আছে বলেই তো বেঁচে আছি। বাঁচতে পারছি। সব কিছু পেয়ে গেলেই তো বুড়ো আর ভোঁতা হয়ে যাবো।'

অমিত বিদ্রূপে হাসলো। উচ্চকিত হাসির রোলে কল্যাণের অস্তিত্বই যেন নস্যাৎ করতে চাইলো—'তুই তোর উপযুক্ত কথাই বলেছিস্। ওই ফাঁকা কথাগুলোই তোদের অক্সিজেন। একদিন আমিও বলতাম, তোদের চেয়ে আরও বেশি জোর দিয়ে বলতাম। সেদিন মনে হতো, গোটা দুনিয়াকে ভেঙে-চুরে উল্টেপাল্টে তছনছ ক'রে পাল্টে দেবো। আর কী উৎসাহই না পেতাম সেসব ভেবে। কিন্তু এখন বুঝছি সেসব ননসেন্স। দুনিয়াটা যেমন ছিলো, ঠিক তেমনই আছে। শুধু আমি নিজেই পাল্টে গেছি।'

'অমিত—' কল্যাণ গলার স্বর গম্ভীর ক'রে আনলো—'মানুষ সত্যি সত্যি কখন ম'রে জানিস? ঠিক তোর মতো যখন তার বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটে। লড়্তে লড়্তে এক সময় যখন পরাজয়কেই মেনে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। কি এমন ঘটেছে তোর জীবনে যার জন্যে তোকে এভাবে বাঁচতে হ'বে।'

অমিতের দিকে তাকিয়ে মানুষটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো কল্যাণ এবং ভীত হচ্ছিলো। অসংখ্য শীতে রস-নিংড়োনো লাঞ্ছিত খেজুর গাছের মতো ক্ষত বিক্ষত হাড়-জির্জিরে শরীর। গেঞ্জি-ঢাকা শীর্ণ বুক। চোয়াল ভাঙা মুখে একগাল দাড়ি। অথচ এই অমিতই একদিন সুন্দর ছিলো দেখতে। স্মার্ট, এনার্জেটিক ইয়ংম্যান। স্মৃতিতে দেখা মানুষটির সঙ্গে একবার অমিতকে মিলিয়ে দেখলো কল্যাণ।

'আরে' আমি টিকে আছি, কোন মতে টিকে থাকতে চাই—' বন্ধুর দিকে কটাক্ষে তাকিয়ে নিয়ে রুক্ষ, কর্কশ আর বিমর্ষমুখে আরও

তিক্ততার ছাপ ফেলে অমিত বললো—'ভদ্রলোকের মতো বেঁচে থাকতে আমিও চেয়েছি কল্যাণ কিন্তু পারিনি। আজ আমাকে দেখে তোরা বুলি আওড়াচ্ছিস কিন্তু জানিস না কত ফাঁকা জায়গায় তোরা দাঁড়িয়ে আছিস্ আর সে তুলনায় আমি কতো ভালো।'

কল্যাণ তর্ক করতে চায়নি। কারণ জানে, সে তর্ক ঝগড়ায় দাঁড়াবে। উত্তর দিতে চেষ্টা করলো না। ভাবলো, উঠে যাবে। কিন্তু এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে অমিত, যেখান থেকে সে ফিরে যেতে নারাজ। গলা-খাঁকারি দিয়ে, হাতের সিগারেটে কয়েকটি দ্রুত টান দিয়ে তক্তপোষের পাশে ফেলে দিলো। কণ্ঠস্বরকে বেশ কিছুটা খাদে নামিয়ে এনে বললো—'আমরা সেই একটি শিশু কল্যাণ, যে সন্ধ্যার পর একা চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। যে বিরাট রাস্তায় মিনিটে দেড়শ-দুশ গাড়ি চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল স্পিডে শাঁ-শাঁ ক'রে ছুটছে, সে রাস্তাটাই একা পেরোতে হবে সেই সবে-হাটতে-শেখা শিশুটিকে। বলতে পারিস, কেউ কি পেরোয় না? হয়তো পেরোয়। কিন্তু তোরা তো আবার 'অ্যাকসিডেণ্ট' মানিসনে, তবু বল্‌বো, ওই শিশুটি যদি তা পারে সেটা নেহাতই একটা 'অ্যাক্‌সিডেণ্ট। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি, ভয়, আতঙ্ক।'

'কিন্তু আমরাও তো সে রাস্তাটা পেরোবার ঝুঁকি নিয়েছি।'

হ্যাঁ, ঝুঁকি আমিও নিয়েছি। তোদের মতো 'পারবো' জেনেই নিয়েছি কিন্তু পারিনি। ধ'রে নিয়েছি, আমাকে দিয়ে তা হলো না। সম্ভব নয়। গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এখন আমি হাসপাতালে। জানি, মরতে হবে। আমিও প্রস্তুত। সেদিক থেকে আমি তোদের চেয়েও নিরাপদ। কোনো দ্বিধা নেই, জড়তা নেই, সংশয় নেই। জীবন সম্বন্ধে একটা 'পজিটিভ' সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি—আমি ব্যর্থ। কিন্তু তোরা? তোরা 'আপ' রাস্তাটুকু পেরিয়ে ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিস, তোরা নিরাপদ। কিন্তু ভুলে যাচ্ছিস,

এখনও অনেক বাকি। তোদের পেছনে 'আপ', সামনে 'ডাউন'। তোদের সামনে যতোটা বিপদের ঝুঁকি পেছনে ঠিক ততোটা। না পারছিস্ এগোতে, না পারছিস পিছোতে। যতো দ্বিধা-ভয়-ভাবনা-জড়তা-টানা পোড়েন সব তোদের। আমার নয়।'

'থাক অমিত, এ' তর্কের শেষ নেই, শেষ হবেও না। অনর্থক কথা বাড়বে'—পায়ের উপর পা তুলে বসে ছিলো কল্যাণ। এবার নড়ে বসলো। কথায় এবার সে বিরতি চায়। উপসংহার হিসেবে বললো—'সুখ বলতে কি বোঝায় জানি না। শুধু জানি, আমবা যে যুগে যে সমাজে বাস করছি সেখানে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে জোর করে বলতে পারে—আমার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা আমাদের সকলের আছে। সকলের। তবে মার খেয়েও মরতে না চাওয়াই আমার কাছে জীবনের মূল্য। জানি, তুই তা মানবি না। তোর সঙ্গে বক্তব্যের মিল আমার কোনোদিনই হবে না। তবু বলবো—তোকে যে এসব কথা বলছি তার মানে এই নয় যে আমি খুব সুখী মানুষ। কিন্তু শুধু দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে আমি আমার বাঁচার দমটা নিঃশেষ করতে আমি নারাজ। তোর এই কৃত্রিম জীবনযাপন, এই কুৎসিত আত্মপীড়নকে আমি-—'

'কি থামলি যে—' অমিত কুটিল দৃষ্টিতে তাকালো।

'ঘৃণা করি—' শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে এতোটুকু কুণ্ঠিত হলো না কল্যাণ। হাসিতে ফেটে পড়লো অমিত—'এ বিগ্ চাইল্ড, বিগ্ চাইল্ড স্পিকস্ অব্ হিজ্ ওন ইগ্নোরেন্স। আমি, আমিও তোদের ওই অজ্ঞতাকে খুব শ্রদ্ধা করি না কল্যাণ। একটু আগে তুই তোর দুঃখের কথা বললি না? বললি না পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যার কোনো সমস্যা নেই। তাহলে শোন আমি সেই মানুষ। আমার সমস্যা নেই। আমি মদ খাই, বেশ্যা বাড়ি যাই, জুয়া খেলি—পরোয়া করিনে কোনো লোককে। হ্যাভ ইউ এভার টেস্টেড এনি ব্যাচেলর্স্ ওআইফ?'

'ব্যাচেলরস্ ওআইফ ?'

'হ্যাঁ, বাংলায় যাদের গণিকা বলে—' অমিত সেই উদাত্ত হাসির গমকে-গমকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—'মেয়েমানুষের চামড়ায় যে সুখ তা সব মেয়েমানুষই দিতে পারে। তুলসিপাতায় ধোয়া বৌ-এর সঙ্গে শুয়ে রাত কাটাতে পারলাম না বলে আজ আর কোনো লোভ নেই। আমি কুকুর হয়ে গেছি। উচ্ছিষ্টতেই খুশি। দোহাই তোদের, আমাকে উপদেশ দিসনি। দয়া ক'রে তোদের মতো ভদ্রলোক হতে বলিস নি। ও'সব আর ধাতে সইবে না।'

প্রায় লাফিয়েই উঠে দাঁড়ালো কল্যাণ।

অমিত বিনীত হলো—'রাগ করলি।'

'খুব কি অন্যায় করবো যদি করি?'

'আমি জানি, তুই কি ভাবছিস্।'

চলে যাচ্ছিলো কল্যাণ। তীক্ষ্ণ অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকালো। গড়াতে গড়াতে অমিতও নামলো তক্তপোষ থেকে। কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে পিঠ নীচু করে দাঁড়ালো। হাসতে হাসতেই বললো—'ভাবছিস্, এ রকম একটা লম্পট, মাতাল, চরিত্রহীন লোকের কাছে তোর স্ত্রী একসময় আসতো।'

'আসতো মানে! এখন আসে না?'

'আসে কিনা তুই জানিস নে?'

'না।'

অমিত আবার হাসলো—'না, আসে না। যাতে আর কখনও না আসে তার জন্যে বলিস—'হি ইজ্ এ ডিবচ্। এ লুম্পেন্। ওর নিঃশ্বাসের বাতাসও ভালো মেয়েদের গায়ে লাগাতে নেই।'

'ইডিঅট—'

অমিত হো হো করে হেসে উঠলো—'শুধু ওইটুকু? নিজের স্ত্রীর সম্মান রাখতে তোর কিন্তু এখনই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।'

উত্তরে শুধু একটা শব্দ শুনলো অমিত। প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করার শব্দ।

সতেরো

রেডিও ছিলো ঘরে, একটা নতুন রেকর্ড প্লেয়ার-গ্রামোফোন এলো। সঙ্গে বেশ কিছু রেকর্ড—রবীন্দ্রনাথের গান, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত, সেতার-সরোদ। তৃপ্তির বহুদিনের ইচ্ছা। শুধু তৃপ্তি কেন, মনে মনে কল্যাণও চেয়েছে অনেকদিন। অর্ধেক টাকা দিয়ে আজই সেটা ঘরে এনেছে কল্যাণ। এর পর কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ দিতে হবে। তৃপ্তির হিসেব—'একমাসে তোমার মাইনে থেকে, পরের মাসে আমার।'

প্রথম দিনের প্রথম গানেই গম্‌গম্ ক'রে কেঁপে উঠলো ঘরটা। আওয়াজ শুনে নীচ থেকে ছুটে এসেছে অন্যান্য ভাড়াটেদের ছেলে মেয়েগুলো। ঘরে যেন রীতিমত একটা মেলা বসে গেছে। তৃপ্তি ওদের সকলের হাতে একটা বিস্কুট দিলো। কল্যাণ পড়লো সুন্দরীদির বছর পাঁচেকের ছোটো ছেলেটাকে নিয়ে। মেঝের উপর হাঁটু ভেঙে বসে ওর সঙ্গে খেলা করে, সুড়সুড়ি দেয়, গুম্ গুম্ করে পিঠে ঘুসি মারার ভান করে পিঠে আল্‌তোভাবে ছোঁয়। ছেলেটা শুধু হাসে। আর সব বাচ্চারা ওর মজা দেখে হাসে। হৈ-চৈ-এ গ্রামোফোনের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যায় না আর। দূরে বসে কল্যাণের ছেলেমানুষি দ্যাখে তৃপ্তি। দ্যাখে আর মুচকি হাসে। কালো, নোংরা আর গালে-মুখে লালা ঝরানো উলঙ্গ বাচ্চা দেখলে ভীষণ চটে যেতো কল্যাণ। আরও মাস কয়েক আগে এই ছেলেটাকেই যখন কোলে নিয়ে উঠে আসতো তৃপ্তি, কল্যাণ মুখে কিছু না বললেও তৃপ্তি বুঝতো—কল্যাণ পছন্দ করে না এ'সব. কিন্তু আজ কল্যাণেরই নেশা লেগেছে। বাচ্চা শিশুকে ভালোবাসার নেশা।

বেশ লাগছে আজ কল্যাণকে দেখতে। কল্যাণের এই উচ্ছলতা। কিন্তু বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারলো না তৃপ্তি, কেমন যেন লাগে। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েকে যে এতোটা ভালোবাসে কল্যাণ, তৃপ্তি যেন জানতো না এতোদিন। আজ এতোদিন পরে হঠাৎ আবিষ্কার করে মনে হচ্ছে—তৃপ্তিকেই কি যেন বোঝাতে চাইছে? তৃপ্তি একবার ওর শরীরটার অস্তিত্ব অনুভব করলো ভিতরে ভিতরে। উত্তেজিত রক্তের স্পন্দনে।

তৃপ্তি উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারের পাশে ছোটো ভাইটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ওঘরের লতা। তৃপ্তি ওর দিকে তাকালো—'তোর ফ্রকে এতো হল্‌দে দাগ কেনো রে লতু। মশলা পিষে ফ্রকে হাত ঘসেছিলি বুঝি?'

ফিক্ করে হেসে লজ্জায় মাথা নোয়ালো লতা। মশলা পেষার কাজটা লজ্জার কিংবা মশলা পিষে ফ্রকে হাত মোছাটা।

তৃপ্তি ওর ভাই-এর কচি গাল টিপে আদর করলো। লতার থুত্‌নিটা একটু স্পর্শ করলো—'এই টুকুন মেয়ে, মশলা পিষিশ তুই? ভারি কাজের মেয়েতো। কি সিধু বিস্কুট হাতে নিয়ে বসে আছিস্ যে। নে, খা। এই মিতু, না, ওটা না। কাজের জিনিষ নিয়ে খেলতে নেই।'

খাটের উপর পড়েছিলো কল্যাণের একটা বই। ছবি আছে কিনা নেড়ে-চেড়ে দেখছিলো মিতু। তৃপ্তি ওটা কেড়ে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলো। বাইরে যাবার জন্য দরজার দিকে তাকালো।

'বল্ তো ভোলা, কে বেশি ভালো। আমি না তোর মাসি।'

থম্‌কে দাঁড়ালো তৃপ্তি। ফিরে তাকিয়ে হাসলো। সুন্দরীদির ছেলেটাকে প্রশ্ন করেছে কল্যাণ। নিরীহ ছেলেটা একবার এদিকে তাকায়, একবার ওদিকে। তারপর একেবারেই বেরসিকের মতো আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলো তৃপ্তিকে। তৃপ্তি হাসলো।

'তবে রে—' কল্যাণ কাতুকুতু দিয়ে-দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুললো

ছেলেটাকে—'তৃপ্তি মাসি বিস্কুট দিয়েছে বুঝি। আচ্ছা, নিবি? নিবি ওই রেডিওটা? নে, নিয়ে যা--'

বেশ বিষয় বুদ্ধি আছে ছেলেটার। এতো বড়ো যন্ত্রটা সত্যি কেউ ওকে দেবে না, বুঝতে পারলো। কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো তৃপ্তিকে। তৃপ্তির হাঁটুতে ওর মাথা ছোঁয়। ওর মুঠো থেকে শাড়িটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ওকে কোলে তুলে নিলো তৃপ্তি। চোখ পড়ে কল্যাণের চোখে। কল্যাণ হাসে। তৃপ্তিও।

'আচ্ছা আয় তো খুকি, আয়—' নীচের তলার খুকির হাত ধরে টানলো কল্যাণ—'আয় তোকে আমি দুটো বিস্কুট দেবো। আগে বল্, কে ভালো।'

তৃপ্তি ওর কোল থেকে ভোলাকে নামিয়ে দেয়—'যাও, ওঁর কাছে যাও। তোমার মেসোর কাছে গেলে আমি তোমায় চারটে বিস্কুট দেবো।'

ছেলেটির বোকা-বোকা হতভম্ব ভাব দেখে সশব্দে হেসে উঠলো কল্যাণ। মেঝের উপরই আসন কেটে বসে পড়লো। হাসতে হাসতে তৃপ্তিও একটু ঠেলে ভোলাকে সাহস দিতে চাইলো। ভোলা নড়লো না। কি করবে ভাবলো। শিশুরা বুঝলো না, জ্যান্ত পুতুল নিয়ে কি খেলাই না খেলছে ওরা। ঠিক ওদের পুতুল খেলার মতো।

কিন্তু সব খেলাই ভেঙে গেলো আচমকা। একটা প্রচণ্ড চীৎকার আর সোরগোল এলো বাইরে থেকে। বোঝা গেলো না কি ব্যাপার। এক লাফে দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো কল্যাণ। তৃপ্তিও ছুটে গেলো। ছেলে মেয়েগুলো এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রেলিং-এর উপর।

চারদিকের বাড়িতে জানালায় রেলিং-এ কৌতূহল উঁকি দিয়েছে। রাস্তায় ছুটে এসেছে লোকজন। সামনের বাড়ির ভিতরে কি

নিয়ে যেন একটা হৈ-চৈ বেঁধেছে। অমন হৈ-চৈ তো প্রায়ই হয়। কলের জল নিয়ে ঝগড়া। কিন্তু ঝগড়া তো নয়। সবাই মিলে সোবগোল তুলেছে। বিলাসবাবু কি দিন-তুপুরে মদ খেয়ে ঘবে ফিবেছে? ফিরেই একটা কিছু কাণ্ড বাধিয়েছে! লোকটাকে দিয়ে কিছুই অসম্ভব নয়। ওদেব সদব দবজাব সামনে আস্তে আস্তে ভিড় ঘন হয়ে উঠছে। তৃপ্তি সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবলো। কিন্তু তা তো নয়। তাই যদি হ'বে তবে লোকটাব হাক-ডাক শোনা যাচ্ছে না কেন? হঠাৎ কি মনে হতেই তৃপ্তি জানালাটাব দিকে তাকালো এবং হতাশ হলো—সেটা বন্ধ।

সবই অনুমান। বাস্তাব কাউকে জিজ্ঞেসও কবতে পারে না কল্যান। এত সোবগোলে কেউ ওব ডাক শুনবে না। বিবক্তিতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো তৃপ্তি—'নাঃ এ'বাব সত্যি একটা বাড়ি দ্যাখো। এখানে অসহ্য।'

কল্যাণ নীচেব দিকে তাকিয়ে ভিড় দেখছিলো। অনাসক্ত গলায় বললো—'বললেই তো হলো না। কোথায় বাড়ি? কে দেখবে?'

হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে নিধুব-মা ছুটে এলো—'মা গো, সব্বনাশ হয়েছে। সব্বনাশ—'

'কি সর্বনাশ। কোথ্‌থেকে এলে তুমি?' তৃপ্তি ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

নিধুর-মা তখনও হাঁপাচ্ছে। ঢোঁক গিলছে—'হ্যাঁগো, আমি নিজে গে দেখে এলুম।'

কল্যাণ তৃপ্তি সমস্বরে ধমকে উঠলো তু'জনেই—'আঃ, কি দেখলে বলো না ছাই।'

'পুতুল, ও বাড়ির মেয়েটা গো, গলায় দড়ি দে মরেছে।'

'কি. কি বললে?' আৎকে উঠলো তৃপ্তি।

'তুমি নিজে দেখেছো?' কল্যাণ পুলিশি-জেরার মতো কঠিন হয়ে উঠলো।

'স্বচোক্ষে দেখে এলুম যে গো।

'কি দেখলে? ম'রে গেছে?'

'না মরা দেখিনি। গলার ফাঁস দেখে ওর মা যে মূর্ছা গেছে তাই দেখে এলুম।'

কল্যাণ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলো। ঝিম্ মেরে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তৃপ্তি। তা'কিয়ে রইলো ওই বন্ধ জানালাটার দিকে। যদি জানালাটা খুলে দেয় কেউ, কি দেখবো আমি? তৃপ্তি ভাবলো। সেই ছবি। রামকৃষ্ণের প্রশান্ত মূর্তি, পেরেকে ঝোলানো একটা রেন-কোট। ওই ছবি, ওই জানালাটাকে একদিন আমার কাছে কুৎসিত আর অসহ্য ক'রে তুলেছিলো দুনিয়ার সব মানুষ মিলে।

ওই দোতলা বাড়ির ছাদের রেলিং-এ গিঁট বেঁধে ভেজা শাড়িটা শুকোতে দিয়েছে কেউ। দেয়াল বেয়ে শাড়িটা ওদের দোতলার জানালায় এসে পড়েছে। তৃপ্তি শাড়িটা চিনতে পারলো। সেই মেয়েটির শাড়ি। বোধহয় ও নিজেই আজ সকালে স্নান ক'রে ছাদে মিলে দিয়েছে। এই শাড়িটা প'রেই মেয়েটি জানালায় এসে দাঁড়াতো। চারদিকে তাকাতো, রাস্তার মানুষ দেখতো। চোখে চোখ পড়লে স'রে যেতো। খোলা চোখে পৃথিবীর দিকে তাকাবার ওই ওর একটি মাত্র পথ। সেই মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। মরে গেছে। ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠলো তৃপ্তি। শরীরের প্রতিটি অনু-পরমাণু যেন ওকে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। এতোটা পাপের শরীর হয় মেয়েদের। আর সেই পাপ এতো বড়ো যে তাকে এমন ক'রে মরতে হ'বে।

রাস্তার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে, ভিড়ের প্রতিটি মানুষকে লক্ষ্য ক'রে প্রচণ্ড রাগ হলো তৃপ্তির। লোকগুলো মজা দেখতে এসেছে একটি মেয়ে মাত্র উনিশ বছর বয়সে জ্বলে-পুড়ে মরলো, আর সেই মৃত্যুর মধ্যেই ওদের মজা। মেয়েটির দুঃখ-যন্ত্রনার কথা

শুনবে না কেউ, বুঝবে না। মরে গিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে সতীত্বের উপর বক্তৃতা আওড়াবে। কেউ ভাববে না ওই মেয়েটিও বাঁচতে চেয়েছিলো। বাঁচবার পথ খোলা না পেয়ে মরলো। ম'রে বাঁচলো।

যদি ওর সঙ্গে আলাপ হতো আমার, যদি পরিচিত হ'তে পারতাম তবে হয়তো বাঁচাতে পারতাম ওকে। সাহস দিতে পারতাম। কেন যেন বারবার নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হচ্ছে আজ। কে জানে কার অপরাধ, কার দোষ। শরীরটা মেয়েটির কিন্তু পাপ হয়তো পুরোপুরি ওর নয়।

কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেলো চিন্তা গুলো। পুলিশের গাড়ি এসে থেমেছে। ভিড়ের মানুষগুলোর উৎসাহ বেড়েছে। এ'বারে তদন্ত হ'বে হয়তো হাত-কড়াও পড়বে কারও হাতে, হয়তো জেল হ'বে কোনো একটি ছেলের। ছেলেটিকে চেনে না তৃপ্তি। কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করে। কতো জঘণ্য সে হ'তে পারে? কতো কুৎসিত হতে পারে চেহারা? এতো ভীরু, এতো কাপুরুষ? পালাতে পারলো না মেয়েটিকে নিয়ে, বিয়ে করতে পারলো না? কিন্তু কতোবড়ো লম্পট সে, কতোখানি চরিত্রহীন? এক ফোঁটা চোখের জলও কি পড়বে না এ'মৃত্যু সংবাদ শুনে? ও কি পশু? এতোটুকু ভালোবাসা নেই! এতোটুকু মমতা!

মমতা! মমতাকে মনে পড়লো। এখন কেমন আছে ও? এখনও কি সেই ব্যর্থতাকেই বুকে চেপে মরছে মেয়েটি। কেমন হয়েছে ওর বর? বিয়ের পর অনেক মেয়েই মানিয়ে নেয়। ও কি পারেনি?

তৃপ্তি আর পারলো না। পিঠ-টান ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ালো এ'বার। এ'বার একটু একা থাকতে হ'বে। একা। একটু আগেও কল্যাণকে ভিড়ের মধ্যে দেখেছিলো। এখন দেখছে না। কোথায় গেলো ও। বাচ্চাগুলো তখনও বারান্দায় ভিড়

ক'রে আছে। তৃপ্তি ভুলে গেলো। একটু আগেও ওদের নিয়ে খেলছিলো ওরা। ওদের বাইরে রেখেই তৃপ্তি ঘরে ফিরে এলো। দরজা হু'টো ভেজিয়ে বিছানায় এসে বসলো তৃপ্তি। এতো ক্লান্ত মনে হচ্ছে কেন নিজেকে। খাটের বাজুতে কনুই ঠেকিয়ে মাথাটা চেপে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর শুয়ে পড়লো একসময়ে।

সে'জন্য নিধুর-মার হাত বন্ধ রইলো না। রন্নাঘরের উনুনে আঁচ দেওয়া হলো যথারীতি, চাল ধুয়ে ভাতও বসানো হ'বে ঠিক সময়। কখন বিকেল হলো খেয়াল নেই। অনেকক্ষণ পরে চায়ের কাপ সামনে রেখে ডাকার পর হুঁস হলো তৃপ্তির। বাইরের হৈ-চৈ তখন পুরোদমে চলেছে। এরই মধ্যে কখন যেন কল্যান ফিরে এসেছে। চেয়ারে ব'সে আছে চুপচাপ। টেবিলে চায়ের কাপ।

তৃপ্তি উঠলো। এলোচুল গুছিয়ে নিয়ে একটা হাতখোঁপা বাঁধলো মাথায়। বাইরে থেকে ঘুরে এসে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিলো। ধবধবে সাদা কাপ, সাদা প্লেট। কানায়-কানায় পরিপূর্ণ এক কাপ চা। চায়ের রঙ খয়েরি। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তৃপ্তি। খুব অস্পষ্ট, মোলায়েম আর ভাঙা ভাঙা সরু রেখায় ধোঁয়া উঠছে উপরের দিকে। এই চায়ের কাপ থেকে যে'টুক পাওয়া যায় তা' এক্ষুণি আদায় ক'রে নিতে হ'বে। ফেলে রাখলে জুড়িয়ে যাবে। কাপ প্লেটের রঙ সাদাই থাকবে, চায়ের রঙও খয়েরিই থাকবে কিন্তু ধোঁয়া থাকবে না। ঠাণ্ডা আর তেতো হয়ে উঠবে। বিষ। জীবনের এ'উষ্ণতা এ'উত্তাপ যৌবনে। হেলা-ফেলায় হারালে যৌবন জুড়িয়ে যায়, থিতিয়ে যায় একসময় নিঃশব্দেই চায়ের কাপে চুমুক দিলো তৃপ্তি। চুপচাপ বসে রইলো হু'জন। ও'পারের বাড়িতে মৃত্যু, এ'পারের বাড়িতে তার সুদূর প্রসারী ছায়া। খুব নরম আর শান্ত গলায় প্রশ্ন করলো তৃপ্তি—'পুলিশ এখন কি করবে।'

'পোষ্ট-মর্টেমে পাঠাবে। করোনারের রিপোর্ট না পেলে কেস চলবে না।'

'অ্যারেস্ট করেছে কাউকে ?'

'বিলাসবাবুকে নিয়ে গেছে। ছেলেটি নাকি পুরুলিয়া না কোথায় থাকে। সে'খানে ওআরেণ্ট যাবে। পুলিশ কি সব চিঠিপত্র পেয়েছে বলছে তো ওরা।'

'তারপর।'

'পুলিশ, কোর্ট, জেল, তিন বছর-চাব বছর কি পাঁচ বছরের 'আর-আই'।'

তৃপ্তি চুপ ক'রেই রইলো।

কল্যাণ একটা সিগারেট টেনে নিলো প্যাকেট থেকে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই প্রশ্ন কবলো—'আচ্ছা, কা'কে তুমি দোষ দেবে তৃপ্তি ? ছেলেটির না মেয়েটিব ?

তৃপ্তি চোখ তুললো। পবক্ষনেই অন্যদিকে তাকালো। বললো না কিছু।

'নিধুর-মার মতো কপাল দেখিয়ে বলতে পারো, দোষ কপালেব—'

কল্যাণ সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই-এর কাঠিটা অ্যাসট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বললো—আমি নিয়তি জানি না, অদৃষ্ট-ফদৃষ্টও বুঝি না। শুধু বুঝি, ও'রকম নোংরাভাবে মরতে আমি নারাজ। জীবনটা কি সত্যি একটা বোঝা ? একটা 'বার্ডেন' ? বেঁচে থাকাটা কি সত্যি একটা কঠিন কাজ ?'

চা শেষ। খালি কাপটা ঘরের কোনে সরিয়ে রাখতে উঠে দাঁড়ালো তৃপ্তি—'যে মেয়েটি মরলো, প্রশ্নটা তাকে না ক'রে ওই মাতাল লম্পট বুড়ো বাপটাকে করো না। মেয়েটিতো বাঁচতেই চেয়েছিলো কিন্তু পারলো কই।'

'বিলাসবাবু তো একটা পশু, একটা স্কাউণ্ড্রেল।'

'স্কাউণ্ড্রেল বলেই তো তার মেয়ে ও'রকম পশুর মতো মরলো।

'আমার সঙ্গে আলাপ থাকলে আমি তাকে সাহস দিতাম। বাঁচতে শেখাতাম—' ঘরের কোনে চায়ের কাপটা রেখে ফিরে আসতে আসতে তৃপ্তি উদাসীন ভঙ্গিতে বললো—'মেয়েদের অনেক কিছুই তোমরা বোঝ না। শুধু এটুকু জেনে রেখো, অনেক জ্বালায় মেয়েটি মরেছে। ও'দের বাড়ির সুখ কি জানোতো। কূয়োর মধ্যে সাঁতার কেটে যে সুখ, সেই সুখ। সেটা আরও কুৎসিত। নিধুর-মা, সুন্দরীদির কথা যদি সত্যি হয় তবে মনে রেখো যা ঘটেছে তার চেয়ে আরও নোংরা ঘটনা ও'বাড়িতে ঘটতে যাচ্ছে। খুব সিগগিরই টের পাবে।'

'কি সেটা।'

'দুদিন পরেই তো জানতে পারবে।'

কি, বলো না শুনি।'

তৃপ্তি স্বামীর দিকে তাকালো। তীব্র ঘৃণায় ওর নাক-মুখ কুঞ্চিত— 'ওই বুড়িটা, হ্যাঁ. রোজ সকালে যিনি গঙ্গায় পুণ্যিস্নান করতে যান, এই বয়সে আবার মা হ'তে চলেছেন। মা জাহ্নবী, সাত-সন্তানের পর এ'বার অষ্টমটির জন্ম দিতে চলেছেন। না আছে লজ্জা, না আছে একটা সাধারণ শ্লীলতা।'

স্ত্রীর কথায় খুব যে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হলো কল্যাণ, ওর মুখের ভাবে বোঝা গেলোনা ঠিক। তৃপ্তি উত্তেজিত হয়ে প্রায় চাপা কান্নার সুরে বললো—'ওই মেয়েটির জন্যে, ও'বাড়ির ওই মেয়েটির জন্যে চীৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার। আমাদের দুজনের জন্যে এ'ঘরটা বড়ো কিন্তু এর চেয়েও ছোটো একটা ঘরে ওরা ন'-দশজন থাকতো। একটা বন্ধ সিন্ধুকের মধ্যে দম বন্ধ ক'রে মেয়েটি মরলো। বেচারির কলঙ্কটাই সকলের কাছে বড়ো হয়ে থাকবে, কিন্তু ও, ও যে ঘরের মেয়ে, ওর মৃত্যুটাও যে মৃত্যু কেউ ভাববে না। বিয়ের পর যখন প্রথম এ' বাড়িতে এলাম তখনই আমি ওকে ওই জানালায় দেখি। কি জানি কেন, ওকে দেখলেই আমার কি মনে

হতো জানো? মমতাকে মনে পড়তো। ও ঠিক মমতার মতো দেখতে। আজও আমার মমুকেই মনে পড়ছে, কল্যাণ। মমু ঠিক ওই একই বয়সের মেয়ে।'

'ওকে তুমি তোমার বোন ভেবেছিলে। সেটা তুমি পারো। কিন্তু আপনজন হয়েও একটি ছেলে তা পারেনি।'

'আর ও'খানেই আমরা ছোটো হয়ে যাচ্ছি। ছোটো হয়ে গেছি কল্যাণ।'

'মানুষ যদি নিজের জন্যে দুঃখ তৈরি ক'রে দুঃখ পায় তবে কা'কে দোষ দেবে?'

'মেয়েটি ভুল করেছিলো। দুঃখ পেতে চায়নি, সুখ চেয়েছিলো। কেন ভুল করেছিলো সে প্রশ্ন করো না। ভুল করে বলেই তো মানুষ। সুখের জন্যে চাইতে গিয়ে যদি ভুলই ক'রে থাকে আর ওই ভুলটাই যদি দুঃখ হয়ে আসে তবে সেটা নিজের তৈরি দুঃখ নয়, নিজের তৈরি ভুল—' বলতে বলতে তৃপ্তির গলা শুকিয়ে এলো। একবার ঢোঁক গিলে আবার বললো—'আর আমরা যদি সত্যি একটা বিরাট হ'বার যুগে বাস করে থাকি তবে আজও কি একটি কচি-বয়সের মেয়ের ভীষণ একটা ভুলের অপরাধকে ক্ষমা করার মতো উদার হ'তে পারিনি?'

'এ উদারতা তোমার আছে। তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারো, কিন্তু—' উত্তেজনায় নয়, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে শান্ত নরম হয়ে কল্যাণ বোঝাতে চাইলো—'প্রচলিত বিশ্বাসে যখন ঘুন ধরে তখনই সেই বিশ্বাসটা কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। মা হবার নীতিগত প্রশ্নটা বহুদিনের প্রাচীন সংস্কার। সেটা এখনও আছে আরও কিছুদিন থাকবে। কি করবে বলো। কিন্তু তাই বলে কি তুমি ওর আত্মহত্যাটাকে সমর্থন করতে পারো?'

তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কল্যাণের কানে পৌঁছোলো। স্বগতোক্তির মতো দূরের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি বললো—'কে জানে, এ'ছাড়া হয়তো উপায়ও ছিলো না ওর।'

'তৃপ্তি—

তৃপ্তি তাকালো।

'অমিতও একদিন এভাবে মরতে চেয়েছিলো।'

'জানি।'

'সেদিন তুমি সেটা অন্যায় বলেছিলে।'

'বলেছিলাম।'

'আজও বলো।'

বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামছে। অন্ধকার জমছে ঘরের ভিতর। আবছা ছায়া-ছায়া আলোয় দুটো অস্তিত্ব দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ কাছে। খুব কাছে। তৃপ্তি জানে, হাত বাড়ালেই ওর স্বামী ওকে স্পর্শ করতে পারে। বুকে মাথা রেখে ও সুখ পেতে পারে, সুখ দিতে পারে কিন্তু ভিতরের কান্না শুনতে পাবে না। বুঝতেই পারবে না, এই বুকের যন্ত্রনা কতো গভীর।

'কি হলো, কিছু বলছো না যে।'

'কি বলবো—' তৃপ্তি মৃদুস্বরে বললো—'আমরা হয়তো ওকে ঠিক বুঝতে পারছি না। না বুঝে কিছু বললে অন্যায় করবো।'

'কিন্তু এ'টুকু বোঝ, এ'ভাবে বেঁচে থাকাটা জীবনের অপচয়।'

'হয়তো—'

'হয়তো নয়, সত্যি—' কল্যাণ গলার স্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা এনে বললো—যুগধর্মের নামে যারা ও'রকম আত্মহত্যাকে সমাধান ব'লে মনে করে আমি তাদের ভীরু বলি, কাপুরুষ। এত পড়াশুনা, 'ব্রিলিআন্ট' ছেলে। অনেক কিছুই হয়তো করতো পারতো জীবনে কিন্তু ইডিঅটটা সব নষ্ট করলো। কিন্তু কেন? স্কুল-মাস্টারি করে টাকাকড়ি কম রোজগার করেও তো মানুষ বাঁচে। আমরাও সোনার চামচ মুখে নিয়ে কেউ জন্মাইনি তৃপ্তি। কিন্তু ওই ইডিঅটটা সবকিছুকে চুলচেরা বিচার করবে, তর্ক করবে কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, ও'ভাবে বাঁচার চাইতে লড়াই ক'রে

হেরে যাওয়ারও একটা দাম আছে। মদ খেয়ে লিভার পচাচ্ছে, স্বাস্থ্যটা তো একেবারে গেছে। এর ওপর বাজে পাড়ায়—বাজে সব নেশায় মেতে একটা কুৎসিত জীবনযাপন করছে। ওর মরতে আর বেশি দেরি নেই তৃপ্তি। শ্লো-পয়জনের কাজ সুরু হয়েছে এ'বার।'

'কল্যাণ—' ধবাগলায় হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে উঠলো তৃপ্তি।

'জানি, এসব কথা ভালো লাগবে না তোমার। তুমি অমিতকে ভালোবাস—' কল্যাণ অনুত্তেজিত, শান্ত, গম্ভীর—'কিন্তু তোমরা, তোমরা মেয়েরা শুধু ভালোবাসতেই জানো। ভালোবেসে বুঁদ হতে পারো কিন্তু কখনও আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ভালোবাসা ব্যাপারটাকে যাচিয়ে দেখতে পারো না। ঠিক মাতালদের মতো। নেশায় চুর্ হলে তখন তাকে যা দেওয়া যায় তাই গ্লাসে-গ্লাসে গেলে। ভেবেও দ্যাখে না ওটা কি—মদ না জল। কাকে ভালোবাসছো তুমি। আগে সেই মানুষটাকে দ্যাখো। দেখে চেনো—'

ক্ষোভে, অপমানে শিরায়-শিরায় জ্বলে উঠলো তৃপ্তি। ঝাঁঝিয়ে উঠলো তীব্রভাবে—'কী, কি বলতে চাও তুমি। স্পষ্ট করে বলো।'

'কী কথা?'

'অমিতকে ভালোবাসি, ও আমার বন্ধু—'

'হ্যাঁ, ধরো ওই বন্ধুত্বেরই ভালোবাসা—কল্যাণ আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—'জানি, তুমি এ'সব সইতে পারবে না। কিন্তু অমিতকে তোমার মতোই অনেকদিন থেকে চিনি। এতোদিনের মধ্যে তোমাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে না পারলেও অমিতকে হয়তো বুঝেছি। ওটা আমার পক্ষে অনেক সহজ। বই-এ পড়া এসব ফরাসী বোহেমিআনিজম্ আমাদের দেশে এখনও বেখাপ্পা তৃপ্তি। ও'সব আমার মেজাজে পোষায় না। 'ফ্রাস্ট্রেশান' আমাদের দেশে আছে, অন্তত তার কারণগুলো যে পুরোমাত্রায় আছে, আমি মানি। কিন্তু সেটা এখনও এমন কোনো জায়গায় এসে পৌঁছোয়নি যাকে

একটা সামাজিক সমস্যা ব'লে মনে করে খুব মাথা ঘামাতে পারি। এমন কি অমিতকে সামনে দেখেও আমি এ'কথা বিশ্বাস করি। ও ঠিকই বাঁচতে পারতো। ও'ভাবে নষ্ট না হ'লেও ওর ক্ষতি হতো না। যদি—'

'থাক'— আচমকা কথা থামিয়ে দিয়ে ফিরে তাকালো তৃপ্তি। তাকালো না কল্যানের দিকে, তাকালো না কোনোদিকে। সোজা গিয়ে আল্‌নার সামনে দাঁড়ালো। একটা তীব্র প্রতিবাদ যেন গুমরে গুমরে উঠছে বুকের ভিতর। কিছুতেই ফেটে পড়তে পারছে না। নইলে আজ কল্যাণের মুখোমুখি দাঁড়াবার ইচ্ছা ওর প্রবল। স্বামীর মুখোমুখি। ছিঃ, ছিঃ, কারণে হোক, অকারণে হোক স্বামীকে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া আল্‌না থেকে টেনে নিতে গিয়ে আলনা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো তৃপ্তি। দাঁতে ঠোঁট চেপে, শক্ত হয়ে। একটা কান্না, চীৎকারে ফেটে পড়া একটা আর্তনাদ ঠেলে উঠতে চাইছে। অনেক দেখে আমিও তো জীবনকে চিনতে শিখেছি, আমিও তেঁতো স্বাদ পেলাম বাঁচার। কিন্তু ওর আদর্শ কি এতো মহৎ? এতোটা উদ্যম আর প্রেরণা পাওয়া যায় আদর্শের কাছে? এই কি সেই কল্যাণ! যার মধ্যে আদর্শ স্বামী হ'বার যোগ্য পুরুষকে দেখেছিলাম একদিন। বন্ধু হয়েও যে মানুষ স্বামী হবে স্বামী হয়েও বন্ধু। কিন্তু—

আলোটা জ্বাললো তৃপ্তি। আলোয় আলোয় ভ'রে গেলো ঘর। কিন্তু কল্যাণ নেই। বোধহয় বাইরে গেছে। বারান্দায়। রাস্তার ভিড় কমেছে, গুঞ্জন আছে। সে'দিকে তাকিয়ে হয়তো ভাবছে—কি ভাবে, খুব ফলাও করে 'বক্স-নিউজ' ছাপা যায় কাল— 'যুবতীর আত্মহত্যা'।

নিধুর-মা ঘরে এসে ঢুকলো—'কি গো মা, বিকেলে মাংস হ'বে নাকি বলো। দুপুরে বাবু বলছিলেন।'

'বাবুকে জিজ্ঞেস করো। আমাকে কেন—'নিধুর-মাকে ধাবড়ে

দিয়ে শায়া-ব্লাউজ-শাড়ি বেছে-বেছে হ্যাচ্‌কা টানে-টেনে নিতে গিয়ে কিছু ফেললো। কিছু পড়লো না, ঝুলে রইলো। তারপর দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

আঠারো

জুপিটার লজের দশ নম্বর ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। প্রচুর সময় আর যথেষ্ট ঝক্কি সহ্য ক'রে এতোদূর আসার পর সত্যি হতাশ হলো কল্যাণ। তালাটা নাড়াচাড়া ক'রে এদিক-ওদিক তাকালো। ঘরে তালা এঁটে এরা বাথরুমে যায় কিংবা অন্য কোনো ঘরে কিংবা নীচে কোনো রেস্তোরাঁয়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন হাতের সিগারেট ফুরিয়ে এলো, তখন ধৈর্য রইলো না। নেমে এলো নীচে।

সদর দরজার সামনে একেবারে মুখোমুখি থমকে দাঁড়াতে হলো। চমকে উঠলো দুজনেই।

তৃপ্তি নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালো দরজার একপাশে। কল্যাণ ফটক পেরিয়ে বাইরে এসে বললো—'কোথায় যাচ্ছো, অমিত নেই।'

তৃপ্তি সাড়া দিলো না। দাঁড়িয়ে রইলো।

'তুমি কি থাকবে নাকি এখানে? অপেক্ষা করবে?'

তৃপ্তি ফিরে এলো। রাস্তায় নামলো। পাশাপাশি হাঁটলো দুজন। অনেকটা পথ। চুপচাপ। হ্যারিসন রোড ধ'রে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মোড়ে এসে কল্যাণ স্ত্রীর দিকে তাকালো—'আমি অমিতের আস্তানার খবর জানি। যাবে আমার সঙ্গে?'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালো তৃপ্তি। কথাটার স্পষ্ট অর্থ ওর জানা দরকার—'যেতে পারি। তোমার সঙ্গে যেতে আর আপত্তি কি।'

'ওটা লোকেনের মেস। তাসের আড্ডা। তাস মানে জুয়ার তাস।'
'তোমার স্ত্রীর সম্মান রাখার বেশ কিছুটা দায়িত্ব তোমার নিজের। তুমি যদি নিয়ে যেতে চাও তবে চলো—'
'চলো।'
'থাক্, তুমি তোমার স্ত্রীর সম্মান রাখতে না পারো, আমি আমার নিজের মান রাখবো। লোকেন! সেই তোমাদের অসভ্য—'
বলতে পারলো না তৃপ্তি। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ তেজে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেলো। একবার পিছন ফিরে স্বামীর দিকে ফিরে তাকালো শুধু —'তুমি যেখানে খুশি যাও। আমি চললাম। আমারও অনেক বন্ধু আছে।'
তৃপ্তি বাসে উঠলো। একটু পরে উল্টোদিকের বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়ালো কল্যাণ। যেতে হবে অনেকদূর।
পার্ক-সার্কাসের এক গলির ভিতর ওদের আস্তানা। লোকেনদের মেস। সারা সপ্তাহে যে যার কাজে ছড়িয়ে থাকে। শুধু রবিবার সন্ধ্যায় সবাই মিলে এক জায়গায় মেলে, এক হয়। নেশার টানে আসে, নেশার ঘোর কেটে যাবার আগেই রাত গাঢ় হয়, শেষ ট্রামে যে-যার আস্তানায় ফিরে যায়। ট্রামের সিটে ব'সে সেকথাই ভাবে কল্যাণ। ভেবে অবাক হয়। একদিন ওরা বন্ধু ছিলো সবাই। ছিলো না, হয়তো এখনও আছে। তবে আগের মতো ঘনিষ্ঠ নয়। জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিকে, সহজ সুরকে কেমন যেন এলোমেলো ক'রে দিয়েছে সবাই। ছাত্রজীবনে যারা একদিন দুহাত তুলে উল্লাসে মেতেছে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে গোটা কলেজ তোলপাড় করেছে তারাই যেন থিতিয়ে গেছে, অসময়ে বুড়িয়েছে। সেই বন্ধুত্বের, সেই একাত্মতার ছিঁটেফোঁটাও আজ আর অবশিষ্ট নেই। সেখানেই সুর মেলাতে পারেনি কল্যাণ। গায়কের গলার সঙ্গে সারেঙ্গি আর তবলার সুর এক সময় মেলে কিন্তু কল্যাণের সঙ্গে মিললো না কোনোদিন। না মিললো বন্ধুদের সঙ্গে, না তৃপ্তির

সঙ্গে। তৃপ্তির সঙ্গে! কল্যাণ ভাবলো। বিবেচনা ক'রে দেখতে চাইলো, এতোদূর চিন্তা করা উচিত হবে কিনা।

নিজেকে নিরাপদ ভেবে যেখানে বসেছিলো কল্যাণ, জানতো না, সেটা লেডিজ সিট। একটি মেয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে ওর আসন টললো। অল্প বয়সের একটি মেয়ে। যুবতী। হয়তো কলেজ থেকে ফিরছে। ট্রামের রড ধ'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কল্যাণ দেখলো—ও একা নয়, ওরা দু'জন। আরেকটি ছেলে। যুবক। হাতে খাতা। মেয়েটির পাশে বসতে গিয়ে যুবকটি হাসলো। মেয়েটিও উত্তরে হাসলো একটু। হেসে জানালায় মুখ বাড়ালো। কল্যাণ দেখলো। বেশি ক'রে দেখলো ছেলেটিকে। একটু পরে পরেই চোখ পড়লো ওদের উপর। প্রতিবারই মনে হলো, ছেলেটি হাসছে, মেয়েটির চোখে-মুখে তৃপ্তি।

ঘরে সকলেই ছিলো। কড়া-নাড়ার পর দরজা খুললো প্রেমাংশু পালিত। কল্যাণকে ঘরে ঢুকতে দেখে হৈ-হৈ ক'রে উঠলো সবাই। অভ্যর্থনার আতিশয্যে মনে হলো, কল্যাণ অপ্রত্যাশিত এখানে। অমিত তাস শাফ্‌ল করছিলো। একবার চোখ উঁচু ক'রে তাকালো শুধু। বললো না কিছুই।

সুনীল তো সোজাসুজিই বলে বসলো—'কিরে, শরৎচন্দ্রের ছা-পোষা নায়ক। জোলার ডেনে যে হঠাৎ?'

'তৃপ্তি ঘরে ঢুকতে দেবে?' বিনোদের ঠাট্টা আরও মর্মান্তিক।

কল্যাণ হাসলো। কিছুক্ষণ মাত্র। তাস বিলোনোর পর যে-যার বোর্ডের উপর ঝুঁকে পড়লো। সবাই অনায়াসে ভুলে যেতে পারলো কল্যাণের উপস্থিতির কথা। তক্তপোষ থেকে দূরে একটা ট্রাঙ্কের উপর এসে কল্যাণ বসলো। একটা নোংরা লুঙ্গি ছিলো। সরিয়ে দিলো বাঁ-হাতের দু-আঙুলে।

বিনোদ আর রমেনের মাঝখান দিয়ে ওদের বোর্ডের কিছুটা অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। অমিতেরও আধখানা চোখে পড়ে। একের পর

একসঙ্গে কয়েকখানা দশ-নয়া পয়সা ঝলসে উঠলো। তারপর পয়সার উপর পয়সা পড়তে লাগলো। কখনও শব্দ হলো, কখনও হলো না। উৎকণ্ঠা তীব্র হলো, ক্লাইম্যাক্স বাড়লো একটু একটু ক'রে।

'ব্লাইণ্ড খেলিসনে নিমু। আজ তোর লাক্ খারাপ।'

নিমাই হাসলো।

গুনগুন করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা কলি ভেজে বোর্ডে চাপড় মেরে পয়সা ফেললো লোকেন—'স-স্-স্-সালা—'

'খুব খুশি?' প্রেমাংশু বললো—'ওয়েট ফর দা নেক্সট্।'

রমেন একটি-একটি ক'রে তাস তুলে নিলো। কার উদ্দেশ্যে কপাল ঠুকলো বারবার তা ও-ই জানে। প্রত্যেকবারই কপাল কোঁচকোলো। মুহূর্তের মধ্যে সবাই স্তব্ধ বোবা, একটা রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা কয়েক সেকেণ্ড।

অমিত ঘামছে। কী যেন ভাবছে একমনে। উপুড় হয়ে থুত্‌নিতে হাত ঠেকিয়ে কী যেন ভাবছে। কপালে চিন্তার বলিরেখা। আরও এক পশলা পয়সা পড়লো। শব্দ হলো। উদগ্রীব চাউনি আছড়ে পড়লো, উত্তপ্ত উদ্বেগ। সবাই যেন মৃত্যুর শ্বাস ফেলতে দেখছে কোনো রোগীর।

'কী করছিস্, করছিস্ কী অমিত। অতো ডেস্‌পারেট্ হোসনি।' কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো।

খেলতে জানে না কল্যাণ। কিন্তু ওদের চাপা উত্তেজনা ওকেও কেমন যেন উতলা ক'রে তুললো। ওরা সিগারেট ফুঁকছে। শস্তা সিগারেট। ছোটো একটা বদ্ধ গুমোট ঘরে এতো ধোঁয়া, এতো নিঃশ্বাস, এতো উত্তেজনা। কল্যাণ হাঁপিয়ে উঠলো। নিজেও একটা সিগারেট ধরালো। ওদিকে নড়বড়ে টেবিলের উপর গোটাকতক বই। বইগুলো গৃহকর্তা রমেন বা লোকেনের নয়, অতিথিদের। সঙ্গে নিয়ে এসেছে, সঙ্গে নিয়ে যাবে। আস্তে-আস্তে সেদিকে উঠে গেলো। নেড়েচেড়ে বইগুলো রেখে কল্যাণ তাকালো মানুষগুলোর

দিকে। আপাতত এই সময়ের জন্য ওরা সব ভুলে গেছে। বই-পত্রে যা পড়েছে। নিজেদের মাথায় যেসব চিন্তা অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে—তাও। এখন কিসের নেশায় ওরা বুঁদ হয়ে আছে। শুধু দশ-নয়া পয়সার বোর্ড-মনি নিয়ে নয়, গোটা জীবন নিয়ে ওদের বাজি। প্রতিমুহূর্তে সেই বাজি ওরা খেলছে। প্রায় সবাই কেরানি। নামমাত্র মাইনের সামান্য চাকরি অমিতের, স্কুল-মাস্টার নিমাই চন্দ, সরকারি অফিসের কেরানি রমেন-লোকেন, বেসরকারি অফিসে চাকরি করে সুনীল-বিনোদ, মফস্বল কলেজে অধ্যাপনা করে প্রেমাংশু। ছুটিতে এসেছে। কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলো কল্যাণ। এতোগুলো বন্ধুর কাছে-কাছে থেকেও একটু আলাদা, নিঃসঙ্গ মনে হলো নিজেকে। ওদের সঙ্গে মিশে থাকার বিদ্যে জানা নেই। কিন্তু আলাদা থেকে সময় কাটাবার পথটুকুও বন্ধ। রমেন আর লোকেনের ঘর এটা। দুটো তক্তপোষ এক ক'রে ওরা খেলছে। নইলে একটু গড়িয়ে নেওয়া যেতো। কিন্তু তাও কি পারতাম? কল্যাণ মনে-মনে চিন্তা করলো। যা গরম। দম বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ ওরা নির্বিকার। উৎসাহে টগবগ করছে। কেউ লক্ষ্যই করছে না—একটা মানুষ একা-একা ঘুরঘুর করছে ওদের চারপাশে। সবাই উদাসীন।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো হঠাৎ। বিশ্রীভাবে কানে লাগলো শব্দটা। খিস্তি। কল্যাণ নাড়া খেয়ে স'রে এলো। এগিয়ে গেলো জানলার দিকে। সারা ঘরে দুটো পাশাপাশি জানলা। মাত্র দেড়ফুট তফাতে একটা তিন-তলা বাড়ির দেয়াল। এ জানলায় না আসে বাতাস, না আলো, না অন্ধকার। অন্ধকার এ ঘরে আপনি জন্ম নেয়।

সামনে একটা পুরোনো ক্যালেণ্ডার। বছর তিনেকের পুরোনো। মাস আর সপ্তাহের সব হিসেবই মিটে গেছে ওর। ড্যাম্পে-ভেজা মাকড়সার জাল-জড়ানো, ছেঁড়া-খোড়া ছবিটার আধখানা আজও

আছে। অর্ধেকেই চেনা যায়—রবীন্দ্রনাথ। তাকিয়ে রইলো কল্যাণ। তাকালো দলা-পাকানো মানুষগুলোর দিকে। লোকেনের দিকে। এ ঘর লোকেনের। অথচ এই লোকেনই একদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতো। শুধু রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখতো একদিন। কিন্তু—

একটা উচ্চকিত শব্দে চমকে উঠতে হলো। কল্যাণ ফিরে তাকালো। সবাই মিলে জড়িয়ে ধরেছে অমিতকে। অমিত আত্মপ্রসাদে একটা সিগারেট তুলে নিলো প্যাকেট থেকে। রোদে শুকোতে দেওয়া ডাল জড়ো করার মতো স্তূপাকার পয়সাগুলো দু'হাতের আঁজলা দিয়ে অমিতের কোলের কাছে ঠেলে দিতে-দিতে প্রেমাংশু বললো—'ব্র্যাভো ব্রাদার, ব্র্যাভো। চোখ বুজে খেলে যা। ইট ইজ্ এ ডে ফর ইউ। কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলি বল তো।'

আবার ওরা নতুন ক'রে জাঁকিয়ে বসলো। নতুন ডিল শুরু হবে। কিন্তু হাঁপিয়ে উঠলো কল্যাণ। এবার ও পালাতে চায়। এখানে কিছুক্ষণ থাকলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে নির্ঘাৎ। কখন ওদের খেলা ভাঙবে তা ওরাও জানে না। কিন্তু তার আগেই খোলা-হাওয়া পেতে হবে।

কল্যাণ দরজার দিকে এগোলো। সন্তর্পণে ছিট্‌কিনি খুলে পিছনে তাকালো। নতুন তাস বিলোনো দেখতে-দেখতে ওকে লক্ষ্য করলো না কেউ। চোরের মতো নয়, সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে এলো বাইরে। নিরাপদেই নেমে এসেছিলো একতলায়। কিন্তু সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই পিছন থেকে ডাক এলো—'কল্যাণ, কল্যাণ, শোন। আরে যাচ্ছিস্ কোথায়?'

কল্যাণ থমকে দাঁড়ালো।

'কিরে, চ'লে যাচ্ছিস?'

'কী করবো বসে থেকে?'

'বেশ, একটা কথা রাখবি। সত্যি বলছি, মাত্র সাতদিনের জন্যে। আসছে সপ্তাহেই দিয়ে দেবো।'

'কি?'

'গোটা পাঁচেক টাকা। বিশেষ দরকার।'

'টাকা? টাকা দিয়ে কি হবে? তুই না খেলছিলি?'

'আবার খেলবো।'

বন্ধুর দিকে তাকালো কল্যাণ। লক্ষ্য করলো। ছি, কী কুৎসিত চেহারা হয়েছে রমেনের। ব্রণে ভরে গেছে সারা মুখ, চেহারা চাষাড়ে হয়ে উঠেছে। বললো—'অতো টাকা তো আমার সঙ্গে নেই।'

'বেশ, যা পারিস দে। দুই, তিন, সাড়ে তিন—'

তিনটে টাকাই পকেটে আছে আর কিছু খুচরো। কল্যাণ সচেতন। এক টাকার একটা নোট আর কিছু খুচরো রমেনেব হাতে দিয়ে কল্যাণ হাঁটতে শুরু করলো। টাকাটা হাতে নিয়ে কৃতার্থেব হাসি হাসলো বমেন—'ডোণ্ট মাইণ্ড। দিয়ে দেবো। ম্যাক্সিমাম্ সাতদিন।'

দূর থেকে ঘাড় ফিরিয়ে কল্যাণ শুধু একটু হেসে বোঝালো—সে কথাগুলো শুনেছে। তারপর হাঁটতে লাগলো। অনেকক্ষণ হেঁটে এসে আলো-ঝলমল একটা রাস্তায় পড়লো। ভালো লাগলো হাঁটতে। দূরের একটা বাড়ি আলোয়-আলোয় সাজানো। সামনে রসুনচৌকি। সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। সে-পথেই এগোলো।

উনিশ

সেইরাতে একটা স্বপ্ন দেখলো তৃপ্তি।

একটা পাহাড়। অরণ্য নেই, বনস্পতি নেই। কচি নরম সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা এক বিরাট পাহাড়। উপরে বিস্তীর্ণ আকাশ। লোকালয়হীন নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে আছে তৃপ্তি। বাতাসের একটানা শব্দ দিগন্তেব অটল মৌনকে আরও গভীব, আরও তীব্র ক'রে নিঃস্তব্ধতা ছড়িয়ে দিচ্ছে দূরে, দূবে, বহুদূরে। তৃপ্তি শুয়ে আছে। একা। একটি কোমল শিশু হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এলো শরীব বেয়ে। তৃপ্তিব চোখ বুজে এলো, সাবা শরীরে রোমাঞ্চ লাগলো, শিরায়-শিরায় বক্তে উত্তাপ স্পর্শ কবলো। সেই শিশু ধীরে-ধীরে উঠে এলো, আরও উপরে, আবও উর্ধ্বে, বুকে। তৃপ্তির নারীবক্ষের কোমলতাকে সে স্পর্শ করলো। ছোটো কচি হাতে অধিকারের দাবিতে থাবা ফেললো। কিন্তু তৃপ্তির অক্ষম বুক তাকে খুশি করতে পারলো না। প্রবল আক্রোশে সেই শিশু হিংস্র হলো। তার তীক্ষ্ণ আঁচড়ে তৃপ্তি বেদনায়-ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো। আর তখনই ছুটে এলো একটা শকুন। শিশুটিকে ঠুকরে ঠুকরে খেতে লাগলো। ফিনকি দেওয়া রক্তে ভেসে গেলো তৃপ্তির দেহ। তৃপ্তি ভয় পেলো। সেই বিশাল পাখির ছায়ার নীচে শিশুকে আর দেখতে পেলো না। অক্ষম হাতে বাধা দিতে গিয়ে দেখলো সে বন্দী। দু'হাতে শক্ত শিকল। আর তখনই একটা শীর্ণ, অপুষ্ট, কালো রোমশ হাত এসে শকুনের গলা টিপে ধরলো। তৃপ্তি অবাক হলো দেখে, একটি দুর্বল ক্ষীণকায় পুরুষ কিন্তু প্রচণ্ড তার শক্তি। শকুনের সেই ভয়ঙ্কর আর ভয়াল চোখের দৃষ্টিকে অস্বীকার ক'রে সেই প্রবল

ডানা-ঝাপটানির শব্দকে আস্তে-আস্তে কাবু ক'রে এনে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিলো। আর অদ্ভুত! সেই মানুষ, শকুনের মাংস খেতে লাগলো। সেই বিরাট ক্ষুধার মূর্তি দেখে ভয়ে, ঘৃণায়, বিদ্বেষে আর্তনাদ করতে পারলো না তৃপ্তি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে এলো, খিদে পেলো। দুটো চোখের মণিতে যেন আগুনের হল্‌কা হ'য়ে গেলো, যখন মানুষটিকে দেখলো, দেখে চিনতে পারলো। সমস্ত শক্তি এক ক'রে মোচড় দিলো শরীরে। হাতের শিকল ভাঙলো। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতেই অমিত কল্যাণ হয়ে গেলো। কল্যাণ প্রশান্ত, সুন্দর, ভদ্র। আশ্লেষে জড়িয়ে ধ'রে কল্যাণ ঋষির মতো হাসছে। আর পাহাড় সমুদ্র হলো, সমুদ্র মাঠ। মাঠের উপর একা দাঁড়িয়ে তৃপ্তির বুকের শিশু নিয়ে খেলছে অমিত। ওরা শিশুর মতো হাসছে।

ঘুম ভেঙে গেলো। অন্ধকার, সেই দুঃস্বপ্নের শকুনের ডানার মতো কালো, ভয়াল আর বীভৎস অন্ধকার সারাঘরে ছড়ানো। স্বপ্নের শেষেও কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলো তৃপ্তি। বিশ্বাসই করতে পারলো না—এস্বপ্ন, সত্য নয়। একটু কাত্ হয়ে পাশ ফিরতেই কল্যাণের গায়ে গা ঠেকলো। কল্যাণ ঘুমোচ্ছে, অঘোরে বেহুঁশের মতো প'ড়ে আছে। নিশ্চিন্ত, নির্বিকার। তৃপ্তি স্বপ্নের কল্যাণকে স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে আনতে চেষ্টা করলো। সেই হাস্যময়, সম্ভ্রান্ত ভদ্র মানুষটি। তৃপ্তির ভয় করলো না, এই দুঃস্বপ্নের রাতে তাকেই যেন নিরাপদ আশ্রয় মনে হলো। স্বামীর স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলো না, ছোঁয়াটুকু বাঁচিয়ে রেখে যেন সাহস কুড়োলো। মনে পড়লো অমিতকে, সেই স্বপ্নের অমিত। ক্ষুধার্ত পশুর মতো হিংস্র শক্তি নিয়ে যে শকুনের সঙ্গে লড়াই করেছে, গল্পে শোনা রাক্ষসের মতো পরম আত্মপ্রসাদে শকুনের মাংস ছিঁড়ে খেয়েছে। হাতে মুখে কাঁচা রক্ত। কুৎসিত, জঘন্য। আবার গা ঘুলিয়ে উঠলো।

ঘৃণায় বমি পেলো, একটা অম্ল ঝাঁজ কণ্ঠনালী কামড়ে ধরলো হঠাৎ। তৃপ্তি ওর বুকের যন্ত্রণাটা অনুভব করতে চাইলো। সেই শিশুর তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে যে বুক জ্বালায়-বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু শাড়ি-ব্লাউজ-ব্রেসিয়রের নীচে সেই সঙ্গোপনে লুকোনো নারীত্ব যে এতোটুকুও আঘাত পায়নি এই ভেবে আশ্বস্ত হলো আবার। আস্তে আস্তে বাস্তবকে বুঝে নিতে চাইলো এবং সান্ত্বনা পেলো। কিছুই সত্য নয়—স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নের তৃষ্ণা মিথ্যে নয়। তৃষ্ণা আর ভয়। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেলো তার।

কিন্তু এক গ্লাস জল পেতে হলে এবার উঠতে হবে। সামনে অন্ধকার। তৃপ্তি সাহস পেলো না। মনে হলো, ভীষণ ঘেমে উঠেছে ও। গরম লাগছে। কিন্তু এতো গরম লাগবে কেন! তৃপ্তি কান পাতলো বাইরের দিকে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। বিকেলে মেঘ করেছিলো, বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিলো তখন। এখন আষাঢ়ের শেষ। মনে পড়লো, এমন বাদলা দিনে শুধু শুয়ে থাকতে চায় মানুষ, ঘুমোতে ভালো লাগে। কিন্তু আমি কেন এস্বপ্ন দেখলাম? কী অর্থ এই স্বপ্নের?

আজ বিকেলে বিলাসবাবুর মেয়েটি আত্মহত্যা ক'রে মরেছে। দুঃস্বপ্নের রাতের অন্ধকারে তৃপ্তি সেই মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলো। আবার ভয় পেলো। নিজহাতে নিজেকে হত্যা করে মানুষ! স্বামীর বক্ষলগ্ন হয়ে নিরাপদ-শয্যায় শুয়ে তৃপ্তি মেয়েটিকে বুঝতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কেন! সে কি ওর আনন্দের জন্য, ওর সুখের প্রত্যাশায়। ম'রে সুখ? তখন মেঘ জমেনি আকাশে, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি তখনও। মেয়েটি যদি দেখে যেতো এই মেঘের আকাশ, যদি বুঝতে পারতো বৃষ্টি হবে আজ রাতে, তবে এই বাদলা দিনে পৃথিবীতে থেকে অন্তত আরও একটি রাত আরামে ঘুমোবার লোভে আজ কি ওর মৃত্যুর দিনটা স্থগিত রাখতো না?

ঠিক এমনি ক'রে অমিত একদিন মরতে চেয়েছিলো। সেকথা মনে পড়তেই তৃষ্ণা তীব্রতর হলো। আরও বেশি ঘেমে উঠলো তৃপ্তি। অসহ্য গরমে শরীর ভিজে উঠছে। বুক থেকে শাড়িটা সরিয়ে দিলো। অন্ধকারের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া যায়। লজ্জা নেই কল্যাণের কাছেও। তৃপ্তি ওর ব্লাউজটাও শরীর থেকে খুলে ফেললো। উঠে বসলো খাটের উপর। কল্যাণ ঘুমুচ্ছে। যদি ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালে আর যদি এলোচুল পিঠে-ছড়ানো অর্ধনগ্ন এ অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলে কি ভাববে কল্যাণ; কিছুই ভাববে না। ভাববার কিছু নেই। এই অন্ধকারে অন্য কোনো তৃতীয় অস্তিত্ব অসম্ভব।

তৃপ্তির ইচ্ছা হলো, দরজা খুলে বাইরে যায়, বৃষ্টি দ্যাখে। রাতের শহর, জনহীন পথ, নিশুতি স্তব্ধতা। তার মধ্যে বৃষ্টির একটানা ঝিমঝিম ভালো লাগবে দেখতে, শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।

কিন্তু খাট থেকে নামতে গিয়ে কাকে যেন দেখলো তৃপ্তি। কার অস্পষ্ট ছায়া অন্ধকারে নিঃশব্দে হাঁটছে। কে? মেঝে থেকে পা তুলে নিয়ে আবার উঠে বসলো। কল্যাণকে ছুঁয়ে রইলো। বুক কাঁপছে। তৃষ্ণার্ত গলায় বারকয়েক ঢোঁক গিলে তাকিয়ে রইলো। অপেক্ষা করলো। সাহস কুড়োলো একটু একটু ক'রে। অনেক প্রতীক্ষার পরও নতুন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না ক'রে আবার যেন নিজের মধ্যে ফিরে এলো। কিন্তু নতুন ক'রে পা ফেলতে চাইলো না মেঝেয়। তৃষ্ণা রইলো। তৃষ্ণাকে বুকে চেপে ব'সে রইলো চুপচাপ। তাকিয়ে রইলো অন্ধকারের মুখোমুখি।

কিন্তু এ অন্ধকারকে যতোই অস্বীকার করতে চাই, কিছুই ভাববো না ব'লে মনকে যতোই শক্ত ক'রে বাঁধতে চেষ্টা করি, এ ভীতিকর কুটিল অন্ধকার ততোই যেন গাঢ় ঘন হয়ে হিংস্র নেকড়ের মতো এগিয়ে আসে, গ্রাস করতে চায়। যদি ঘুমোনো যেতো তবে ঘুমের মধ্যেই এ দুঃস্বপ্নের রাতকে ভুলে যাওয়া যেতো। কিন্তু ঘুম নেই। বারবার

মনে হয় কোনো এক প্রেতাত্মার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ঘরে। তৃপ্তি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ফিরে-ফিরে মনে প'ড়ে যাচ্ছে সেই দুঃস্বপ্নের ছবি। ঘুরে-ঘুরে ফিরে আসছে বিলাসবাবুর মেয়ে, নানা ভাবে, নানা মূর্তিতে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে অমিত।

অপমৃত্যু, অপমৃত্যুর ছায়া। দম বন্ধ হয়ে এলো। নিরুপায় হয়ে আবার গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। চিৎ হয়ে শুলে অন্ধকার, তৃপ্তি কাৎ হলো—তবু অন্ধকার বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুলো। তবু নিস্তার নেই। ছট্‌ফট্‌ করলো, ক্লান্ত হয়ে উঠলো। কতোদিন দেখিনি অমিতকে? অনেকদিন। মেয়েটিকে কালও দেখেছি। সেই মেয়েটি অনায়াসে, বিনা-দ্বিধায় প্রাণ নিয়ে এমন একটা মারাত্মক খেলা খেলতে পারলো! কিন্তু অমিত? ব.৩া সাহস কুড়িয়ে আজ গিয়েছিলাম ওব কাছে। জানতাম, অপমানিত হবো, লাঞ্ছিত হবো। তবু থাকতে পাবিনি। মেয়েটির মৃত্যু আমায় যেন টেনে নিলো সেই দিকে! দেখা পাইনি। যদি পেতাম। দেখতাম। মিথ্যে একটা অভিমান নিয়ে ওকে অবজ্ঞা করেছি, ওকে ভুলতে পারবো বলে একটা মিথ্যে অহঙ্কারে নিজেকে পীড়ন করেছি। তৃপ্তি অস্থির হয়ে উঠলো। অন্ধকাবের আতঙ্ক ওকে আরও, আরও বেশি ক'রে উত্ত্যক্ত ক'রে তুললো। সইতে পারলো না। একটা অচেনা, অজানা সন্ত্রাসে কেঁপে কেঁপে উঠলো বারবার। তীব্র উন্মাদনায় সমস্ত শরীর নিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলো, স্বামীর বুকে মাথা রেখে দুহাতে সজোরে চেপে ধ'রে মুখ ঘষতে লাগলো। যেন এই স্পর্শের উত্তাপ ওকে অন্ধকাবের রাহু থেকে উদ্ধার করবে, ওকে সাহস দেবে, শক্তি দেবে বাঁচবার।

ঘুম ভেঙেই আকুল হয়ে আত্মসমর্পিত স্ত্রীর শরীরের চাপ অনুভব করলো কল্যাণ। মনে মনে কৌতুক বোধ করলো। বিকেল থেকেই একটি কৃত্রিম কলহ, মনান্তর, দুজনকে সরিয়ে রেখেছে অনেকখানি।

কিন্তু শেষ এইখানে, এই বুকে। এখানেই একমাত্র আশ্রয়। পাশের বাড়িতে আত্মহত্যা। ভয় পেয়েছে তৃপ্তি। এতে যে-কোনো মেয়েই ভয় পাবে। কল্যাণ দুহাতে আগলে ধ'রে স্ত্রীকে আরও নিবিড় ক'রে বুকে টেনে নিলো। স্নেহশীল হয়ে হাত বুলোতে লাগলো স্ত্রীর অনাবৃত-প্রায় কোমল পিঠে। তৃপ্তি আরাম পেলো। গভীর স্বস্তিবোধ। স্বামীর শরীরে শরীর জড়িয়ে উত্তপ্ত রক্তের উষ্ণতায় দেহ-মন শিথিল হয়ে এলে একটা চাপাকান্না গুমরে উঠলো ভিতরে-ভিতরে। অমিতকে দেখবো আমি, যাবো ওর কাছে। অপমান আর লাঞ্ছনার মধ্যেও অমিতকে দেখতে চাই। নইলে স্বস্তি নেই আমার। অসহ্য এ আত্মপীড়ন। আমি সইতে পারবো না। স্বামীর কুশ-খোঁচা দাড়িতে নিজের মসৃণ গাল ঘ'ষে, স্বামীকে চুম্বনে আদর ক'রে তৃপ্তি ভাবলো। ভাবতে-ভাবতে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

মিলি[illegible]নের সুখের আবেশে, রোমাঞ্চে, উত্তেজনায়, সুখে, শিহরনে বিভোর হয়েও একটা ক্ষীণ পাপবোধ তৃপ্তিকে দংশন করলো। শরীর অবশ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ার আগেও অন্ধকারের পর্দা থেকে সরিয়ে নিতে পারলো না অমিতকে।

কুড়ি

চৌকাঠে পা দিয়েও শেষবারের মতো একবার চিন্তা করলো তৃপ্তি। দ্বিধা করলো। তারপর অসংখ্য সাহস সঞ্চয় ক'রে দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো ভিতরে।

আবার সেই আগোছালো নোংরা ঘর। অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশ সইতে পারে না তৃপ্তি। নিজের ঘরটা ঝকঝকে ক'রে রাখে, কুটোটা পর্যন্ত নাড়তে চায় না পরিপাটি নষ্ট হবে ভেবে। দুবেলা স্নান করে, পরিচ্ছন্ন শাড়ি-ব্লাউজ প'রে নিজেকেও চকচকে রাখতে চেষ্টা করে।

অথচ এ ঘরটা কী ভীষণ যত্নহীন, অপরিষ্কার। হাঁপ ধ'রে যায়। তবু আসতে ইচ্ছে করে। আসতে হয়।

গোটা তক্তপোষ জুড়ে, হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলো অমিত। গেঞ্জিটা ছেঁড়া-ছেঁড়া, লুঙ্গিটা উঠে এসেছে হাঁটুর উপর। শিয়রের কাছে একটা খোলা খাতা। কিছু বোধহয় লিখছিলো। লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কলমের ক্যাপ্‌টা পর্যন্ত বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

দরজা ভেজিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে অমিত। ভয় নেই, ভাবনা নেই। ঋষি-মানুষ। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু প্রমাদ গুনলো তৃপ্তি। কী করবো এখন? ফিরে যাবো? ফিরে যেতে আসিনি এখানে। একটু ভেবে পিছনের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। দু'পা এগোতেই ক্যাঁচ করে শব্দ হলো একটা। পায়ের তলায় থেত্‌লে মরে গেলো একটা আরশোলা। সেদিকে তাকাতেই গা-টা ঘিনঘিন ক'রে উঠলো। নাড়ি-ভুঁড়ি আর জলের মতো কিছুটা কষ মেঝের উপব ছড়িয়ে পড়েছে। পায়ের চটি জোড়া এককোণে সরিয়ে রেখে সেই নড়বড়ে টিনের চেয়ারে এসে বসলো তৃপ্তি। মরা-আরশোলাটা পিছনে রইলো। ওটা দেখতে হবে না আর।

ঠিক এমনি হয় এঘরে। নোংরামি আর অপরিচ্ছন্নতাকে পুষে রাখতে চাইলে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ঘরটা আরও কদাকার, কুৎসিত হয়ে ওঠে। কী বিশ্রী দেখাচ্ছিলো ওই আরশোলাটা। টেবিলের উপর হাতের ব্যাগটা রাখতে-রাখতে তৃপ্তি অমিতের দিকে তাকালো। এভাবে ঘুমোয় কেন অমিত? এমন বেহুঁশ হয়ে, এমন বিশ্রীভাবে? তৃপ্তি যা চায় না, যা ভালোবাসে না, এ ঘরের চারদিকে ঠিক তারই সমারোহ। ঠিক এসবই ঘটে আর ঘটবে। এখানে এলে মনে হয় এর সবটাই বদলাতে হবে, এমন কি এ ঘরের মালিক অমিতকেও। কিন্তু নিজের ঘর নিজ হাতে সাজিয়েছে

তৃপ্তি। এতো ক'রে সাজিয়েও মনে হয়, সুন্দর হয় না সব কিছু। ঠিক শাদা শাড়িতে পাকা রঙের কুচকুচে কালো দাগের মতো। হাজার চেষ্টাতেও যা ওঠে না। ধবধবে শাদার মধ্যে একবিন্দু কলঙ্কের মতো চিরদিন এঁটে থাকে।

এভাবে ব'সে থাকতে ভীষণ অস্বস্তিবোধ করলো তৃপ্তি। ঘুম-ভাঙার পর ওকে দেখলে অমিতের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং কী ব্যবহার তাকে পেতে হ'তে পারে সে সব কথা ভাবতে-ভাবতেই আরও কিছুটা সময় কাটিয়ে দিলো। টেবিলের উপর গোটাকয়েক বই পড়ে ছিলো, তৃপ্তি টেনে নিলো। নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। তাতেও আরও কতটা সময় কাটলো বোঝা গেলো না।

ঘুম থেকে জেগে আড়্মোড়া ভাঙতেই তৃপ্তিকে দেখতে পেলো অমিত। অবাক হলো না, ধড়্মড় ক'রে উঠেও বসলো না। ছোটো একটা হাই হাতেব মুঠোয় দমন করতে-করতে উঠে বসলো। পেটে লুঙ্গির গিঁটটা বাঁধতে-বাঁধতে মেঝের উপর উঠে দাঁড়ালো। ঘরে যে আরও একজন ভদ্রমহিলার অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেই অতিথির প্রতি কিঞ্চিৎ সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রকাশের ইচ্ছাও তার নেই। দড়িতে ঝোলানো গামছাটা টেনে নিয়ে সটান বেরিয়ে গেলো। তৃপ্তি আবার একা। অবজ্ঞা পেলেও আপাতত খুশি। প্রথম দর্শনেই যে ক্ষেপে ওঠেনি মানুষটা—অন্তত সেটুকুই লাভ। আরও একটু ধৈর্য ধরতে হবে। অনন্যমনস্কভাবে এতক্ষণ যে বইটির পাতা ওল্টাচ্ছিলো তৃপ্তি, জানতো না তার চরিত্র। অভ্যাসে পাতা নাড়ছিলো। মন দিয়ে যাচাই করতে গিয়ে বুঝলো—দুরূহ গ্রন্থ। ওটা রেখে অন্য একটা বই তুলে নিলো। বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিকের একটি উপন্যাস। শালীনতা-বর্জিত প্রচ্ছদ। কিন্তু খাঁটি সমজদারের মতো ছবিটার শিল্পগুণ যাচাই করতে বইটা সামনে তুলে ধরলো। মনে মনে একটা দার্শনিক স্তরেও পৌঁছোতে

চেষ্টা করলো। শ্লীলতাবোধ কতো আপেক্ষিক। 'ওদেশের শালীনতা আমাদের রক্ষণশীলতার কাছে কতো অশালীন। তৃপ্তি বইটির ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলো। পাতা ওল্টালো আপন মনে। ভালো লাগলো না। উঠে দাঁড়ালো। কী একটা লেখার জন্য তৈরি হচ্ছিলো অমিত। তৃপ্তি সামনে গিয়ে দেখলো, খাতার কাগজটা শাদা। কলমের খাপ বন্ধ না ক'রেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো। নিব্ থেকে কালি চুইয়ে-চুইয়ে বালিশের পাশের চাদরটুকু কালো করে ফেলেছে। তৃপ্তি কলমটা বন্ধ করলো। সেই ছেঁড়া তেল-চিটচিটে ময়লা বিছানাকেই একটু পরিপাটি করার চেষ্টা করলো। ঝোলানো দড়িতে জামা কাপড়গুলো সাজালো। পঁচিশদিন আগে একটা মাস ফুরিয়েছে। ক্যালেণ্ডার থেকে পুরোনো মাসের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে অমিতের জীবনের বদ্ধ সময়কে আরও কিছুটা এগিয়ে দিলো। সিগারেটের টুকরোয় আর ছাইয়ে, ধুলোয় আর জঞ্জালে মেঝেটা এমন হয়েছে যে চাকরকে না ডেকে উপায় নেই।

গামছা দিয়ে ভেজা-চুল মুছতে-মুছতে হুড়মুড় ক'রে ঢুকলো অমিত এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—'ছিঃ ছিঃ, এ আবার কখন হলো। নির্ঘাৎ ওই বনমালী। ব্যাটা তিড়িং-বিড়িং ক'রে লাফাবে, লম্ফ-ঝম্প করবে। একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে—'

তৃপ্তি দেখলো—সেই মরা আরশোলা। বললো—'যা তোমার ঘর তাতে ওটা ম'রে এমন কি আর বেশি নোংরা করেছে।'

'না, না, এসব দেখলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আমার ঘর নোংরা হোক, ডাস্টবিন হোক, সেখানে ডজন ডজন ইঁদুর আছে, হাজার হাজার টিকটিকি আছে, কোটি কোটি ছারপোকা আছে। কিন্তু মেঝের ওপর এরকম পোকা-মাকড় ম'রে থাকবে কেন?' বলতে বলতে নিজেই লাথি মেরে পা দিয়ে ঘষতে-ঘষতে পোকাটাকে ঘরের বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে অমিত নিজের জায়গায় ফিরলো—'দিচ্ছি

আজ ব্যাটার বজ্জাতি ভেঙে। ব্যাটা কথা বললে কথা শুনবে না।'
তৃপ্তি অমিতের মেজাজ দেখে আশ্বস্ত হলো। ঝড়-ঝাপ্টার ঝক্কিটা তাহলে বনমালীর উপর দিয়েই যাবে। অনাহুতভাবে ওর আবির্ভাবকে বোধহয় আজ আর অতোটা অসহ্য ব'লে মনে হচ্ছে না। তৃপ্তি আরও একটু মজা পেলো ভেবে ওরই একটা তৈরি করা অপরাধ নিরীহ চাকরটার উপর চালান হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত অমিতেব মুখে এমন কথাও শুনতে হলো—'আমার ঘর নোংরা হলো আর সেজন্য দায়ী আমি।'
'তোমার বনমালীকে ডাকোতো একটু।'
'কেন, এখন হবে না—' জানলার কপাটে গামছাটা জড়িয়ে রেখে অমিত ফিরে দাঁড়ালো।
'মেঝেটা একটু ঝাড় দেওয়াতে পারো না রোজ?'
'দূর, দূর, কী হবে ওসব ক'রে। যতো সব মেয়েলি ঝামেলা।'
'নিজের ঘর পরিষ্কার রাখবে, সেটাও মেয়েলি ঝামেলা। অদ্ভুত তোমাদের পৌরুষের অহঙ্কার। ডাকো না বনমালীকে। দেখি পুরুষরা কতোদূর পারে।'
'বনমালী নেই। ওকে তেলেভাজা, মুড়ি আনতে পাঠিয়েছি। বড্ডো খিদে পেয়েছে। সারাদিন খাইনি।'
'খাওনি? কেন?'
'কাল রাতে লোকেনদের মেসে ছিলাম। ঘুম থেকে উঠতে এতো দেরি হয়ে গেলো যে সেখান থেকেই দোকানে ছুটে গেছি। কিন্তু দুপুরে এমন একটা পেট ব্যথা শুরু হলো যে ফিরে এসেছি।'
'বাঃ এই বলছো, পেট-ব্যথা আর এই বলছো তেলেভাজা আনতে পাঠিয়েছ।'
'পেট ব্যথা তো প্রায়ই হয়। দুপুরে হয়, বিকেলে সেরে যায়। তাই বলে খিদে পেলে খাবো না?'
'দুপুরে হয়, বিকেলে সেরে যায়। আর বিকেলে ওসব খাবে,

রাত্তিরে প'ড়ে-প'ড়ে কাতরাবে—' অনুযোগের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ ফুটে উঠলো তৃপ্তির কথার ভঙ্গিতে—'কী হয়েছে তোমার ? পেট-ব্যথা হয় বলছো। ডাক্তার দেখাও না কেন ?'

'টাকা নেই।'

'সেজন্য শরীরটা নষ্ট করবে ?'

'নষ্ট হলে কী করবো ?'

'ইচ্ছে ক'রে অত্যাচার করবে ? কী হয় ও'সব ছাইভস্ম না খেলে ? দোকানে কী আর কিছু পাওয়া যায় না ?'

'পাওয়া যাবে না কেন। অনেক কিছুই পাওয়া যায় কিন্তু অল্প ক'টা টাকা পাই, ভালো জিনিস খেয়ে খরচ করলে চলবে কেন ?' নিস্পৃহ হয়ে বলতে-বলতে অমিত বিছানায় এসে বসলো।

'কি করবে বাকি টাকা দিয়ে ?'

'জুয়ো, মদ, আরও জঘন্য সব ব্যাপার। সেসবের জন্যে অনেক টাকার দরকার।' অমিত তৃপ্তির দিকে তাকালো।

তৃপ্তি শক্ত হয়ে উঠলো। গম্ভীর।

'আর কতক্ষণ ব'সে থাকতে চাও ?'

'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ অমিত।'

'অ্যাঁ—' অমিত প্রায় আঁৎকে উঠলো—'হঠাৎ ?'

'আজ তুমি আমাকে অনেকক্ষণ সহ্য করেছো। এতক্ষণ বাদে বললে।'

'আর সহ্য করতে পারছি না। এবার চ'লে গেলে খুশি হবো। অনুগ্রহ করবে কি ?'

তৃপ্তি কোমর থেকে রুমাল তুলে নিয়ে কপালে-মুখে ঘাম মুছলো—'একটা কথা শুধু তোমার কাছে জানবার ইচ্ছা। শেষ কথা।'

'হুঁ—' অমিত অনাসক্ত।

'আমার ওপর তোমার এতো রাগ কেন ? একদিন আমরা বন্ধু ছিলাম। পুরোনো কথা মনে পড়ে না তোমার ?'

'উঃ, অসহ্য। আবার সেই সেন্টিমেন্টাল্ ননসেন্স? এবার তুমি উঠবে?'

'উঠবো। কিন্তু বলো।'

'কি ফ্যাচ-ফ্যাচ করছো? রাগ করবো কেন?

'তবে?'

'ন্যাকামি ভালো লাগে না।'

'ন্যাকামি!'

'মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাই তো ন্যাকামি।'

'মেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখাই বুঝি পৌরুষ?'

'দূরে সরিয়ে রাখবো! পাগল নাকি। মেয়েমানুষ না হ'লে···'

'অমিত—' ক্রুদ্ধ আর্তনাদে ফেটে পড়লো তৃপ্তি। সঙ্গে-সঙ্গেই গলাটা নামিয়ে এনে লঘুস্বরে বললো—'সেদিনও তুমি হঠাৎ ঝোঁকে আমাকে বিশ্রীভাবে অপমান করেছিলে। হাতজোড় ক'রে অনুরোধ করছি আজ একটু সুস্থ থাকো, খুব বেশি কিছু না পারো, বন্ধু হিসেবে সম্মানটা রেখো—'

'কিন্তু সন্ধ্যা উৎরোলেই এ ঘরের পরিবেশ কুৎসিত হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু আমি তার আগেই চ'লে যাবো।'

'তোমাদের সন্ধ্যে ক'টায় হয়? ঘর কিন্তু এখনই অন্ধকার হয়ে আসছে। লোকেন, ওরা আসতে পারে এখ্খুনি।'

'সে কি?' তৃপ্তি চমকে উঠলো।

'হয়তো ওরা মাতাল হয়ে আসবে কিংবা মদের বোতল হাতে নিয়ে ঢুকবে।'

'না, আমি যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ যাও, ওতে তোমারও সতীত্ব রেহাই পাবে, কল্যাণও খুশি হবে।'

'কল্যাণ তোমাদের মতো অতো ছোটো নয় অমিত।'

'না, তা নয়। যাও, সেখানে গিয়ে সুখে ঘর-সংসার করো এই

মাতাল-লম্পটদের আড্ডায় এসো না। কল্যাণ চায় না তুমি এখানে আসো।' সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে অমিত অদ্ভুত ভাবে হাসলো।

'কল্যাণ কি চায়-না-চায় সেটা আমার কাছে বড়ো কথা নয়। আমার বন্ধুদের কাছে আমি আসি, আমাব নিজের দায়িত্বেই আসি। কল্যাণের খববদারিতে তা বন্ধ হবে না। কিন্তু সে ভদ্রলোক।'

'আর তোমার সতীত্ব ?'

'ওটা যখন আমার, আমি সেটা রক্ষা করতে পারবো।'

'কয়েকটা পাঁড় মাতালের হাতে ?'

'ওই বাজে কথাগুলো ব'লে তোমরা খুব সুখ পাও। না ?'

একটি সুবৃহৎ খুকির ছেলেমানুষিতে বেশ কৌতুক বোধ কবলো অমিত। তক্তপোষ থেকে উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো—'ঠিক তুমি যেমন তোমার স্বামী গর্বে আনন্দ পাও। কিন্তু জানো না তো, হি ইজ অ্যান ইউয়ট্, ইন্‌ভার্টিব্রেট।' ব'লেই অমিত গমকে-গমকে হাসলো। হাসি দিয়ে, অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিতে চাইলো সব কিছু—এই একা ঘর, অন্ধকার, তৃপ্তির অস্তিত্ব।

আবছা অন্ধকারে তৃপ্তি উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত হলো। নিঃশব্দে দেখতে চেষ্টা করলো মানুষটার গতিবিধি, চালচলন, হাসির উদ্দামতা।

'কী হলো—' অমিত উপহাসেই আবার কটাক্ষ ছুঁড়লো—পরম গুরু স্বামীকে গালাগালি দিচ্ছি, চুপ ক'রে আছো যে। প্রতিবাদ কোথায় ?'

'দরকার পড়ে না। ওটা বক্তার গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।'

'আচ্ছা—এবার যাও। লোকেন, ওরা আসবে।'

'যাচ্ছি—' তৃপ্তি উঠে দাঁড়ালো। অমিতের দিকে তাকালো। আবছা-অন্ধকারে মানুষটাকে দেখা যায় না ভালোভাবে। ঘরের একেবারে অন্ধকার কোণে সে দাঁড়িয়ে আছে। তবু অন্ধকারকেই যেন বললো—'ওই ছাইপাঁশ তুমি এখন খাবে ?'

'কি ?'

'ওই লোকেনরা যা আনবে বলছো।'

'কি মদ ? কেন সে তো আমার ঘরেই আছে।'

ঘরে!' তৃপ্তি কাঁপতে-কাঁপতে উচ্চারণ করলো -'এই বলছো পেট-ব্যথা, আবার বলছো--'

'উপায় তো নেই, তুমি যাও। বেশিক্ষণ থেকো না। আর জানোই তো, তোমার ন্যাকামিতে কোনোই ফল হবে না। আমি যা করবার, করবো।'

'আজ খেয়ো না অমিত।'

'কেন ?'

'আজ তুমি অসুস্থ।'

'কী ব্যাপার বলো তো ?' আবার একটা উচ্চকিত হাসিতে ফেটে পড়লো অমিত—'তুমি কি আমার প্রেমে-ট্রেমে পড়েছো নাকি ? আসলে কল্যাণের আর দোষ কি ? আমারই তো এক-এক সময় সন্দেহ হয়। শেষে একটা মাতাল-লম্পট জুয়াড়ির সঙ্গে পরকীয়া। বাঙালি মেয়েদের এতোটা উন্নতি হয়েছে, সাহস বেড়েছে জানলে কি আর জীবনটা এভাবে বরবাদ করি ?'

'অমিত—' অমিতের হাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই তৃপ্তি চিৎকার ক'রে উঠলো—'কী শুরু করেছো তুমি ? কী বলছো, যা তা—'

'বাজে বকছি, মিথ্যে সন্দেহ ? তাহলে বলো, এতো ক'রে বারণ করার পরও কেন তুমি এখানে এসেছো। সেদিন এমন ক'রে অপমান করার পরও তুমি এসেছো। জানো না, এটা একটা লম্পট, মাতালের আস্তানা—'

'কেন, তোমার ঘরে সব বন্ধুরা আসে না ?'

'আসে। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু নও। না, না, বন্ধু—কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে তুমি একজন মহিলা, অর্থাৎ মেয়েছেলে

'মহিলারা সাধারণ ভাবে তোমার বন্ধু হতে পারে না ?'

'আজকাল একটু অসম্ভব।'

'ছিঃ, ছিঃ, কী নোংরা কতো ছোটো তোমরা হয়ে যাচ্ছো অমিত। আমি জানতাম না—'ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে গিয়ে চটি দুটো পায়ের তলায় গলিয়ে নিলো তৃপ্তি—'আর তোমার ঘরে থাকা নিরাপদ নয়। এর পর দাঁড়িয়ে থাকার মানে অপমানিত হবার পর লাঞ্ছিত হবার জন্য অপেক্ষা করা।'

'সে কথাটা বুঝেছো তাহলে। যাও আর এসো না।'

'আসবো না ?'

'না।'

'তুমি আমাকে ঘৃণা করো ?'

কোনো উত্তর না দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকালো অমিত। একদলা জমাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওড়ালো উপরের দিকে। বিনা চেষ্টাতেই সুন্দর, সুস্পষ্ট রিং হলো একটা। গোল শূন্য। মিথ্যে অর্থহীন। রিং-টা ভেঙে ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত অমিত তাকিয়ে রইলো। তৃপ্তি দরজার দিকে এগোলো। ফিরে তাকালো—'তুমি কি সিরিয়স্ ? ঠিক বলছো আর আসবো না ?'

অমিত তৃপ্তির দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে আজ রাতে নেশা করবে ভাবলো। পকেটে অল্প টাকা, তবু।

'তুমি সিরিয়স্ অমিত ?'

'অফ্ কোর্স।'

এক ঝামটায় দরজাটা খোলার আগেই ভেজানো দরজায় বাইরে থেকে ধাক্কা পড়লো। স'রে দাঁড়ালো তৃপ্তি। অতোটা সম্ভ্রমের প্রয়োজন ছিলো না। বনমালী। ওর এক হাতে শালপাতার ঠোঙা। তেলেভাজা। অন্যহাতে কাগজের ঠোঙা। মুড়ি। এক প্যাকেট সিগারেট।

'কি রে ব্যাটা, সেই কখন বলেছি আর এই তুই এলি।'

'না বাবু, পনেরো নম্বরের হরিবাবু শেল্‌দা পাঠালেন তাই—'

'আচ্ছা দে দে—কী এনেছিস্ ? গরম তো ?'

বনমালীর হাত থেকে ঠোঙা নিয়ে চেয়ারের উপর রাখলো অমিত। পয়সা বুঝে নিলো। বকশিস নিয়ে বনমালীও চ'লে গেলো। দূর থেকে সবই দেখলো তৃপ্তি। সইতে পারলো না। চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো—'এগুলো তুমি খেয়ো না অমিত। এই বললে পেট-ব্যথা।'

'কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে।' ঘরের কোণে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিচ্ছিলো অমিত। কুঁজোটাকে হাঁটুর উপর তুলে গ্লাসের মুখে কাত ক'রে বললো।

'অন্য কিছু আনিয়ে নাও। চিঁড়ে দই—' শালপাতার ঠোঙাটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে তৃপ্তি করুণ হয়ে উঠলো—'আজ এগুলো খেয়ো না। খেলে খারাপ হবে।'

'কিচ্ছু হবে না। রাখো তো ওগুলো যেখানে ছিলো।'

'যদি না রাখি ?'

'কেড়ে নেবো।' জলের গ্লাস নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো অমিত।

'পারবে ?' দুহাতে চেপে ধ'রে ঠোঙাটাকে বুকের কাছে তুললো তৃপ্তি।

'ওসব সেন্টিমেন্ট আমার নেই, তৃপ্তি। জানো না, আমি কত বর্বর হয়ে গেছি। আমার ক্ষুধার খাদ্যকে কেড়ে নিতে হলে আমি সব পারি।'

'তাই ব'লে তুমি আমার গায়ে হাত তুলতে পারবে ?'

'অনর্থক সময় নষ্ট ক'রে নিজের ক্ষতি কোরো না। যা বলছি করো। রেখে দাও ওগুলো।'

'যদি না রাখি, কী করবে তুমি ?'

'লম্পটকে বিশ্বাস কোরো না তৃপ্তি। একটা বিবেকশূন্য জানোয়ারকে নিয়ে তোমার এ'খেলা মারাত্মক হতে পারে।'

'না, এগুলো তোমাকে আমি খেতে দিতে পারি না অমিত। আমি সব ফেলে দেবো।'

'তৃপ্তি—'

অমিতের চিৎকারে চমকে উঠলো তৃপ্তি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো হঠাৎ। একি! এরকম ভয়ঙ্কর চাউনি কেন অমিতের? এক মুহূর্তে বদলে গেছে মানুষটা। দু'পা পিছিয়ে এলো জানলার কাছে।

'দাও—'

'অমিত—' তৃপ্তির গলা কাঁপছে।

'রেখে দাও—'

'না—' নিতান্ত একগুঁয়ে হয়ে, জিদ্ ক'রেই ঠোঙাটা জানলা গলিয়ে ফেলে দেবার জন্য তৃপ্তি হাত বাড়ালো। আর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা শক্ত কামড় পড়লো বাহুর উপর। থমকে দাঁড়িয়ে অমিতের দিকে তাকালো। দাঁত নয়, অমিতের শীর্ণ রুগ্ন হাতের থাবা। কিন্তু অসম্ভব শক্তি। সেই ভয়ঙ্কর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলো না বেশিক্ষণ। ঠোঙাটা বুকের মধ্যে চেপে ঝুঁকে পড়লো নীচের দিকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো। আর সেই মুহূর্তে তৃপ্তির স্বাস্থ্যবতী সম্পূর্ণ দেহটার উপর দৃষ্টি পড়লো অমিতের। সুপুষ্ট দীর্ঘ বিনুনিটা গড়িয়ে পড়েছে পিঠ থেকে, শাড়ির আঁচলটা খ'শে পড়তে গিয়ে আটকে আছে কাঁধের কাছে। অমিত ওর সবুজ ব্লাউজে-ঢাকা প্রসারিত পিঠ আর সেখানে ব্রেসিয়রের অস্পষ্ট রেখা দেখতে পেলো। কয়েকটি মুহূর্ত নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলো এবং অকস্মাৎ মনে হলো ক্ষুধার আগুন দ্বিগুণ হয়েছে। সেই খাদ্য ওর চাই। মুহূর্তের ভগ্নাংশ সময়ও পেলো না। অমিত ওর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তৃপ্তির উপর, জড়িয়ে ধরলো ঘন আলিঙ্গনে, কেড়ে নিতে চাইলো ঠোঙাটা॥

তৃপ্তি প্রস্তুত ছিলো না। এতোদূর নামতে পারে অমিত, ভাবতে পারেনি। টাল সামলাতে না পেরে হাতের মুঠো থেকে খ'শে পড়লো অমিতের আহার। নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রবল শক্তিতে বাধা দিতে লাগলো, সরিয়ে দিতে চাইলো অমিতকে, তিরস্কারের ভাষায় ধমকাতে লাগলো। সে আর্তনাদ গোঙানির মতো শোনালো। শালপাতার ঠোঙা তখন উপলক্ষ মাত্র। লুটোপাটি আর হুড়োহুড়িতে তৃপ্তির অক্ষম প্রতিরোধ অমিতকে বাধা দিতে পারলো না। দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে তৃপ্তি যখন ওর শেষ ক্ষমতাটুকু নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে হাঁপাতে লাগলো আর তৃপ্তির আশ্লেষেও অমিত ক্লান্ত হয়ে উঠলো তখনই তুজন একটু শান্ত হলো। বুনো মোষের মতো ঘন, দ্রুত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগলো তুজন।

চোখের পলকে স'রে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো অমিত। বোবা, স্থির। আর তৃপ্তির যা প্রত্যাশার অতীত, যা কল্পনা করাও অসম্ভব ঠিক এমনি একটা কিছুকে এতো অনায়াসে ঘ'টে যেতে দেখে সব কিছুরই খেই হারিয়ে ফেললো। ক্লান্ত শরীরে দেয়ালে হেলান দিয়ে মুখে নিঃশ্বাস টানতে-টানতে দাঁড়িয়ে রইলো নিস্পন্দ হয়ে। এ কী করলো অমিত? পারলো? সমস্ত বুক ছিঁড়ে একটা আর্তনাদ ফেটে পড়তে চাইছে। সে আর্তনাদ ভৎ‌র্সনা নয়—কান্না। অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁধতে চেষ্টা করলো, সংযত করলো নিজেকে। তাকালো অমিতের দিকে। মাথা নুয়ে উন্মাদের মতো এলোপাথাড়ি দ্রুত পায়চারি করছে। ছটফট করছে। মাথার চুলে, দাড়িতে অদ্ভুত হয়েছে ওর চেহারা। বোধহয়, অনুশোচনায় পুড়ছে। তৃপ্তি পারলো না সেদিকে তাকাতে। তাকালো মেঝের দিকে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে বেগুনি আর আলুর চপ। অমিতের ক্ষুধার খাদ্য। চমকে উঠলো দেখে—ওর পায়ের তলায় থেঁৎলে গেছে তার একটা টুকরো। কিছুটা শাদা

আসু আর তেল মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েছে। কুৎসিত হয়েছে দেখতে।

কোনোদিকে না তাকিয়ে এক ঝাপটায় দরজার কাছে ছুটে গেলো তৃপ্তি। তারও চেয়ে জোরে দরজাটা খুললো। অমিত গর্জে উঠলো—'দাঁড়াও।'

থামতে হলো। মেঝে থেকে ব্যাগটা তুলে তৃপ্তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় জানোয়ারের মতোই চিৎকার ক'রে উঠলো অমিত—'ক্লিয়ার আউট্। আই সে, ক্লিয়ার আউট।'

প্রায় এক নিঃশ্বাসে দোতলা থেকে একতলা, করিডোর, এতোগুলো সিঁড়ি দ্রুতগতিতে ভেঙে-ভেঙে, টলতে-টলতে, কোনোমতে দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো তৃপ্তি। হাঁপাতে লাগলো, কাঁপতে লাগলো। একটা লাইট-পোস্টের তলায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, তুহাতে মুখ ঢেকে শুধু কাঁপতে লাগলো। ভুলে গেলো, এটা প্রকাশ্য পথ, অনেক মানুষ-জন। আর সেই মুহূর্তেই মনে পড়লো সেই দৃশ্যটা। সামান্য ঘটনা, খুবই সামান্য। একদিন সন্ধ্যাবেলা, একা ঘরে ছোট্টো একটা চড়ুই পাখি ঢুকলো হঠাৎ। ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ ঘুরন্ত পাখার ব্লেডে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো ঘরের মেঝেয়। প'ড়েই কাঁপতে লাগলো, থরথর, থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। ভীত-ত্রস্ত ছোটো পাখি-টাকে স্নেহে-আদরে হাতে তুলে নিয়েছিলো তৃপ্তি। ওকে সুস্থ ক'রে আকাশে ছেড়ে দিয়েছিলো।

একুশ

একটা অসহ্য জ্বালা। তাতানো-লোহার মতো পুড়ছে শরীরটা। হাড়ে-মজ্জায়-রক্তেই শুধু নয়, বাইরেও। কী শক্ত হয় পুরুষ মানুষের হাত আর কী বড়ো হয়েছে অমিতের নখগুলো। ডান হাতের কনুই-এর কাছটা ছড়ে গেছে অনেকখানি। রক্ত ঝরছে। জ্বলছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি তৃপ্তি। উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে রাস্তায় নেমে এসে, প্রচুর আলো আর অসংখ্য মানুষের ভিড়ে মিশে যাবার পর একটু হাঁপ ছেড়ে দাঁড়ালো। সমস্ত ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো। কেন এমন হলো।

ছোটো রুমালে হাতের রক্ত মুছতে-মুছতে আবিষ্কার করলো—চোখে জল এসে গেছে। শাড়ির আঁচল-জড়ানো আঙুলটা চশমার ভিতর দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে দিয়ে ভাবলো—এই আটাশ বছরের যৌবনে এমন ক'রে কোনোদিন ভিতরে-বাইরে প্রচণ্ডভাবে নাড়া খায়নি সে। সেদিনও এমনি করে অমিত কাঁদাতে চেয়েছিলো। কল্যাণের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পেরেছিলো। কিন্তু এতো অতৃপ্তি আর চাপা বিক্ষোভের মধ্যেও কল্যাণ কাঁদায়নি কোনোদিন।

বাসের লেডিজ সিটে চুপচাপ স্থির হয়ে বসে থেকে চাপা কান্নাটাকে অনেক কষ্টে সামলে রাখলো তৃপ্তি। অমিতের কাছে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হলো আজ। আমি তো ওকে সব দিতে চেয়েছিলাম, দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম শুধু এইটুকু ছাড়া। এইটুকু—যা শুধুমাত্র কল্যাণ ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না, দিতে পারি না আমি। অমিত আমাকে আর বন্ধু মনে করে না, মেয়ে-জাত ব'লে আলাদা চোখে দেখতে চায়। তীব্র

অপমানে·লাঞ্ছিত আর লাঞ্ছনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েও আজ ভাবতে পারলো তৃপ্তি—তাতেও ক্ষতি ছিলো না। আমি ওকে ক্ষমা করতাম, করতে পারতাম, যদি আমাকে স্পর্শ ক'রেই ও ওর উপলব্ধিতে ফিরে যেতো, যদি সুস্থতাকে ফিরে পেতো। কোনো বিলিতি উপন্যাসের নায়িকাকে স্মরণ করলো তৃপ্তি। যারা স্বামী ছাড়াও অন্য পুরুষকে খোলা মনেই কিছুটা শরীরের স্বাদ দিতে পারে। অসংখ্য চুম্বনে-ভেজা দেহের তাপে যাদের সতীত্ব কলঙ্কিত নয়। না-হয় তেমনি ক'রেই কিছুটা গ্রহণ করতো অমিত, তৃপ্তিও স্বেচ্ছায় দিতো। কিন্তু—

হাতটা জ্বলছে। রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। তবু জ্বলছে। রুমালটা আলতোভাবে বুলিয়ে নিলো ক্ষতটার উপর। বিষ নেই অমিতের নখে, জ্বালা আছে। ডেটল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। কিন্তু এ জ্বালা কি কমবে তাতে? নইলে এ ঘটনার পর শুধু জ্বালা থাকবে কেন শরীরে? লজ্জা নয়, সঙ্কোচ নয়, এমন কি অপমানবোধও নয়—শুধু জ্বালা, শুধু যন্ত্রণা।

ভিড়ের মানুষগুলো ওর দিকে তাকাচ্ছে, ওকে দেখছে। ট্রামে-বাসে চ'লে সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে আজ। তৃপ্তি ওর পাশে ব'সে থাকা অল্পবয়সী মেয়েটির দিকে তাকালো। কোনো ছাত্রী নয় তো ওর? এতক্ষণেও ওকে চিনলো না মেয়েটি, হাত তুলে নমস্কার জানালো না। তৃপ্তি আশ্বস্ত হলো। বাসের সিটে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে লাগলো কখন পথ ফুরোয়, শেষ স্টপ আসে।

ঘরে ফিরে শাড়ি বদলে, হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকলো। হাতের ক্ষতটা ডেটল দিয়ে পরিকার ক'রে আয়োডিন বুলিয়ে দিলো। নিধুর-মা চা রেখে গেছে। চা-টুকু শেষ করার পর কিছুই করার নেই ব'লে গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। শরীর অসম্ভব ক্লান্ত, মনে ভয়াবহ বিপর্যয়। এদিক-ওদিক তাকালো। চেনা-

শোনা অভ্যস্ত পরিবেশ। ওদিকের দেয়ালে টাঙানো সেই ফোটো। কল্যাণ আর ও নিজে। একই প্লেটে পাশাপাশি। মনে আছে, বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের পর সেদিনই বিকেলে তোলা। কন্‌ভোকেশনের দিন গাউন চাপিয়ে হাতে ডিগ্রি নিয়ে ছবি তোলার মতো ছেলেমানুষি শখ। কতো পুরোনো হয়ে গেছে ফোটোটা। প্রায় দেড় বছর। ওটার দিকে তাকালে এখন আর কিছুই মনে হয় না। কোনো রোমাঞ্চ নেই। কল্যাণ কি সত্যি এতো সুন্দর! ফোটোতে কতো সুন্দর দেখায় ওকে। আমি নিজেও কি তাই? তৃপ্তি ভাবলো। কিন্তু ওরা যে বলে, সুন্দর হয়েছি আমি। সহকর্মিণী দর্শনের অধ্যাপিকা তপতী ভট্টাচার্য বলছিলো সেদিন, আমি নাকি সুন্দর হয়েছি। বিয়ের জল গায়ে পড়লে প্রথম বছরে মেয়েরা এমনি সুন্দর হয়। কথাটা শুনে হেসে উঠেছিলো ইতিহাসের বিশাখা, বাংলার নন্দা, সংস্কৃতের পারুলদি। অধ্যাপকদের ঘরে এর চেয়েও মারাত্মক ঠাট্টায় হাসতে হয়। তৃপ্তি উঠে গিয়ে আরশিতে নিজেকে দেখতে চাইলো একবার। সত্যি কি তাই? কিন্তু উঠলো না। শুয়ে রইলো। অমিত কি শুধু ওর ঠোঁডাটাই কেড়ে নিতে চেয়েছিলো? না অন্য কিছু? অন্য কোনো উদ্দেশ্য? সে প্রশ্ন চিন্তায় এসে নাড়া দিতেই ভিতরে-ভিতরে শিউরে উঠলো। অমিতকে এতোটা নীচে, এতোটা তলায় তলিয়ে দেবো আমার চিন্তায়? তাহলে ওকে ইতর বলতে পারছি না কেন এখনও?

হাতের ছ'ড়ে যাওয়া ক্ষতটা জ্বলছে। ডেটল আর আয়োডিনের পরও এ জ্বালা কমছে না। বাঁ-হাতে ডান-হাতের জ্বালা-ধরানো জায়গাটা ঘষতে-ঘষতে উঠে বসলো তৃপ্তি। ভিতরের রক্তে কল্যাণ। খুশি আর উল্লাসের স্রোতে ছুটছে। স্পষ্ট অনুভব করে তৃপ্তি। বাইরের চামড়ায় অমিত। তীব্র দংশনের জ্বালা। আগুনের তাপে পুড়ছে। কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পর চোখ পড়লো

ওদিকের দেয়ালে। আলনা থাকতে, এতোগুলো ব্র্যাকেট থাকতে দেয়ালের পেরেকে পাঞ্জাবিটা কেন ঝুলিয়ে রেখেছে কল্যাণ। কি জানি কেন, এ দৃশ্য সইতে পারে না তৃপ্তি। কেমন যেন বিশ্রী লাগে। উঠে এসে যথারীতি ওটা ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখলো।

কাল একটা অনার্স ক্লাশ নিতে হবে। একটু পড়া দরকার। কিন্তু মন নেই, মেজাজ নেই, ইচ্ছেও নেই। অস্থির হয়ে টুকিটাকি কাজ শুরু করলো তৃপ্তি। একবার চেয়ারে, একবার বিছানায়, কখনও রেডিওর পাশে, কখনও রান্নাঘরে, কখনও বারান্দায়। এ দুঃসহ একাকিত্ব থেকে রেহাই পেলো এক সময়। ঝণ্টু এলো। সঙ্গে সতীর্থা বান্ধবী। একদিন চলতি-বাস থেকে যাকে দেখে ফেলেছিলো তৃপ্তি আর কথায়-কথায় যার ইঙ্গিত দিয়েছিলো ঝণ্টু। তৃপ্তি যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। পরশু খবর নিয়ে গেছে ঝণ্ট কল্যাণ অফিসের কাজে দুদিনের জন্য পাটনা গেছে। কিন্তু তাই ব'লে আজই ওরা এলো! এমন বিশ্রী দিনে!

হাসতে হাসতে আলাপ করিয়ে দিলো—'এরই কথা তোমাকে ব'লে ছিলাম বৌদি। একসঙ্গে পড়ি। শান্তা মিত্র।'

ঝণ্টু বৌদির দু'কাঁধে হাত রেখে বান্ধবীর দিকে তাকালো—'ইনিই আমার সেই মহীয়সী বৌদি। যার কথা এতোদিন ধ'রে নিরানব্বুই লক্ষ বার তোমাকে বলেছি।'

মেয়েটি দু'হাত তুলে নমস্কার করলো। হাসবার মতো মন যখন নেই, তখনও জোর ক'রে অভ্যর্থনার হাসি হাসতে হলো। দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে খাটের কাছে টেনে নিয়ে এলো মেয়েটিকে। বললো—'বোসো।'

মেয়েটির কাঁধ থেকে ঝোলানো ব্যাগটা খুলে নিয়ে চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে তৃপ্তিও পাশে এসে বসলো। এক বয়েসি সাথীর মতো কাঁধে হাত রাখলো। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো মেয়েটিকে। কম বয়সে তোলা ফোটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকেই যেন দেখছে মনে

হলো। মনে হলো বয়স বাড়ছে ওব নিজের। ভাঁটা পড়েছে যৌবনে। ঝণ্টুর বান্ধবী। কতো আর বয়স হবে? কল্যাণের চেয়ে হয়তো মাস কয়েকের ছোটো হবে তৃপ্তি, কিংবা সমবয়সী। মেয়েটিও কি তাই? তৃপ্তি ঝণ্টুর দিকে তাকালো। টেবিলেব বইগুলো ঘাঁটছে ঝণ্টু। তৃপ্তি আবার চোখ ফেরালো মেয়েটির দিকে। কাঁচা বয়স, কচি মুখ, মিষ্টি চাউনি। শরীব উঠতি যৌবনে ভ'রে উঠেছে। মেয়েটির ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আদর ক'বে হাত বুলোতে-বুলোতে নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে ওর রঙটা মিলিয়ে দেখলো। তুলনায় নিজেকেই ফর্সা দেখলো একটু। মেয়েটি কি সুন্দরী? মনে হলো, নেহাতই মামুলী চেহারা। শাদার উপর সবুজ চেক-চেক সামান্য একটা তাঁতের শাড়ি, অল্প দামের হ্যাণ্ডলুমের ব্লাউজ। কানের রিং, দু'হাতে দুগাছা তামাটে চুড়ি আর গলার সরু চেনের দিকে তাকিয়ে ওর সংসার, ওর জোড়া-তালি দেওয়া মধ্যবিত্ত পরিবেশের ছবিকে স্পষ্ট দেখতে পেলো। ওকে ভালো লাগলো। দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে মৃদু একটা নাড়া দিয়ে হাসলো—'কি তুমি কথা বলছো না যে। কিছু বলো।'

মেয়েটিও বিনীতভাবে হাসলো—'কি বলবো? আপনার কথা অনেক শুনেছি প্রসূনের কাছে। আলাপ করার ইচ্ছে ছিলো অনেকদিন থেকে।'

'আমার কথা অনেক শুনেছো? কি শুনেছো?'

অনেক কথা। আমাদের সব বন্ধুরাই তো আপনাকে চেনে। আপনার কথা উঠলে ও আর থামতে চায় না।'

'তাই নাকি? তাহলে তো তোমাদের মহলে আমার খুব পাবলিসিটি হয়েছে। কি বলো—' তৃপ্তি উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখর হতে চাইলো। কিন্তু হাতের ক্ষতটার জ্বলুনিতে হাসিটা পুরোপুরি ফুটলো না—'কিন্তু আমার কাছে তোমার নামে ঝণ্টু অনেক নিন্দে করেছে তা জানো?' এমন সহজ আন্তরিকতায় এবং পরিহাসে মেয়েটি মুগ্ধ হলো। অল্প

হেসে তাকালো—'হতে পারে। মেয়েদের নামে নানা কথা বলা তো ওর স্বভাব। আমাদের মাথায় নাকি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নেই। শুধু বই মুখস্থ ক'রে পাশ করি। একটি মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হলে নাকি তার খাঁটি-খাঁটি স্কুল ফাইনাল পাশ করা হলো ব'লে মনে হয় ওর।'

তৃপ্তি হেসে উঠলো—'তাই নাকি ঝণ্টু। শান্তা কি সব বলছে? সত্যি?'

অন্যদিকে চোখ থাকলেও ঝণ্টু যে কথাগুলো শুনছে, তা বোঝা গেলো ওর লাফিয়ে ঘুরে বসার ভঙ্গি দেখে—'সত্যি বৌদি। আমি ভেবে দেখেছি দেবা ন জানন্তি কুত মনুষ্যাঃ, শাস্ত্রকাররা কথাটা ভুল বলেন নি কিন্তু ব্যাখাটা ভুল করেছেন। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ আমার হাতের মুঠোয়। সেটা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয় কিন্তু'—ঝণ্টু কানের উপরে মাথার পাশে বার কয়েক মৃদু টোকা দিয়ে দেখালো—'এখানে বুঝলে এখানেই গোলমাল। মেয়েরা যে কি ভাবে আর কি পদ্ধতিতে চিন্তা করে সেটা ঈশ্বরেরও জ্ঞানের বাইরে, আমরা কোন ছার!'

ঝণ্টুর কথায় এবং কথা বলার ভঙ্গিতে তৃপ্তি, শান্তা দুজনেই হেসে উঠলো। তৃপ্তি ধমকে বললো—'যাও, যাও, মেয়েদের কথায় তোমার কান পাতা কেন? ভদ্রতা শেখোনি?'

'আচ্ছা বেশ, বেশ—'তৃপ্তির সস্নেহ ধমকে ঝণ্টু হাসলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কোণের বুক-শেল্‌ফটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ওখানেই কল্যাণ আর তৃপ্তির সব বই। ইংরেজি, বাংলা। ঝণ্টু নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো।

'তারপর শান্তা, তোমরা তো একই সঙ্গে পড়ো। একই সেকশন্?'

শান্তার বুকের কাছে শাড়িতে একটা পোকা পড়েছিলো। ওটা ফেলে দিয়ে তৃপ্তি প্রশ্ন করলো।

'একই সেকশন। টিউটোরিয়াল আলাদা।'

শুধু সেক্‌শন, টিউটোরিয়াল নয়, আলাদা বিষয় ছিলো তৃপ্তির।

অমিত আর কল্যাণের বিষয় এক—ইংরাজি, তৃপ্তির বাংলা। তৃপ্তি আবার জিজ্ঞেস করলো—'স্পেশাল-পেপার কি তোমার।'

'সে-ও আলাদা। আমার বৈষ্ণব পদাবলী।'

'বৈষ্ণব পদাবলী?' তৃপ্তি হাসতে চাইলো—'ঝন্টু ওর থিয়োরিগুলো বলেনি তোমার কাছে? ওর তো আবার অনেক মৌলিক চিন্তা আছে বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে।'

'উঃ সে সব শুনে শুনে তো কান প'চে গেছে। আপনাকেও বলেছে বুঝি?' শান্তা তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

ওদিক থেকে ঝন্টু ব'লে উঠলো হঠাৎ—'এ কি বৌদি, তোমরা যে ঘর-সংসার ক'রে-ক'রে বুড়িয়ে যাচ্ছো দিনদিন। নতুন কোনো বই কেনোনি অনেকদিন। এ তো সব আণ্ডিকালের পুরোনো।'

'আমি কবে বই কিনতাম যে আজ কিনিনি বলছো।'

'সেজদা?'

'ও তো কেনে। প্রায়ই তো কিনে আনে দেখেছি।'

'কেনে তো কচু। রাজ্যের যতো রাজনীতি, অর্থনীতি, কারেন্ট-অ্যাফেয়ার্স। কবিতা কোথায় বৌদি, সাহিত্য-দর্শন। এককালে যার মধ্যেই সেজদা ডুবে থাকতেন। কথায়-কথায় চিৎকার ক'রে কবিতা আওড়াতেন'—শেল্‌ফের বই ঘাঁটার পর হাত ঝাড়তে এগিয়ে এলো ঝন্টু—'সত্যি বৌদি, সেজদা যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন আজকাল। বড্ডো বেশি কাজের-মানুষ। অতো ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট মানুষগুলোকে আমার অদ্ভুত লাগে। কিছু বলো না কেন? ধমকাতে পারো না?'

হঠাৎ উত্তর দিতে পারলো না তৃপ্তি। ঝন্টু খুব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শান্তার পিঠে একটা হাত রেখেছিলো তৃপ্তি, আরেক হাত শান্তার কোলে। শান্তার কোল থেকে দ্রুত হাতটা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটি লক্ষ্য করেনি, কিন্তু ঝন্টুর চোখে পড়বে—বাঁ হাতে আয়োডিনের লাল দাগটা বড়ো বেশি স্পষ্ট হয়ে

আছে। যদি কিছু প্রশ্ন আসে? অনর্থক একটা মিথ্যে কথা বলার ঝুঁকি এড়াতেই আঁচল টেনে হাতটা লুকোলো—'তোমরা একটু বোসো ভাই। আমি এখ্‌খুনি আসছি। এই যাবো আর আসবো।'

রান্নাঘরে এসে নিধুর-মার সঙ্গে একটু পরামর্শ করলো তৃপ্তি। ওরা এসেছে, কি দিয়ে ওদের একটু জল-খাবার দেওয়া যায় তাই নিয়ে। ভাতের মাড় গালছিলো নিধুর-মা। গরম হাঁড়িটা উপুড় ক'রে ধ'রে ছিলো এক কোণে। উনুনটা কামাই যাচ্ছে। তৃপ্তি নিজেই সুজির বয়াম আর চিনির কৌটোটা এনে রাখলো উনুনের পাশে। ঝকঝকে সুন্দর একজোড়া কাপ-প্লেট, দুটো কাঁচের গ্লাস। অনেক আশা নিয়ে ঝণ্টু আজ এসেছে এখানে, এসেছে বৌদির কাছে। মুখোমুখি সিগারেট ফুঁকবার সাহসটুকু আজ পর্যন্ত যে সঞ্চয় করতে পারেনি, আজ সে অনায়াসে তার বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে। এ সাহস কল্যাণের ছিলো না, তৃপ্তিরও না। কুমারী জীবনে তৃপ্তিকে ওদের সংসারে নিয়ে যেতে পারেনি কল্যাণ। বিয়ে ক'রে পর করেছে সব আপন মানুষকে, সম্পর্ক ছিঁড়েছে সকলের সঙ্গে। কিন্তু ঝণ্টু এসেছে ওর দাদার সংসারে, ওর বৌদির কাছে। অনেক বিশ্বাস নিয়ে এসেছে। বৌদিকে ও শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। ওর ধারণা—পৃথিবীর আর কোথাও যদি কোনো সহযোগিতা, কোন প্রেরণা না থাকে, তবে এখানে তার অভাব হবে না। ওদের প্রেমের, ভালোবাসার, আন্তরিকতার ষোলোআনা মর্যাদা দেবে বৌদি।

তৃপ্তি তা দেবে। যতোটুকু দেওয়া দরকার তার চেয়ে বেশি। কিন্তু তার আয়োজন করতে-করতে অনেক দুঃখেও হাসি পেলো তৃপ্তির। একটা মানুষের জীবনে কতো ঘটনাই না ঘটে, ঘটে যায় একের পর এক। সামান্য ঘটনা, অসামান্য তাৎপর্য। শুধু সেই বিশেষ মানুষটি ছাড়া আর কারও কাছেই তার অর্থ স্পষ্ট নয়। যদি তার কোনো অর্থ থাকতো তবে আজকের এই বিরাট পরিহাসটা আঘাত করতো কল্যাণকে, অমিতকে, এমন কি ঝণ্টু আর শান্তাকেও। এলুমেনি-

য়ামের ছোটো কড়াইটা উনুনে চাপিয়ে সুজি ভাজতে-ভাজতে একটা পুরোনো ছবি মনে পড়লো তৃপ্তির। ছেলেবেলায় দেখেছে। উনিশ বছরের বিধবা জ্যাঠতুতো দিদি অনুদিকে বড়দার বিয়ের পিঁড়ি আঁকতে গিয়ে কাঁদতে দেখেছিলো আড়ালে।

আগুনের আঁচে অমিতের নখের-আঁচড় তীব্র হয়ে জ্বলছে হাতের চামড়ায়। তৃপ্তি অস্বস্তি বোধ করলো। রেহাইও পেলো। ভাতের মাড় গালা শেষ ক'রে ঝাঁজিয়ে উঠলো নিধুর-মা—'তুমি আর এখানে মিছিমিছি ঝামেলা বাড়িও না তো মা। উনারা বসে আছেন, কথা বলো গে। আমি নিয়ে যাচ্ছি সব।'

তৃপ্তি আবার ঘবের দিকে ফিরলো। চৌকাঠেব ওদিকে দাঁড়িয়ে ওদের দেখলো কিছুক্ষণ। বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখেই বসেছে ওরা। মেয়েটি খাটে, ঝণ্টু চেয়ারে। কি যেন বলছে। বেশ লাগলো ওদের দেখতে। তৃপ্তি এগিয়ে আসতে ওরা অকারণেই একটু ন'ড়ে উঠলো। আবার নানা কথায় নানা প্রশ্নে শান্তার খবর নিলো তৃপ্তি। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আদর করলো। চা-জলখাবারের পালা চুকে যাবার পর জিজ্ঞেস করলো—'কোথায় থাকো তোমরা?'

'এই তো এখানে। জগুবাবুর বাজারের সামনে।'

'তাহলে তো খুব কাছে। পথ চিনে নিলে, আসবে কিন্তু মাঝে মাঝে। ঝণ্টুর দাদার সঙ্গে আলাপ হলো না। আলাপ ক'রে যাবে।'

মৃদু হেসে ঘাড় বাঁকালো শান্তা—'আসবো।'

শান্তাকে আবার প্রয়োজন মতো এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো ঝণ্টু। এসে বললো—'আজ কিন্তু তোমার এখানেই থাকবো বৌদি। বাড়িতে ব'লে এসেছি—ফিরবো না।'

তৃপ্তি একটু অবাক হলো। কল্যাণের অনুপস্থিতিতে কোনোদিনই বৌদির সঙ্গে থাকতে রাজি হয়নি ঝণ্টু। আজ স্বেচ্ছায় প্রস্তাব

করলো। মনের বিস্ময়কে আড়ালে ঢেকে তৃপ্তি হেসে বললো—'বেশ তো, থাকো না। সে তো অনেকদিন বলেছি তোমাকে।'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় ব'সে গল্প করলো দুজনে। ঝণ্টুকে পেয়ে সন্ধ্যার সমস্ত বিষণ্ণতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলো তৃপ্তি। হাসতে হাসতে বললো এক সময়—'তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে, না ঝণ্টু।'

'কেন?' ঝণ্টু অবাক হলো।

'এই রাত হয়ে গেছে। সদর দরজা বন্ধ।' তৃপ্তি মুচকি হাসছে।

'তাতে কি?'

'তাতে কি? বেরোতে পারছো না। দেশলাইটা এনে দেবো? অ্যাশ্-ট্রে।' ব'লেই ঝণ্টুর পিঠে হাত রেখে হেসে উঠলো স্বাভাবিক ভাবে।

আকস্মিক নাটকীয়তায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলো ঝণ্টু। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই বৌদির হাসিতে যোগ দিলো—'কি তুমি বলছো বৌদি?'

'আহা, কচি খোকাটি। ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। তাতে কি, বড়ো হয়েছো, দুদিন বাদে অধ্যাপক হবে। খাও না, খাও। তবে লক্ষ্মীটি, অল্প খেয়ো। তোমার দাদাকে এতো ক'রে ব'লেও কমাতে পারছি না।'

'বৌদি, আমি জানতাম, তুমি জানো।'

'জানবো না কেন, তোমার দাদাও জানেন।' তৃপ্তি হাসলো।

'তোমার সামনে খেতে পারি, কিন্তু সেজদার সামনে—'বলতে-বলতে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের ক'রে বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর শেষ শব্দটা উচ্চারণ করলো ঝণ্টু—'অসম্ভব।'

অপরিসর এক-চিলতে বারান্দায় তৃপ্তি মাদুর পাতলো। বসলো দুজন। খোলা-হাওয়ায় ভালো লাগলো ব'সে থাকতে। বৌদির কোলে মাথা রেখে অনেক কথা বললো ঝণ্টু। 'নেক কথা—দাদা-

বৌদির ব্যবহার, সংসারের আবিলতা, নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন, পড়াশুনা, শান্তা, প্রেম। রোগীর মুখে রোগের বিবরণ শোনা ডাক্তারের মতো তৃপ্তি শুনলো সব কিছু। কথায় কথায় অনেক প্রসঙ্গ এসে একে-একে ভিড় করলো। আলাপ যখন করুণতর এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তখনই কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে ব'লে ফেললো তৃপ্তি—'ওই যে বাড়িটা দেখছো ঝণ্টু, ওই-যে বন্ধ জানালাটা ওর একটা ইতিহাস আছে। সে এক মর্মান্তিক কাহিনী। তোমার বান্ধবী শান্তার মতো ওই একই বয়সের একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। তোমারই বয়সের একটি ছেলে এ জন্যে দায়ী।'

'কে, সেই মেয়েটি ?' ঝণ্টু মাথা চাড়া দিয়ে বললো—'আমি তো দেখেছি তাকে।

'হ্যাঁ সে-ই।'

ঝণ্টু আবার মাথা রাখলো বৌদির কোলে। নক্‌শা-কাটা রেলিং-এর ফাঁকে একফালি আকাশ দেখা যায়। কলকাতার আকাশ—সঙ্কীর্ণ ফালি ফালি কাটা, ছেঁড়া। রেলিং-এর মধ্য দিয়ে সে আকাশ আরও জীর্ণ, টুকরো-টুকরো। একটি উজ্জ্বল তারা জ্বলছে অনেক তারার ভিড়ে। ঝণ্টু সেদিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নীরবতার পর বৌদির আবছা মুখের দিকে তাকালো—'অমিতদা কিন্তু মরতে পারেন নি বৌদি। সবাই মিলে তোমরা বাঁচিয়ে দিয়েছো।'

'তোমার অমিতদাই বলো আর যার কথাই বলো, এমন ক'রে মরতে চায় কেন বলো তো। বাঁচাটা কি সত্যি খুব কঠিন ?' স্বামীর কাছে হেরে যাওয়া সেদিনের তর্কটা এবার যেন জিততে চাইলো তৃপ্তি। ঝণ্টর মুখে নিজের উত্তর খুঁজলো।

'মরতে কি কেউ চায় বৌদি ? চায় না। সবাই বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকার একটা অর্থ প্রয়োজন। সেটা যখন শূন্য মনে হয় তখন মৃত্যুও একটা মস্ত অর্থহীনতার মধ্যে পড়ে। মানুষ আত্মহত্যা করে না, তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়।'

ছোটো ভাইএর চুলে আস্তে-আস্তে বিলি দিচ্ছিলো তৃপ্তি। ঝণ্টুর চুলগুলো শক্ত মুঠো ক'রে ধ'রে ফেললো আচম্‌কা। কী বলছে ঝণ্টু! এ কার কথা? মনে হলো, বহুদিন বহুবার ঠিক এই কথাগুলোই শুনে এসেছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি।

'না, না, এ সব তুমি বোলো না ঝণ্টু। বোলো না। শান্তাকে বলেছো এ সব? জীবনের উপর এতোটা অবিশ্বাস নিয়ে ভালোবাসছো একটি মেয়েকে। প্রেম করছো?'

প্রেম! একটু ধাক্কা খেলো ঝণ্টু। ভালোও লাগলো। এতো কথার মধ্যেও শান্তাকে জড়িয়ে প্রেম শব্দটা উচ্চারণ করেন নি বৌদি। এই প্রথম। বৌদির হাতের একটা চুড়ি নিয়ে খেলতে-খেলতে বললো—'যে ঘুমে স্বপ্ন নেই সে ঘুম বৃদ্ধের ঘুম বৌদি। সে ঘুম ঘুমোবার বয়স আমার নয়। আমি এখনও বিশ্বাস করি, ইচ্ছে করলে বাঁচতে আমরা পারি। তার আগে মস্ত একটা ওলট-পালট দরকার। দেশটা যে জাহান্নামে যাচ্ছে সেটা বুঝে আগাগোড়া ওটাকে ভেঙে-চুরে নতুন ক'রে গড়া দরকার। নইলে যে-যে কারণে অমিতদার মতো শক্ত মানুষকেও ধ্ব'সে পড়তে হয় সেখানে চুনো পুঁটির তো কথাই ওঠে না।'

'কিন্তু তোমার অমিতদা কি এসব কথা বোঝেননি বলতে চাও?'

'বুঝবেন না কেন?'

'তবে?'

'আমি স্বপ্ন দেখছি, আরও অনেক স্বপ্ন দেখবো। আকাশের চাঁদটাকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইবো। কিন্তু বৌদি, একটি-একটি ক'রে আমার সব স্বপ্নই যদি ভেঙে যায়। ধরো না কেন, হ্যাঁ ধরো— যদি শান্তার কাছ থেকেও আমি চরম আঘাত পাই। শুধু শান্তা কেন, শুধু প্রেম কেন, যদি আমার সমাজে, আমার সংসারে, আমার ভাবনায় শুধু আঘাতের পর আঘাত এসে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাকেই নাড়া দিয়ে তোলে, নিজেকে অক্ষম ভাবি না, অথচ চারদিকের

মানুষগুলোর স্বার্থপরতার জন্যে আমার ক্ষমতার যদি কোনো মূল্য না থাকে তবে কি সেই মানুষ থাকবো ? থাকবো না। অমিতদা তাই বদলে গেছেন। কিন্তু এতো সব মেনে নিয়েও আমি অমিতদাকে এখন আর সমর্থন করতে পারি না। ওই চরম পরিণতিতে পৌঁছোতে চাই না আমি। আমি সুখ চাই। ওই সুখের জন্যই আমি লড়তে চাই। লড়তে-লড়তে যদি হেরে যেতেও হয়, সো-ভি-আচ্ছা, তবু লড়বো। সেখানে লড়াই-এর আনন্দটা মিথ্যে হয়ে যায় না। অমিতদার বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ কোথায় জানো বৌদি ? ওই দুর্ধর্ষ মানুষটা এখন পরাজয়কে মেনে নিয়েছেন।'

'থাক থাক ঝণ্টু—'ঝণ্টুর মাথার নীচ থেকে পা-দুটো সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বাধা দিলো তৃপ্তি—'চলো ঘরে যাই। অনেক রাত হলো।'

ঝণ্টু অবাক। বৌদির সঙ্গে ঘরে এলো। মেঝের বিছানায় শুয়ে সে রাত শুধু দাপাদাপি করলো তৃপ্তি। ঘুম এলো না।

বাইশ

কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে প'ড়ে-থাকা শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে নিজেকে —অমিত জানে। ঘুম ভাঙার পরই শরীরটা বিশ্রী লাগলো, অতিরিক্ত ক্লান্ত। গা গুলোচ্ছে। বমি হতে পারে। তক্তপোষ থেকে উঠে পারা-ওঠা, ছাতা-পড়া বড়ো আরশিটায় নিজের কুৎসিত চেহারাটাকে আরও বিকৃত দেখলো। এবং চারিদিকের পরিবেশে বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রতিদিনের মতো আজও মনে হলো—পালাতে হবে। নেশার জন্য এখানে আসা। নেশা কাটলে এক মুহূর্তও নয়।

এর পর মনে পড়লো কালকের কথা। সরযূকে পাওয়া যায়নি কাল রাতে, মালতীকেও না, কুমুদিনীর পেট খারাপ। ওরা দুর্লভ হওয়ার কারণ, কাল রাত হয়ে গিয়েছিলো। অনেক রাত পর্যন্ত মদের দোকানে কেটেছে। দিশি মদের দোকান। বাইরে ঝাঁপ বন্ধ হয়

নির্দিষ্ট সময়ে, কিন্তু ভিতরে খোলা থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। শস্তা মদ। ভোঁটকা গন্ধ কিন্তু জমায় তাড়াতাড়ি। একটু বদ নেশা হয়। যখন সোডা মেশাবার পয়সা কুলোয় না তখন স্রেফ জল। নেশাটা তখন আরও জমে। তারপর হোটেলে ফেরা যায় না। একটা রিকশা ক'রে এখানেই পৌছোনো সহজ। কিন্তু অতো রাতে সরয়ূ, মালতী, কুমুদিনী চেনা-জানা কাউকেই পাইনি। কার সাঙ্গে রাতটা কাটলো তবে? হঠাৎ হুঁশ হলো অমিতের। মেয়েটার সঙ্গে আলাপই হয়নি কোনো। একটি কথাও না। দেখে মনে হলো এ পাড়ায় নতুন কিন্তু অভিজ্ঞতায় ঝানু। যাক্ গে। অমিত সেজন্য একবিন্দু সময়ের অপব্যয় না ক'রে, নতুন নাগরীকে খুশি ক'রে বেরিয়ে এলো এবং বাইরে এসে মনে হলো, মেয়েটার কোমরের কষিতে দাদ ছিলো না তো!

শরীরে একরাশ ক্লান্তি আর অসুস্থতা নিয়ে হোটেলে ফিরলো। এমন অবস্থা নেই যে, স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে অফিসে যাবার কথা চিন্তা করে। এসেই শুয়ে পড়লো এবং প্রায় বেহুঁশের মতো নাক ডাকতে শুরু করলো। যখন ঘুম ভাঙলো তখন প্রচণ্ড জোরে কড়া নড়ছে, দরজায় ধাক্কাও পড়ছে ঘনঘন। অমিত বিরক্ত হলো এবং এক লাফে ছুটে গেলো দরজার দিকে। যে-ই হোক, যে-কারণেই আসুক কিছু শোনার আগেই তাকে শাসিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু খিল খুলতেই যিনি দেখা দিলেন, বাজখাঁই গলায় তিনিই আক্রমণ করলেন প্রথম—'কি মশাই, দিনে-দুপুরে এভাবে ঘুমোয় নাকি কেউ? দরজা ভেঙে ফেললেও যে ঘুম ভাঙবে না আপনার। আচ্ছা লোক তো আপনি?'

অমিতও খেঁকিয়ে উঠলো। গলাটা সমান পর্দায় চড়িয়ে—'আপনারও তো একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। এ সময় কেউ যদি ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোয় তবে বুঝতে হবে হয় সে অসুস্থ, নয় অন্য কোনো ব্যাপার আছে।'

'আরে মশাই, আপনার সেই অন্য ব্যাপারটা কি সেইটেই জানতে এলুম।' হোটেলের ম্যানেজাব নিবারণবাবু তার বিশাল দেহ নিয়ে চৌকাঠের এপাশে এসে দাঁড়ালেন।

'কি বলতে চান আপনি?'—অমিত ওর ঘোলাটে চোখে সক্রোধে তাকালো।

'আজ কতো তারিখ?'

'টাকা চাইছেন?' অমিত ভ্রূ কোঁচকালো—'সেজন্যে আপনাকে কি কোনোদিন উপরে উঠে আসতে হয়েছে? আমি বেকার না থাকলে ঠিক সময় তা পাবেন। আজ দু-তারিখ। সন্ধ্যে বেলায় দিয়ে আসবো। যান।'

'আমি যাবো কি মশাই। বেশ লোক তো আপনি—'মেদাধিক্যে গোলগাল মুখে পরিহাসের হাসি হাসতে গিয়ে বিকট একটা অভিব্যক্তি ফোটালেন ভদ্রলোক—'ভালোয় ভালোয় টাকা-কড়ি এখনই চুকিয়ে দিন মশাই। বিকেলে যে আপনাকেই চ'লে যেতে হবে। গোছ-গাছ করতে হবে না?'

'কে চ'লে যাবে?'

'আপনি।'

'কেন, আমার অপরাধ?'

বোঝেন না, এটা ভদ্দরলোকের জায়গা। আরও দশ-পাঁচজন বাবুও তো এখানে থাকেন, তাঁরা আপত্তি করেছেন।'

'কেন, কি আপত্তি তাদের? আমি কিছু করেছি?'

'হেঁ, হেঁ, কি যে বলেন। আপনি করতে যাবেন কেন? আপনি একটু বেশি রসিকমানুষ কিনা, অতো রস ওই সব বাবুদের সয় না।'

'নিবারণবাবু, হেঁয়ালি রাখুন। স্পষ্ট ক'রে বলুন কি বলতে চান।'

'আপনি প্রায়ই রাত্তিরবেলা হোটেলে থাকেন না। কোথায় যান?'

'সেজন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে? আমার যা খুশি আমি করবো।'

'বললেই তো হলো না মশাই, যা খুশি তাই করবো। এখানে আরও দশজন ভদ্দরলোক আছেন। আপনার জন্যে শেষকালে তাদের হারাতে যাবো নাকি—'নিবারণবাবু আস্তে আস্তে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়ে উঠলেন—'আপনার সব কীর্তিকলাপ জানা হয়ে গেছে। আর বেশি বকবেন না।'

'কী জেনেছেন আপনারা? কী জেনেছেন?' শরীরটা ভীষণ রকমের খারাপ। একটু ঘুমোনোর ফলে ক্লান্তি আরও দ্বিগুণ হয়েছে। তবু চিৎকার ক'রে উঠলো অমিত।

'রাখুন মশাই, রাখুন। একটু দূরে থেকে বলুন। মুখে যে এখনও গন্ধ ভুর্‌ভুর্‌ করছে। চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে এখনও টইটম্বুর আছেন।'

'সে আর আপনি বলবেন না! আপনাকে আর আপনাদের হোটেলের অনেক মক্কেলকেই তো চিনি। আপনি খুব শুদ্ধ মানুষ, না?'

'সাবধান হয়ে কথা বলবেন অমিতবাবু।'

'তার আগে আপনি একটু ভদ্র হতে চেষ্টা করবেন।'

'আপনার বেলেল্লাপনা তো এখন অন্ধমানুষের চোখে পড়ছে মশাই। কী অতো কথা বলছেন? অ্যাদ্দিন বাইরে-বাইরে মদ-মেয়েমানুষ করতেন, এখন ঘরে বসে চালাচ্ছেন। শেষকালে কি পুলিশের ঝামেলায় পড়বো নাকি?'

রাগে রি-রি ক'রে উঠলো শরীর। চোখদুটো কুঁচকে এলো, হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। অমিত ক্রুর চোখে বিশালবপু মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ—'থামলেন কেন, বলুন কি বলছিলেন।'

'বলবোই তো, হাজারবার বলবো—' নিবারণবাবু হেঁকে উঠলেন—'সেদিন একটা মেয়েছেলে আসেনি আপনার ঘরে?'

'এসেছিলো। তারপর?'

'তারপর কি হয়েছে আমরা বলবো কি ক'রে?' দরজা খুলে কি আর এসব কেউ করে। আমরা শুধু একটা মেয়েছেলের গলার গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনেছিলাম আর দরজায় আড়ি পেতে নাকি কাটা-মুর্গির দাপাদাপিও শুনেছেন এনারা অনেকে। আর—'

'আর! আর কি?' রক্তের স্রোতে দ্রুত একটা হল্‌কা বইলো অমিতের শরীরে। রুগ্নহাতের বজ্রমুষ্টি আছড়ে পড়লো অন্য হাতের তালুতে।

'আর যা হয়, তাই। উনাকে গটমট ক'রে যেভাবে বেরিয়ে যেতে দেখলাম তাতেই আঁচ ক'রে নিলাম কি হবে—'

কিন্তু সময় দিলো না অমিত। প্রচণ্ড একটা ঘুসিতে ওই বিশাল-দেহী মানুষটার থুত্‌নি উড়িয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারলো না। পিছনের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মানুষটা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। অমিত আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো। কিন্তু ওদের বাদানুবাদ তর্কের গর্জনে যে সব ঠাকুর-চাকর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো, তারা এসে সরিয়ে নিলো। কিন্তু অমিতের চিৎকার থামেনি তখনও—'শালা ছোটোলোক, ইতর। স্কাউণ্ড্রেল মেয়েছেলে বলিস, ভদ্রমহিলা বলতে পারিস না। জানিস ও কে? তোর মতো কয়েক ডজন জানোয়ারকে ও লাথি মেরে শিখিয়ে দিতে পারে ভদ্রতা কাকে বলে।'

কিন্তু নিবারণ ভট্টাচার্য্যও মার খেয়ে স'রে যাবার মানুষ নয়। শরীরটাই তার বিড়ম্বনা। দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরছে। ঠোঁট বেয়ে পড়ছে। অনেক কষ্টে চাকরের পিঠে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সাময়িক পরাজয়ের গ্লানিটা কোনোমতে স'য়ে নিয়ে চোখ রাঙিয়ে তাকালেন অমিতের দিকে—'আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। আর সব বাবুরা আসুক। আমি এর হেনেস্তা করবো। আমি পুলিশ ডাকবো। এই হরে, গোপাল, ভোলা তোরা দেখলি সব, তোরা সাক্ষী রইলি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ যান। ডাকুন পুলিশ। আপনি না ডাকলে আমিই ডাকবো। একজন ভদ্রমহিলাকে আপনি ওভাবে এতোগুলো মানুষের সামনে অপমান করবেন। সাহস তো কম নয় আপনার।'

কুকুরের ঘেউ-ঘেউ-এর মতো আরও কিছুক্ষণ দুজন দুজনকে শাসালো। অন্যজন কি বলছে বা বোঝাতে চাইছে জানার চেষ্টা করলো না কেউ কিন্তু চেঁচালো। তারপর নিবারণ ভট্টাচার্য তার অনুচরসহ প্রস্থান করলে দরজা বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করলো অমিত। এরপর এখানে থাকা বা একা একটি ঘরে আলাদাভাবে বসবাস করার সুখ যে সাঙ্গ হলো তা বারবার অনুভব করলো এবং অস্থিরতা আরও বাড়লো।

আবার কড়া নড়লো দরজায়। অমিত দরজা খুললো। বনমালী।

'বাবু চিঠি—' কাঁচুমাচু হয়ে বনমালী ওর চিঠিটা এগিয়ে দিলো—'কাল বিকেলের ডাকে এয়েছে। রাতে ছিলেন না, সকালে কখন এয়েছেন টের পাইনি।'

অমিত চিঠিটা হাতে নিয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলো। বনমালী বললো—'চিঠির বাক্সে কয়েকজন বাবু আপনার চিঠির খোঁজ করেন রোজ। হাসাহাসি ক'রে কতো কি বলেন। তাই আমি পিয়নের কাছে চেয়ে লুকিয়ে রেখেছি বাবু।'

'আচ্ছা যা—' অমিত দরজা বন্ধ করলো।

নানা কারণেই শরীরটা বিপর্যস্ত আজ। তার উপর মেজাজটা আরও তিরিক্ষি ক'রে দিয়েছে লোকটা। অমিত একবার ভাবলো চিঠিটা পড়বে না। সেই ভেবে টেবিলের উপর চিঠিটা রেখে শুয়েও পড়লো। একটা সিগারেট ধরালো। একটু ঘুমোবে ভাবলো। কিন্তু ঘুম যখন এলো না এবং স্নান না করলে ঘুম যে আসবে না যখন বুঝলো, তখনই আবার উঠে চিঠিটা খুললো। পড়লো। মার চিঠি। নিজের হাতে লেখেননি। কাউকে দিয়ে

লিখিয়েছেন। ছেলেব কুশল জানতে চেয়েছেন, সে সঙ্গে দশটা টাকা। একবাব গ্রামে এলে ভালো হয। ছেলেকে দেখাব শখ।

অমিত চিঠিটা বাখলো টেবিলেব উপব। বেশ কিছুদিন পরে পবেই চিঠি লেখেন মা। পৃথিবীতে এখনও এই একটি প্রাণী আছে যাব কথা অমিত ভাবতে পাবে। কিন্তু দশটা টাকা! দেশ-গ্রামে দশটা টাকাব মূল্য যে কতো অমিত জানে। নিবক্ষর চাষী-মানুষ দাদা। এক ঝাঁক ছেলে-মেযে আব বৌ নিয়ে দিব্যি আছেন। চাষ-বাস কবেন, গৃহস্থালী নিযে জীবন। গাঁয়ে লোকেব কাছে মা-ব গর্ব তাব বড়ো ছেলে নয, অমিত। অমিতের জন্যই তিনি গাঁযেব মানুষেব কাছে বত্নগর্ভা। অমন এম-এ পাশ ছেলে, কলকাতা শহবে থাকে। নিশ্চয সাহেব-সুবোব মতো আবামে দিন কাটায। আব সেজন্যই গাঁযেব লোকেব কাছে মা হতভাগিনী, আমিও নিন্দিত। অমন উপযুক্ত ছেলে—মাকে দেখেও না একবাব। ঘবেব চালাটা যে আজ তিনবছব ধ'বে পড়ো-পড়ো সে খববটাও কি পায না?

অমিতেব হাসি পেলো। কী অদ্ভুত মানুষগুলো। ওবা জানে না, এ ডাইনি শহবে কী কুৎসিত ভাবে বাঁচতে হয একটা মানুষকে। কুকুবেব মতো জঘন্য জীবন নিযে বাঁচতে হচ্ছে আমাকে। কী কুৎসিত হয়েছি আমি। তৃপ্তিব মতো মেয়েকেও আমাব জন্য এ বকম অপবাদ পেতে হয়।

কিন্তু দশটা টাকা। দশটা টাকা পাঠাতেই হবে মাকে। কিন্তু—অমিত ভাবলো। কালকেব রাতে অতোগুলো টাকা উড়িয়ে দেবাব পব মাকে দশ টাকা পাঠালে কটা টাকা থাকে পকেটে। নিবারণবাবুর কাছে কি সম্মানটা বাঁচানো যাবে বাকি টাকায়?

অমিত স্নানের জন্য প্রস্তুত হলো।

বিকেলে অফিস ফেরত ঘবে ঢুকেই অবাক হলো লোকেন। অমিতকে এ সময়ে ওব বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখাটা ওর বিস্ময়

নয়, বিস্ময় তক্তপোষের পাশে অমিতের বিখ্যাত সেই টিনের বাক্শো, মাত্বরে জড়ানো ছটো বালিশ আর কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ।

'কি রে এ সময়ে তুই ?'

অমিত একটা বই পড়ছিলো। বন্ধুর আগমনে বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে ধীর গলায় বললো—'এই এলাম।'

'এলি তো দেখতেই পাচ্ছি। এগুলো কি।'

'আমার সংক্ষিপ্ত সংসার।'

'হোটেল থেকে নিয়ে এলি যে ?'

'কারণ হোটেলে আর ফিরবো না।'

'থাকবি কোথায় ?'

'কেন তুই ঠাঁই দিবি না ?'

লোকেন অমিতের হাত থেকে বইটা হ্যাঁচ্কা টানে কেড়ে নিয়ে তক্তপোষে বসলো—'কি হয়েছে বল্।'

'ছুশ শালা, ওটাও আবার ভদ্রলোকের জায়গা। হেল্-গেট-ক্যাস্‌ল্ ছাড়া কি আমাদের চলে ? নে, নে চা বল্। তেষ্টা পেয়েছে।'

'ছুপুরে খেয়েছিস্ ?'

'উঁহু—'

'না মানে! অফিসে গিয়েছিলি ?'

'নাঃ—'

'মানে! তাহলে চাকরি থাকবে কি ক'রে তোর ?'

'খু—উ—ব থাকবে। ওই অশিক্ষিত ব্যাটারা আমার মতো একটা লোক পেয়েছে। ওদের ভাগ্যি। ছাড়বে কিরে, পূজো করবে না ?'

'উঃ, তোকে নিয়ে তো পারি না আর। দোহাই তোর, এবার একটু ক্ষ্যামা দে—' লোকেন রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো—'খ্যাপামি ক'রে চাকরি ছাড়বি, হোটেলে ঝগড়া করবি, যাকে-তাকে চটিয়ে দিবি এতো ছুর্ভোগ কে সইবে তোর জন্যে ?'

'কেন, তুই—'

'থাম, থাম, আর বাজে বকতে হবে না—'লোকেন ওর শার্ট খুলতে গলা-মুখ ঢেকে তুহাত উপরে তুললো। জামাটা ব্র্যাকেটে রেখে একটা তু'ভাঁজ-করা ছেঁড়া ধুতি কোমরে ফের দিয়ে লুঙি ক'রে পরলো। অফিসের ধুতিটা কুঁচিয়ে রাখতে গিয়ে দেখলো, অমিত আবার বই নিয়ে পড়েছে।

অমিত যে বইয়ের দোকানে কাজ করে, প্রুফ দেখে, সেটা বড়ো একটি প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান। তার মালিক নিজেও একজন সাহিত্যিক। সেদিন অমিত জানতো না, কার উপন্যাসের প্রুফ দেখছে। হঠাৎ মালিকের কাছে গিয়ে সোজা ব'লে বসেছে—'এ সব বই আপনারা ছাপেন কেন? কুৎসিত লেখা।' সেদিনও ওকে ক্ষমা করেছিলেন মালিক। কিন্তু তারপর একদিন আবার একটা প্রুফ নিয়ে হাজির—'কি করেছেন মশাই। এ যে স্রেফ চুরি! পুকুর চুরি! প্রায় তিরিশ বছর আগে হাক্সলি এ উপন্যাসটা ইংরেজিতে লিখেছিলেন। আর অষ্টম সংস্করণেও কেউ আপনাদের কাছে তার প্রতিবাদ করেনি! তাজ্জব ব্যাপার!' এবং তারপর থেকেই চাকরিটা টলছে। অমিতের মুখ থেকেই সব শুনে ওর চাকরির অবস্থাটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছে লোকেন। বুঝেছে—মালিক ওৎ পেতে আছে। নিতান্তই সম্মান রাখতে ওই কারণে জবাব দেয়নি। কিন্তু এবার একটা সামান্য খুঁত পেলেই আর রক্ষা নেই। চাকরিটা যাবে।'

লোকেন অফিস থেকে ফিরেই কিছুক্ষণ শুয়ে কাটায়। বিশ্রাম করে। হাত-পা ধোয়ার বালাই নেই। কিন্তু তক্তপোষটা আজ অমিতের দখলে। এবং বন্ধুর কাজটা যে ওর কাছে সমর্থনযোগ্য নয়, —সেটুকু বোঝানোর জন্যই লোকেন আপাতত অমিতকে পরিহার করতে চাইলো। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ অমিত ডাকলো—'শোন।'

কী বল্।

রাগ করেছিস ?

তুই কাজে গেলি না কী ব'লে ? লোকেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতো ধমকে উঠলো। কৃত্রিম নয়। রীতিমত শাসন—'তুই নিজেকে যতো বড়ো মহাপুরুষ ভাবতে চাস, ভাবতে পারিস। ঘরে ব'সে ভাব। আসলে তো জানিস ওই লোকগুলো ব্লাণ্ট। এখন যদি চাকরিটা যায় ?'

'যাবে।' অমিত হাসলো।

'ঠাট্টা হচ্ছে ? এবার চাকরি গেলে কোন শালা তোর জন্যে মাথা ঘামায় আমি দেখবো। আমি কেন, আমার চোদ্দো পুরুষেরও সাধ্যি নেই তোকে আবার চাকরি জুটিয়ে দেয়।'

'আমাকে দশটা টাকা দিবি তো লোকেন ?'

'কী ? লোকেন চোক কুঁচকে চমকে উঠলো।'

'দশটা টাকা। মাকে পাঠাবো।'

'কেন, আজ কতো তারিখ ?'

'তিন চার পাঁচ হবে একটা।'

'পরশু মাইনে পেয়েছিস। কী হলো টাকা ?'

'কটা টাকা। থাকে নাকি বেশিদিন।'

'আমাব টাকাও লক্ষ্মীর অক্ষয় আশীর্বাদ পায়নি। পারবো না।' লোকেন দ্বিতীয় কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না। বেরিয়ে গেলো রেগে।

অমিত হাসলো এবং আবার বই খুলে পড়তে লাগলো।

তেইশ

একটি নয়, দুটি গানই গাইতে হলো শান্তাকে।

শান্তা গায়িকা নয়, অন্তত মঞ্জুশ্রী যে অর্থে গায়িকা। মঞ্জুশ্রী স্কুলে গান শেখে, ইতস্তত জলসায় গায়। তবু সকলের অনুরোধে শান্তা গাইলো—'যখন এসেছিলে অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি—'। গুণী শিল্পী মৃন্ময়ী রায়। মাসে একবার অন্তত রেডিও-অফিসের আমন্ত্রণ পায় আজকাল। কিন্তু যেহেতু সেতারটা বাড়িতে, সে কারণেই মির্জাপ আঙুলে রেখে খুশি নাড়লো সারাক্ষণ। তারিফও করলো সবাই —নুনকাটা না হ'লে মাংসটার অমৃত হবার সম্ভাবনা ছিলো প্রচুর। পিকনিকটা মোটামুটি জমেছিলো ভালোই। সামনে পুজোর ছুটি। হঠাৎ খেয়ালে এ সময়েই একটা পিকনিকের হুজুগ তুললো কয়েকজন। বেশি নয়, ক্লাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চারটি মেয়ে, পাঁচটি ছেলে। সারাদিন হৈ চৈ আর চেঁচামেচি ক'রে বোটানিকসে আসা, স্থান নির্বাচন ক'রে উনুন সাজানো, রান্না এবং সব শেষে খাওয়া। আড়াইটা বাজলো। একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের উপরই বসলো সবাই। কেউ শুয়ে, কেউ ব'সে। ঠাট্টা, রসিকতা, গান। উল্লাস আর উচ্ছ্বাস।

'সাহিত্যিক, একটা কবিতা বলো।' মৃন্ময়ী প্রস্তাব করলো শান্তার গান শেষ হবার পর।

গোবেচারি বিমল চুপচাপ ছিলো। একটু লজ্জিত হলো। ওকে রক্ষা করলো ঝণ্টু—'না রে, চুপ ক'রে থাক। ও সব অশিক্ষিতদের কথায় কান দিস্ না।'

'অশিক্ষিত বলছো কেন?' মৃন্ময়ীর প্রতিবাদ।

'কবিতা বলবে কি? ভদ্রভাবে বলতে পারো না? বলো, আবৃত্তি করো। ঝণ্টু শুয়ে ছিলো, উঠে বসলো। ওর পেটে রুমাল পেতে মাথা

রেখেছিলো অলোক। ওকেও উঠতে হলো ধাক্কা খেয়ে।—তোমাকে গান বলতে বলেছে কেউ?'

সবাই কোরাসের সুরে হাসলো।

'মঞ্জু তুই বরং আরেকটা গা'—শান্তা মঞ্জুশ্রীর বিনুনি ধরে টান দিলো।

'তার আগে বিমল আবৃত্তি করুক।'

'হ্যাঁ, বলো আবৃত্তি, নয় তো কবিতা পাঠ—' ঝণ্টুকে খুশি মনে হলো। আরও কিছু অনুরোধের অত্যাচারে বিমলকে মুখ খুলতেই হলো এবং বিষ্ণু দের একটি দীর্ঘ কবিতার দুটি স্তবক এগিয়েই যখন তোতলাতে লাগলো ঝণ্টু ধরিয়ে দিলো। কিন্তু তারপরও যখন আবার আটকালো তখন মুচকি হেসে ওকে কিছুটা সময় দিলো বন্ধুরা। তথাপি যখন স্মৃতিমন্থন সম্ভব হলো না, তখনই হাসিতে ফেটে পড়লো সকলে।

'কেন, বাপু—অলোক বেরসিক। কবিতা-টবিতা ওর মাথায় ঢোকে না। বিমলের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বললো, পাঠমুখস্থ না ক'রে স্টেজে নাবা কেন। প্রমটারে কতক্ষণ চলে?'

'আমি তো তোদের মতো কবিতা মুখস্ত করি না, আমি কবিতা পড়ি।'

'হুঁ, বিমল স্মার্ট হয়েছে।'

সত্যি বিমল যে এতো তাড়াতাড়ি এমন একটা চতুর উত্তর দেবে কেউ ভাবতে পারেনি। তাই ঝণ্টুই প্রথম তাকে অভিনন্দন জানালো।

তারপর পরপর আরও দুটো গান গাইলো মঞ্জুশ্রী। শান্তা আরও একটা। পাঁচটি যুবক আর চারটি যুবতী। হাসিতে, গানে, আনন্দে বোটানিকাল গার্ডেনের একটা নিরিবিলি কোণ ভ'রে রইলো কিছুক্ষণ। দুপুরের তীব্রতা বিকেলের রঙে বিষণ্ন হলো। বিষাদ নামলো কয়েকটি মুখে। আকশের বৃহৎ সূর্যটা যেন একটু তাড়াতাড়ি পেরোলো আজ।

সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরে যে-যার হাঁড়ি-খুন্তি নিয়ে ঘরের দিকে ফিরে গেলো। যে কারণে পুলকেশ আর মৃন্ময়ী এক সঙ্গে যাবে ব'লে একই বাসে উঠলো, ঠিক সেই কারণেই শান্তা ঝণ্টুর জন্য অপেক্ষা করলো। সবাই একে একে চ'লে গেলে শান্তা ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে বললো—'তারপর ?'

'তুমি ক্লান্ত ?'

'মোটেই না। তুমি ?'

'আমার ঘুম পেয়েছে।'

'ঘুম ?' শান্তা সকৌতুকে হাসলো।

'বেলা ক'রে খেলে আমার ভীষণ ঘুম পায়।'

'বাপের আদুরে ছেলে—'

'সব বাপই তাদের ছেলেদের আদর করেন। সে আর নতুন কথা কি ? তবে কি জানো, যেখানে-যেখানে আদরটা অর্জন করতে হয়, মনে হচ্ছে, সেখানে ঠিকমতো আদায়-পত্তর হচ্ছে না।'

'কেন, দাদা-বৌদি তো সব-সময়ই দুধের বাটি নিয়ে ব'সে আছেন।'

'বাপ-মা-দাদা-বৌদিতেই কি পৃথিবীটা আটকে আছে নাকি ?'

শান্তা চটুল হাসি হাসলো—'তবে কি দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী এসে আদর করবেন ভেবেছো।'

ঝণ্টুও হেসে উঠলো—'বেশ চালাক হয়েছো তো।'

'পাগল ! এতো সহজে ধরা দিতে আছে।'

'আচ্ছা—' ঝণ্টু শব্দ ক'রে হেসে উঠলো এবার—'এতো উন্নতি হলো কবে থেকে ? এ সপ্তাহে কী বাংলা সিনেমা দেখেছো বলো তো।'

'চলো চলো। আমাকে পৌঁছে দেবে—' শান্তা হঠাৎ কাজের কথা বলার মতো ভঙ্গি ক'রে তাড়া দিলো।

'পৌঁছে দেবো ! এখন ?'

'হ্যাঁ এখনই তো। নইলে তোমার সঙ্গে সারারাত ঘুরে বেড়াবো নাকি ?'

'আমি পারবো না। একা যাও।'

'বাঃ, আমি ব'লে এসেছি যে।'

'কোথায় ব'লে এসেছো। কা'কে আবার কী ব'লে এলে?'

'বাড়িতে। মাকে, বাবাকে, দাদাকে, বৌদিকে। আমার এক দিদি আছেন জানো তো। আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়ো। পরশু শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। ওকে বলতে গিয়েই তো সবাইকে বলা হয়ে গেছে।'

ঝণ্টুর বিস্ময় ফুরোয় না। হাসতে-হাসতে বান্ধবীর দিকে তাকালো—'কি বললে।'

'কী আবার বলবো। আমার বন্ধু, একসঙ্গে পড়ি, ভালো ছাত্র, একটু বোকা—'

'বেশ বলেছো। কিন্তু মাপ করো, আজ পারবো না।'

'কিন্তু সকালে বেরোবার সময় দিদি-বৌদি যে আমাকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন।'

'তাহোক—'

'তাহোক মানে? তোমাকে যেতেই হবে আজ।'

'উঃ—'

শান্তা হাসলো—'লজ্জা করছে?'

'ওসব আমার নেই।'

'তাহলে কি, ভয়? না, না, ভয় নেই। দাদা খুব স্বাস্থ্যবান নন। শান্ত-শিষ্ট অধ্যাপক মানুষ।'

'আরে ধ্যেৎ, সেজন্য পরোয়া করি নাকি কাউকে' ঝণ্টু জামার গোটানো হাতা দুটো দুহাতে নাড়লো। একটু ইতস্তত করলো—'তবে—'

'তবে আর কি। চলো—'

অগত্যা রাজি না হয়ে উপায় নেই। ওরা বাসে উঠলো। পাশাপাশি বসলো দুজন।

এবং সেই রাতে বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা নিয়ে শান্তাদের বাড়ি থেকে ফিরলো ঝণ্টু। শান্তাকে যেন দ্বিগুণ ক'রে ভালো লাগলো। এতো মার্জিত, ভদ্র, শিক্ষিতা মহিলার পূর্ণ গৌরব পাবার মতো এতো প্রচুর গুণ কোথায় পেয়েছে শান্তা, তার সূত্র আবিষ্কার করতে পেরে সারাদিনের আনন্দেব পব বাকি রাতটাকেও যেন ভালো লেগে গেলো। নিজের পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রতা, রক্ষণশীলতা, খুঁটিনাটি দৈনন্দিন কলহের তিক্ততাকে মনে ক'রে শান্তাকে ঈর্ষাও করতে ইচ্ছে হলো। এত সহজ, সুন্দর, উদার পরিবার তাহলে আছে এ শহরে। মধ্যবিত্ত জীবনেব এতো সুখ, এতো ভরাট শান্তি। বৌদিকে নিজের সংসারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজের সংসারের চেহারাটা মনে মনে কল্পনা করলো ঝণ্টু। শান্তার বৌদির মতোই আমাদের বাড়িটাকে সাজাতেন বৌদি, শান্তার দাদার মতোই সহৃদয় হতেন সেজদা। শান্তার শিশু ভাইঝিটির মতোই আমাদের ঘরে মেঝেয় দুষ্টুমি করতো, হামাগুড়ি দিতো, খেলতো বৌদির সন্তান। আশুতোষ মুখার্জি রোডে এসে সেজন্যই একটু বিষণ্ণ বোধ করলো। নিজের ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করলো না। সামনেই বৌদির বাড়ি। আস্তে আস্তে হেঁটে, নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে পথেই এগোলো। বারবার মনে হলো—এত সাদরে সসম্মানে আমাকে নিয়ে গিয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়েছে শান্তা। কিন্তু জানলো না, অজান্তে কতো বড়ো আজ ঠাট্টা করলো আমাকে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িতেই একটা জানলা পড়ে। জানলাটা খোলা ছিলো। ঝণ্টু একটু থমকে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকালো। টেবিলের বাতি জ্বেলে একমনে টাইপ ক'রে চলেছেন সেজদা। পাশে একটা চেয়ারে ব'সে কী একটা সেলাই করছেন বৌদি। বোধহয়, অল্প ছিঁড়ে যাওয়া একটা ব্লাউজ।

'কাল সকালে গয়লা এলে তুমি একটু ধমকে দিয়ো তো।' বৌদি দাঁতে সুতো কেটে আস্তে বললেন।

'হুঁ, আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। এই করি—' পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ সরিয়ে সেজদা টাইপ-রাইটারের দিকে তাকালেন।

'বারে, পরপর তিনদিন ধ'রে সমানে দুধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছু বলবে না। আমি, নিধুর-মা বললে লোকটা পেয়ে বসে।'

'ছাড়িয়ে দাও—' ঝামেলা এড়াতেই বোধহয় সেজদা এই রায় দিলেন।

'বাঃ, চমৎকার সমাধান—' বৌদির কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না—'বাড়ি ভাড়ার রসিদ এনেছো?'

'আনবো এখন।'

'তিনদিন আগে ভাড়া দিয়েছো, এখনও রসিদটা নিয়ে আসতে পারলে না। তোমাকে দিয়ে কী হবে বলো তো।'

'হবে হবে—' সেজদা অন্যমনস্ক।

'কী হবে?' বৌদি হাসলেন।

'সব —' একটু থেমে বৌদির দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম ক্রোধে ধমকে উঠলেন সেজদা—'চুপ করো তো। যতো গোলমাল এই কাজের সময়।'

বৌদি হাসলেন—'আচ্ছা বাপু, করো কাজ করো। সারাদিন খালি কানের কাছে খট্‌খট্‌। বিরক্তিকর।'

ঝণ্টু ঘরে ঢুকলো।

'কে ঝণ্টু? এসো এসো'—তৃপ্তি চেয়ার থেকে উঠে অভ্যর্থনা জানালো—'পরশু আসতে বললাম এলে না কেন?'

ঝণ্টু ওর এলোমেলো চুলগুলোর উপর হাত বুলিয়ে নিলো—'ইউনির্ভাসিটিতে একটা কাজ ছিলো বৌদি। আসতে পারিনি।'

'তাতে কি। এসো বোসো। তোমাকে অতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?' তৃপ্তি ওকে খাটের উপর এনে বসিয়ে দিলো—চা খাবে?'

'না।'

'না! বলছো কি চায়ে আপত্তি তোমার?'

'পিকনিকে গিয়েছিলাম দুপুরবেলা। এতো বেলায় ভাত খেয়েছি, শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে। তাছাড়া এই তো একটু আগে চা খেয়ে এলাম।'

'পিকনিক! কোথায়?'

'বোটানিক্‌সে—'

'বেশ আছো—' তৃপ্তি হাসলো।

'কি রে মা কেমন আছেন?' তখনও টাইপ ক'রে চলছিলো কল্যাণ। ভাইয়ের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলো।

'ভালো।'

'বাবা?'

'ভালো।'

'দাদা, বৌদিরা সবাই ভালো।'

'আছে এক রকম।'

কল্যাণ নতুন লাইন শুরু করতে টাইপ-রাইটারের কানে মোচড় দিলো। এবং আর কোনো প্রশ্ন করলো না।

'তোমাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন? কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিরকম গম্ভীর।'

'কই না, শরীরটা বিচ্ছিরি ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে।'

'শান্তা কোথায়? ও আর এলো না তো।'

ঝণ্টু দাদার দিকে তাকালো। ঝণ্টুর দৃষ্টির গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে তৃপ্তি মৃদু হাসলো।

'আসবে। বলবো আসতে।' ঝণ্টু খুব নীচু গলায় বললো।

'কি রে, পড়াশুনা করছিস্ কিছু?' এবারও কল্যাণ কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই ভাইকে প্রশ্ন করলো।

'করছি।'

'ফার্স্ট ক্লাশ হবে?'

ঝণ্টু নিরুত্তর। তৃপ্তি ঝাঁজিয়ে উঠলো—'তুমি কাজ করো তো।

মাঝে মাঝে: কে তোমাকে কথা বলতে বলছে। এসো তো ঝণ্টু, আমরা বারান্দায় যাই। ওখানে হাওয়া আছে। তোমার ভালো লাগবে।'

'ওকে দিয়েছো ওটা। দেখাও, পছন্দ হলো কিনা।' কল্যাণ এবার এক পলকের জন্য স্ত্রীর দিকে তাকালো।

'সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি দেখছি।' স্বামীর কথা ফুরোবার আগেই তৃপ্তি ঝণ্টুর উপর নিজের অধিকারটা পুরোমাত্রায় দাবি করতে চাইলো।

'কি বৌদি? কি জিনিস?' একটু অবাক হয়ে বৌদির দিকে তাকালো ঝণ্টু।

'তোমাকে একটা প্রাইজ দেবো।'

'প্রাইজ?'

'হ্যাঁ, একটু বোসো। আসছি ' হাসতে হাসতে ঘরের কোণে এগিয়ে গেলো তৃপ্তি।

নতুন কেনা আরশি-বসানো বড়ো আলমারি থেকে কি একটা খুঁজে আনলো এবং কাছে এসে যখন হাতের ছোটো বাকশোটা খুললো, দেখে বিস্মিত হলো ঝণ্টু—নতুন ঝকঝকে দামি একটা ঘড়ি।

'এ কি করেছো—'

'চুপ—' ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে তৃপ্তি সহাস্য শাসন করলো। দেবরের হাতটা টেনে নিয়ে অনেক পরিশ্রম ক'রে এবং অনেক সময় লাগিয়ে ঘড়িটা মণিবন্ধে পরিয়ে দিলো। দিয়ে খুশি হলো। ঝণ্টুর কাঁধে হাত রেখে, ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বললো—'পছন্দ হয়েছে?'

নিজের হাতটা নেড়েচেড়ে দেখছিলো ঝণ্টু। বৌদির দিকে চোখ তুলে নিঃশব্দে হাসলো।

'অনেকদিন আগে কথা দিয়েছিলাম। প্রাইজ দেবার মতো একটা ভালো উপলক্ষ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই দেরি হয়ে গেলো।' তৃপ্তি একহাত ঝণ্টুর কাঁধে রেখে অন্য হাতে দেবরের মাথার চুলে

আঙুল বুলিয়ে দিলো।

'আজ কি এমন উপলক্ষ পেলে?'

'পেয়েছি।'

'কী সেটা?'

'বলবো?' বয়েস ভুলে চপল হলো তৃপ্তি।

'বলো—'

তৃপ্তি মাথা নাবালো। কানের কাছে মুখ এনে ফিশফিশিয়ে বললো—'শান্তা।' তারপর উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লো দুজনেই। ওদের হাসিতে টনক নড়লো কল্যাণের। ফিরে তাকালো—'কিরে, পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'পড়াশুনো করছিস, বইপত্র আছে?'

'আছে কিছু কিছু।'

'কিছু কিছু থাকলে চলবে কি ক'রে? পড়বি কি?'

ঝন্টু বৌদির দিকে তাকিয়ে চুপচাপই রইলো।

'তোর বৌদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাস্। কিনে নে শিগগির। বাংলায় পড়ছিস্। ভালো রেজাল্ট না করলে কিছু হবে না।' কল্যাণ ওর কাজে মন দিলো।

ঝন্টুকে নিয়ে বারান্দায় এলো তৃপ্তি।

চব্বিশ

আজকাল প্রায়ই একটা অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করে অমিত। আবার সেরেও যায়। অর্থাভাবে ডাক্তারেব পরামর্শ সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেদিন সকালে ডাক্তার না ডেকে উপায় ছিলো না। নিজের উপার্জনের সামান্য সঞ্চয়টুকু নিমেষেই উড়ে গেলো ওষুধে-ডাক্তারে। বৃদ্ধ ডাক্তার। রোগীর পেট ঠুকে নাক সিঁটকোলেন, কপাল কোচকালেন, তিরস্কার করলেন প্রচুর। প্রত্যুত্তরে শুধু হাসলো অমিত এবং সেই অবহেলার হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে ডাক্তারকেই ফিরে যেতে হলো।

লোকেন ব্যাস্ত হয়ে পড়লো। অর্থসংগ্রহের চিন্তা, শুশ্রূষা সে সঙ্গে অতিরিক্ত ভাবনা—এভাবে কামাই করলে অমিতের চাকরিটা থাকবে কিনা। লোকেন নিজে তিনদিনের ছুটি নিলো এবং এই তিনদিন বন্ধুকে এক মুহূর্তেব বিশ্রাম না দিয়ে অমিত কাতবালো। ছুটির শেষদিন কোনোরকমে একটু সময় ক'রে অমিতের অফিসে এলো লোকেন। মালিকের সঙ্গে দেখা করলো। নিজের চাকরির জন্য অমিতও যা করতো না লোকেন তাও করলো। অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতি। কিন্তু মালিক তার কথা ফেরালেন না। মাথা নীচু ক'রেই লোকেনকে ফিরতে হলো।

আশ্বিন মাসের দুপুর। খুব তাতানো রোদ না হলেও সারাদুপুর ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে কিছুটা খুশি হলো। অমিত ঘুমোচ্ছে। এভাবে শান্ত হয়ে ও যে ঘুমোতে পারবে কোনোদিন সেরকম সম্ভাবনার কথা মনে আনতেই পারেনি লোকেন। ওই ঘুমন্ত বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। পাশে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলো। তারপর নিজে উঠলো। স্নান করতে হবে, খেতে হবে। বেলা তখন তিনটে।

যাবতীয় চিন্তা, ভাবনা এবং মানসিক অস্থিরতার পর এই সামান্য স্বস্তিটুকুই লোকেনকে তাড়াতড়ি কাজ করার প্রেরণা দিলো। সে'সঙ্গে একটু ঘুমোবারও অবসব। ঘরের আরেক অংশীদার রমেন। অফিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত সারাদুপুর খালিই প'ড়ে থাকবে ওর তক্তপোষটা। লোকেন সে।ানে ঘুমিয়ে পড়লো।

বেশিক্ষণ নয়, ঘন্টাখানেক পবেই ঘুম ভেঙে দেখলো বিকেল হয়েছে। স্যাঁতসেঁতে ভেজা ঘরটায় অন্ধকার জমেছে। আর অন্ধকারে ছায়ার মতো ব'সে সিগারেট টানছে অমিত। ধড়মড় ক'রে লাফিয়ে উঠলো লোকেন—ফের, ফের তুই সিগারেট টানছিস।

'একটা—'

'একটা! একটাই তোকে কে খেতে বলেছে?'

'কী বল ছিস লোকেন, দু-একটা সিগারেট খেতে পারবো না? সেকি, তাহলে যে এমনিতেই ম'রে যাবো। তা পারে নাকি কেউ?

'কিন্তু ডাক্তাব বলেছে—'

'ডাক্তাব তোর অনেক কিছুই বলে।'

লোকেন সুইচ টিপলো। আলোর অতর্কিত আক্রমণে চোখ ঢাকতে ফেল্‌ট্‌ ক্যাপের মতো কপালে হাত রাখলো অমিত।

'ওই সিগারেটটা ফেলে দে—'লোকেন গুরুজনেব মতো গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলো।

'না, না এই একটা। প্লিজ্‌—' তামাক টানার মতো পরপর কয়েকটা টান দিয়ে অমিত করুণ দৃষ্টিতে তাকালো বন্ধুর দিকে।

'বলছি, ফেলে দে—'

'দাঁড়া, দিচ্ছি। দাঁড়া, এই একটু—'

লোকেনের দয়া হলো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে। সাতদিনের অনাহারী ভিখিরিও বোধহয় এক থালা পান্তা ভাতের জন্য এতোটা হ্যাংলামি করে না। এগিয়ে গেলো ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাটার দিকে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে ছুঁড়ে দিলো বন্ধুর গায়ে – 'বলছি ওটা ফেলে দে। নে, এর একটা খা।'

'আরে শালা—' অমিত থাবা দিয়ে প্যাকেটটা তুলে নিলো—'এতো দামি সিগারেট। দূর, গলায় ধরবে না।'

'খুব ধববে। ডাক্তার তো বারণই করেছিলো। আমি জোর ক'রে বলতে বললো যে এর ছটো-একটা খেতে পাবে।'

'আরে, এ তো বাজাবা খায়।'

তুইও রাজা হ।' লোকেন নিজে একটা সিগারেট ধবালো। অমিতেব ওষুধের প্যাকেট থেকে নয়, নিজের শস্তা সিগারেট।

'আমার কি ইচ্ছে কবে জানিস লোকেন—'হাতের আধা-জ্বলন্ত সিগারেট জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে নতুন প্যাকেটের সেলোফেন কাগজ খুলতে-খুলতে অমিত বললো—'শুধু ইচ্ছে নয়, আমার জীবনেব শেষ অ্যামবিশান বলতে পারিস। যদি খুব টাকা পেতাম, প্রচুর টাকা, তবে প্রাণ ভ'বে বিলিতি মদ খেয়ে দেখতাম একদিন। ছুশ্ শালা, সে আর হলো না—'

'ছুপুরে ওষুধ খেয়েছিলি ঠিক মতো?' লোকেন অমিতেব কথার ধার ঘেঁসেও গেলো না।

অমিত মাথা নেড়ে জানালো খেয়েছে।

লোকেন শিশিটা তুলে দাগ পরীক্ষা করলো। পাউডারের প্যাকেটটা খুলে গুণে দেখলো—'আজ রাত পর্যন্ত চলবে।'

'হুঁ'—

'কাল আবার নতুন ওষুধ কিনতে হবে।' লোকেন চিন্তিত হলো। ভাবতে-ভাবতে একবার জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আবার অন্যদিকের দেয়ালের মুখোমুখি। কাল অফিস থেকে কিছু অ্যাডভান্স নেবে কিনা ভাবলো।

'ভাখ লোকেন, ওসব অষুধ-টষুধে কিছু হবে না বুঝলি—'দামি সিগারেটের ধোঁয়া গিলে অমিতকে বেশ একটু তৃপ্ত মনে হলো।

'তাহলে কিসে কি হবে ?'

'আমায় একটু ঘুরে আসতে দে। আমি সব ঠিকঠাক ক'রে ফিরবো।'

'অমিত, ফের যদি তুই এসব কথা বলবি তোকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো এখান থেকে—' লোকেন গলা ফাটিয়ে গর্জে উঠলো—'আমি মরছি শালা নানা ভাবনা ভেবে ভেবে আর উনি ভাবছেন মদের ভাবনা।'

'তাহলে মদ না খেয়ে থাকবো নাকি এতোদিন ?'

'আমার কাছে থাকতে হ'লে তাই থাকতে হবে। লিভার ব'লে মানুষের শরীরে যে একটা বস্তু থাকে জানিস্, তোর শরীরে সেটার কোনো অবশিষ্ট নেই। প'চে গেছে।'

'তাহলে তো সেরেই গেলো—'অমিত সহজভাবে হাসলো—'থাকলেই তো ভাবনা। না থাকলে আর কি ?'

'বেশ তো, যা না, যেখানে খুশি সেখানে যা। আমার কি—'

লোকেন রাগে ছটফট করলে ওর কপালের শিরাটা ফুলে-ফুলে ওঠে। অমিত লক্ষ্য করলো। সেটা দপদপ করছে। দেখে হাসি পেলো ওর—'নইলে কাঁচা স্পিরিট গিলবো।'

'যা না, নীচে রান্নাঘরে যা। মধুকে বল্, দেবে।'

'তুই কিন্তু আমার মতো হ'স নি লোকেন। একটু সাবধানে থাকিস্। নইলে তোকেও আমার মতো ভুগতে হবে।'

'দয়া ক'রে সেটা আপনি নিজে যদি বোঝেন আমি বাধিত হবো।'

বন্ধুর ভঙ্গি দেখে অমিতের আরও হাসি পেলো। এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে বসলো যেন অসুখ নামক এই ব্যাপারটা নিয়ে যা কিছু হচ্ছে সে এক মস্ত পরিহাস এবং একে কেন্দ্র ক'রে লোকেন যেভাবে চিন্তিত হয়ে উঠছে সেটাও বাড়াবাড়ি।

'লোকেন, তোর কাছে আমার বেশ কিছু বই আছে। বেশ দামি আর মোটা মোটা সব বই।

'আছে। কেন, কি হবে সেগুলো দিয়ে ?'

'আমি বলি কি, ওগুলো বিক্রি ক'রে দে।'

'কেন?'

'টাকা, টাকার দরকার আছে আমাদের।'

লোকেনকে গম্ভীর দেখালো। টাকার দরকার—এই প্রচণ্ড বাস্তবকে মেনে না নেবার কোনো উপায় নেই এবং প্রয়োজনের উপযোগী প্রচুর টাকা সংগ্রহের অন্য কোনো পথও খোলা নেই—এ-ও সত্য। কিন্তু সেজন্য বই বিক্রি?

'কী ভাবছিস্?'

'কিছু না।'

'ও তো বৌ-র গায়ের অলঙ্কার নয় রে বাপু। অতো সেন্টিমেণ্ট কিসের?' অমিত সিগারেট থেকে কিছুটা ধোঁয়া শুষে নিলো—'তক্তপোষের তলা থেকে আমার বাক্সটা টেনে বার করতো।'

'কি আছে ওতে?'

'দু'টো দামি বই। আগে ওদুটোই যাক।'

লোকেন নিজেকে একটু অসহায় মনে করলো। নিজের উপার্জন আর ক্ষমতার শেষ কপর্দক দিয়ে সে বন্ধুর উপকার করতে চেয়েছে। কিন্তু এখন নিরুপায়। বন্ধুর প্রস্তাবে বাধা দেবে সে জোর তার নেই। অথচ নিজের সঞ্চয় থেকে বই বেচে দেবার বেদনা না-বোঝার মতো অশিক্ষিতও সে নয়। অমিতের তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত সেই রঙ চ'টে যাওয়া টিনের বাক্শোটা বের করতে হলো। ডালা খুলে জামা-কাপড়ের নামগন্ধও খুঁজে পেলো না। থাকার মধ্যে আছে গোটা তিনেক বই, কিছু কাগজপত্র, একটা ভাঙা চিরুনি, খালি একটা বালির কৌটো, অমিত তাতে মাইনের টাকা রাখতো তিন দিনের জন্য। লোকেন বই দুটো বের করার আগেই উপর থেকে ছোঁ মেরে বাক্শোর পকেট থেকে একটা খাম তুলে নিলো অমিত।

'কী ওটা।'

'সেই ছেলেবেলার যতো ছেলেমানুষি।' দূঃ—ব'লেই বিনা দ্বিধায় অবলীলাক্রমে চোখের পলকে জানলা গলিয়ে ফেলে দিলো।

'আরে, দাঁড়া দাঁড়া—'লোকেন ছুটে এলো কিন্তু তার আগেই খামটা দোতলা থেকে লাফ দিয়েছে নীচের দিকে।

'কী ফেললি তুই?' লোকেন সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'যেতে দে, যেতে দে—'নিতান্ত অবজ্ঞায় মুখ বাঁকালো অমিত।

'তবু শুনি না কী জিনিস? তোকে দিয়ে বিশ্বাস কি?'

'ওই লিক্যুইডেটেড ব্যাঙ্কের ডিস্অনার্ড চেকগুলো।'

'তোর আবার ব্যাঙ্কের টাকা ছিলো নাকি কোনোদিন?' লোকেন বিস্মিত।

'আরে ছোঃ—ম্যাট্রিক থেকে এম এ পর্যন্ত—ওই যে ডিপ্লোমা না সার্টিফিকেট কী বলিস তোরা, সেসব। যত্তো সব নন্‌সেন্স—'

'উঃ অমিত, তুই আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বি। গাধা, তুই ওগুলো ফেলে দিলি—'দ্রুত বারান্দায় ছুটে গেলো লোকেন। উঁকি দিয়ে দেখলো কোথায় পড়েছে এবং কি অবস্থায় আছে। পাশে মুসলমানদের বস্তি, পুরোনো টালির ছাদ। ওদের অন্তঃপুরে গিয়ে ছাদের উপর উঠে সেগুলো কুড়িয়ে আনা সহজ কথা নয়। লোকেন ঘরে ফিরে সমস্ত জ্বালা-ক্ষোভ নিয়ে ফেটে পড়লো—'এগুলোর মানে কি? না না তোকে বলতে হবে, এসব ক'রে তুই কী প্রমাণ করতে চাস্? পাগলামিরও তো একটা সীমা থাকা দরকার।'

'আহা চটছিস্ কেন, নব্বুই টাকা মাইনের প্রুফরিডিং-এর কাজ করতে হ'লে বি-এ, এম-এ ডিগ্রির প্রয়োজন নেই।'

'সে চাকরি যদি তোর না থাকে '

'থাকবে না মানে? আমি যে ওই অশিক্ষিতগুলোর কাছে এখনও কাজ করি এই ওদের ভাগ্য।'

লোকেন রাগে ফুঁসছিলো। ভেবেছিলো এ অসুস্থ শরীরে দুঃসংবাদটা

সইতে পারবে না অমিত। ওকে বলবে না কিছু। কিন্তু উত্তেজনায় বুদ্ধি হারালো—'জানিস্ তোর সেই চাকরি এরই মধ্যে গেছে ?'

'তাই নাকি! ব্যস্ তাহলে আর ভাবনা কি ?' অমিত উল্লসিত হাসিতে ঘর ভরে তুললো।

'নতুন চাকরির জন্য ওই কাগজগুলোর দরকার হবে।'

'তোর কি মাথা খারাপ?—অমিত চোখ কোঁচকাল—'ছিলাম মাস্টার মশাই, হয়েছি প্রুফ-রিডার। এবার হবার কি কুলি-মজুর। বেশ করেছি ফেলে দিয়েছি। তাছাড়া লোকেন আমি তো বেশিদিন বাঁচবো না। কী হবে ওসব দিয়ে ?'

শেষ কথাগুলো উচ্চারণের সুরে একটু করুণ ব্যঞ্জনা ছিলো। ক্রুদ্ধ উদ্ধত লোকেনকে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ ক'রে রাখলো। এরপর হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিলো অমিত কিন্তু বাধা পেলো।

দুভাঁজ করা ধুতির উপর শার্টটা চড়িয়ে নিয়ে স্বগতোক্তির মতো বললো—'মধুকে ব'লে যাচ্ছি, দুধ গরম ক'রে দিয়ে যাবে, খেয়ে নিস্। আমি আসছি। কী সব কাণ্ড করিস্ বল্ দেখি। এখন এতো ঝামেলা ক'রে কাগজগুলো তুলে আনতে···উঃ জ্বালিয়ে মারলি। ভোগান্তির একশেষ।'

লোকেন দ্রুত চ'লে গেলো নীচে এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে অশেষ লাঞ্ছনা আর কষ্ট সহ্য ক'রে যখন সেই পুরো খামটা নিয়ে ঘরে ফিরে এলো. দেখলো তক্তপোষ ফাঁকা। অফিস থেকে ফিরে, হাত-মুখ ধুয়ে রমেন ওর নিজের জায়গায় ব'সে চা খাচ্ছে। লোকেনকে দেখেই প্রশ্ন করলো—'অমিত কোথায় ?'

'আছে এখানেই কোথাও। বোধহয় নীচে।'

না, নীচে তো নেই। আমি খুঁজেছি।

'তার অর্থ ?' লোকেনের মাথার শিরাগুলোয় টান পড়লো হঠাৎ।

'বাথরুমে ?'

'উঁহু, আমি তো আধ-ঘণ্টার ওপর হয় এসেছি। তাহলে এর মধ্যে ফিরতো না ?'

লোকেন ছিটকে বেরিয়ে এলো। দোতলার রেলিং থেকে গলা ফাটিয়ে হাঁকলো—'মধু, মধু··

সাড়া এলো।লোকেন ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'অমিতবাবুকে দেখেছিস্ ?'

'হ্যাঁ, বাবু বেরিয়ে গেছেন।'

'বেরিয়ে গেছেন ? কখন ? কতক্ষণ ?'

'সে বাবু আধ ঘণ্টাটেক তো হবেই।'

'কিছু ব'লে গেছে ? লোকেন উত্তেজনায় কাঁপছে।'

'না।'

ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, অবশ শরীরে আবার একটা অবসাদ এলো। রেলিংএর থাম ধ'রে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো লোকেন। হাঁপাতে লাগলো। এবং পরমুহূর্তেই ঘরে ছুটে গিয়ে হাতের খামটা ছুঁড়ে মারলো তক্তপোষের ওধারে। কোথায় পড়লো লক্ষ্য করলো না। লুঙি-ক'রে পরা ধুতির ভাঁজটা খুলে নিয়ে সেই ধুতিই কোনোমতে বাইরে বেরোনোর মতো ক'রে প'রে নিলো। তাড়াহুড়া ক'রে চোখের পলকে লাফিয়ে পড়লো চৌকাঠের উপর। রমেন অবাক। ডাকলো—শোন, শোন, কোথায় যাচ্ছিস্ ?

'যাবো আর কোন চুলোয়। একদিন ওকে আমি যখন মদ খেতে শিখিয়েছিলাম, দায় তো আমারই। জ্বালিয়ে মারলো। জ্বালিয়ে মারলো আমাকে। উঃ—'

এর পরের কথাগুলো আর শুনতে পেলো না রমেন।

পঁচিশ

তৃপ্তি সেই বিরক্তিকর জানলায় এসে দাঁড়ালো।

বিলাসবাবুর ঘরে নতুন শিশুর কান্না। নীচে রাস্তাব মানুষ দেখতে দেখতে সেই কান্না শুনলো তৃপ্তি। আস্তে আস্তে শিশুটি জুড়িয়ে এলো। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তবু মনে মনে ছবিটা কল্পনা ক'রে নিতে কষ্ট হলো না, সেই বুড়ি ছুটে এসে বুকে নিয়েছে। হোক বুড়ি, তবু মার বুক।

সেই জানলা। রামকৃষ্ণের প্রশান্ত মূর্তি, একটি পেরেক, পেরেকে ঝোলানো রেন-কোট। আষাঢ়-শ্রাবণ, পুরো একটা বর্ষা চ'লে গেলো চোখের উপর দিয়ে। কতোবার শরীর ভিজলো বর্ষার জলে। তবু একদিনের জন্যও সেটা নড়লো না। আশ্চর্য! তবে কেন সেটা রয়েছে সেখানে? কেন ফেলে দেয় না? মৃতদেহের মতো অনাবশ্যক একটা বস্তু।

তৃপ্তি স'রে এলো। চৌকাঠে পা দিয়ে মনে হলো ঘরে থাকতে ভালো লাগবে না। বড়ো একা। মোড়াটা এনে রেলিং-এ আড়াল দিয়ে বারান্দায় বসলো। সেখান থেকে সেই জানলাটা দেখা যায়, কিন্তু তার ছবিটা নয়।

মেয়েটিকে মনে পড়লো। এই জানলা যার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং দেবে আরও অনেকদিন। মমতাকে মনে পড়লো। মমুকে—মা, বাবা, শহর ডিগবয়, ব্রহ্মপুত্র, পেট্রোল, নিজেদের ছোটো বাংলোটা, বাবার বসবার ঘর, মার ঘর, ঠাকুরঘর, মামার আর মমুর পড়বার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘরের পাশে এক চিলতে উঠোন, উঠোনের কোণে মার তুলসিতলা, ও দিকে নেপালী পাহাড়িদের বস্তি। এখন কি করছে মমু? কাঁদছে! কতোদিন চিঠি পাই নি ওর। ও

কি মানিয়ে নিয়েছে সব কিছু ? ভুলে গেছে আমাকে ? শেষ পর্যন্ত মমুও ভুলবে ? সম্ভব ? মজুমদার সাহেবের বাংলোটা বেশি দূরে নয়। অসম্ভব মোটা আর হাবাগোছের ছেলে নীলকান্ত। পুতুলের মতো ওই মেয়েলি ছেলেটা কী দেবে মমতাকে ? ধনীঘরের ছেলে। সোনার গয়নায় ভ'রে রাখতে পারবে বৌকে। কিন্তু তারপর ? মমু কি আর কিছু চেয়েছিলা ? আমি কি আর কিছু চেয়েছিলাম ? যা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি কিছু ? কল্যাণ, কল্যাণ নয়, অথচ কল্যাণই···আবার সেই কান্না। সরু গলিটার ক্ষুদ্র পরিসর ডিঙিয়ে এপারে এসে অদ্ভুত একটা আবহ সৃষ্টি করলো সেই ভাষাহীন অকারণ কান্না। নিষ্পাপ শিশুর চিৎকার। দুটো বিড়ালের কলহ ব'লে ভ্রম হয় কোনো কোনো রাতে। তখন কেমন বিশ্রী, কর্কশ আর বিরক্তিকর মনে হয়। রাত-দুপুরে মাতাল বিলাসবাবুর কড়া নাড়ার শব্দের চেয়েও কুৎসিত লাগে। ইচ্ছে করে, অসহ্য গরম সত্ত্বেও শিয়রের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে। আর এখন ?

দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে রইলো তৃপ্তি। হাত গুটিয়ে বোকার মতো। পিঠ থেকে বিনুনিটা টেনে আনলো। একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার অজুহাতেই ফিতে খুলতে লাগলো। নতুন ক'রে চুল বাঁধবে না। এলো খোঁপার গিঁট রাখবে মাথায়।

এখন এই শিশুর কান্না অনেক কথার তরঙ্গ তোলে মনে। কলেজে সহকর্মী অধ্যাপিকা মহলে, বিভিন্ন ক্লাসে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে ব'সে থাকে যেসব বিবাহিতা ছাত্রী, তাদের সাবধানী চোখের সামনে নিজেকে কেমন একটু জড়িয়ে রাখতে হয় আজকাল। সেদিনের দুপুরটা মনে পড়লো। ক্লাস ছিলো না, অধ্যাপকদের ঘরটা প্রায় ফাঁকা। ইতিহাসের অধ্যাপিকা স্নেহময়ীদি পাশে এসে বসলেন। দু-চার কথার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—কিছু মনে কোরো না ভাই, একটা কথা বলবো।

তৃপ্তি হেসেছিলো—'বলুন না'।

'আমি তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়ো।'

তৃপ্তি প্রসঙ্গটা অনুমান করছিলো।

'যতদূর জানি, ঘরে তোমরা দুজন একা।'

তৃপ্তি চুপ ক'রে ছিলো।

'একটু সাবধানে থেকো। আজ যেভাবে তোমাকে ভিড়ের বাস থেকে নাবতে দেখলাম, তখনই ভাবছিলাম কথাটা বলা দরকার। তাছাড়া এখন, এসময়ে এতোটা পথ বাসে আসা-যাওয়া উচিতই নয় তোমার। কম তো নয়, সেই ভবানীপুর থেকে রোজ দুবেলা ক'রে এতদূর—'

স্নেহময়ী দত্তের বয়েস আটচল্লিশ, স্বামীর পঞ্চান্ন। বড়ো ছেলে গভর্ণমেন্ট সার্ভিসে উচুঁতলার অফিসার। মাথা নীচু ক'রে শুনে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। আরও কিছু উপদেশ পেলেও মন দিয়ে শুনতো তৃপ্তি। ভেবেছিলো সমবয়েসি কোনো অধ্যাপিকার সঙ্গেই খোলাখুলি আলোচনা করবে। প্রয়োজন হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে। কোনো মহিলা ডাক্তার। প্রথম দিকে কল্যাণকে জানতেই দেবে না কিছু। কিন্তু পরমহিতৈষী দিদির মতো দুটো কথা ব'লে স'রে গেলেন স্নেহময়ীদি। অনুগত ছোটো বোনের মতোই কথাগুলো শুনে চুপ ক'রে রইলো তৃপ্তি। প্রথম দিন, প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলতে, কিছু জিজ্ঞেস করতে কোথায় যেন বাধলো।

অথচ কতো সহজে কানের কাছে মুখ এনে ফিশফিশিয়ে প্রশ্ন করেছিলো দর্শনের অলকা—ক'মাস? উত্তরের প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই হেসে উঠেছিলো উচ্ছ্বসিত হাসিতে। অলকার বুকে হালকা একটা ধাক্কা দিয়ে তৃপ্তি বলেছিলো—'ভাল্‌গার।'

'ভাল্‌গার!' তৃপ্তি অবাক হলো। একথা বলেছিলাম আমি? কি ক'রে বলতে পেরেছিলাম? কতো স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম হয়

মানুষের, কতো অনায়াসে জন্ম দেয় মেয়েরা। তবু জন্মদানের আগে—এখন, এই সন্ধ্যায়, শুধু সন্ধ্যায় নয়, সারাদিন সারারাত আমার, আমার নয়, আমাদের—তৃপ্তি ভাবতে ভাবতে চোখ বুজলো, বিনুনিটা বুকের উপর রেখে মাথাটা দেয়ালে এলিয়ে মনে মনে নিজের শরীরটা, শরীরের ভিতরে অস্থি, মজ্জা, ধমনীতে রক্তপ্রবাহ অনুভব ক'রে আরাম খুঁজতে চাইলো—এ অনুভূতি আমার, আমাদের এ—যন্ত্রণা, কাতরতা, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ শুধু আমাদের মেয়েদের একার।

এ যন্ত্রণায় জন্ম আমার, জন্ম কল্যাণের, আমাদের, আমাদের সকলের। এই যন্ত্রণার উপলব্ধিতেই আমি আজ বুঝতে পারছি, মনুষ্যজন্ম কতো দুর্লভ, বৃথা অপচয়ে জীবনের অপব্যবহার অ।তজ্ঞতা, প্রতি বিন্দু রক্তের মধ্যে জীবন মহার্ঘ, প্রতি কণার অপব্যয়ে জীবনের অপমান। একথা বোঝে না, সবাই বোঝে না, ফুল ফোটানোর আগেও বেদনার ইতিহাস আছে। শরীরের অভিজ্ঞতায় পুরুষ শুধু সুখের অংশীদার, যন্ত্রণার নয়।

এলিয়ে পড়া শরীরে একটা আমেজ এলো। সুখকর একটা অনুভূতিতে তৃপ্তি আবার চোখ বুজলো। হাতের আঙুলগুলো আবার কখন বিনুনিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে খেয়াল করেনি। যদি··হ্যাঁ, যদি আজ কল্যাণ দূরে স'রে যায়! তৃপ্তি চমকে উঠলো। অতর্কিতে চিন্তার স্রোতটা এ কি কথা ভাবতে পারলো! সে কি সম্ভব? তৃপ্তি আঁচলে কপালের ঘাম মুছলো, মুখের উপর বুলিয়ে আবার হেলান দিলো দেয়ালের গায়ে। আর যদি সম্ভব হয়! তবে? ভালোবাসার পাত্র আমার অপূর্ণ থাকবে না। আমি আমাকে ভালোবাসবো। এই মুহূর্তে আমি যে আমি আছি। আমি আমার বেদনাকে ভালোবাসবো, আমার যন্ত্রণাকে! এ যন্ত্রণা ব্যক্ত হবে একদিন। রক্তে-মাংসে-প্রাণে সজীব।

চুলের ফিতে ছুটো হাঁটুতে টান ক'রে রেখে চুলের দীর্ঘ গোছা

বুকের উপর ছড়িয়ে নিলো তৃপ্তি। দু'হাতের আট-আঙুলে আঁচড় টেনে-টেনে এক ক'রে মেশাতে চাইলো।

নীচের তলার বিড়ালটা পায়ের কাছে এসে বসেছিলো। সেটাকে আদর ক'রে তুলে নিলো কোলে।

অমিত কি প্রথম সন্তান? না। আমার শরীরে রক্তের উৎসবে কল্যাণ নায়ক। আমি অমিতের কথা ভাবছি কেন? তৃপ্তি প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের পরিচিত মুখ কল্যাণের ছবিটা মনে-মনে চিন্তা করলো। বেড়ালের গায়ে মৃদু হাত বুলোতে লাগলো। যদি ভুলে থাকা যায় অন্যায় অথবা অবৈধ ভাবনা। বোধ হয়, কোথাও একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিলো। বেড়ালটা ফুঁসে উঠলো। আঁচড় কাটলো হাতে। তৃপ্তি চুড়িটা বাঁচালো, নইলে আরও গাঢ় হতো আঘাত, রক্ত পড়তো। বিষাক্ত আঁচড়। তৃপ্তি এক ঝামটায় বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিলো কোল থেকে। রাগে আর বিদ্বেষে ছোটো একটা লাথিও মারলো। একটু দূরে ছিঁটকে পড়ে বিড়ালটা প্রতিবাদ করলো। ছুটে পালালো ঘরের ভিতর দিয়ে।

দেখতে দেখতে বিকেলটা হঠাৎ কখন রঙ বদলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গলির সারি-বাঁধা সরকারি আলোগুলো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো মিলিটারি শৃঙ্খলায়। রেলিং এর ফাঁক দিয়ে জাফরির আলোর মতো আলো এসে পড়লো চোখে মুখে। তৃপ্তির খেয়াল হলো—এবার ওঠা দরকার। প্রি-টেস্টের অনার্সের খাতাগুলো প'ড়ে আছে। দেখতে হবে। তাছাড়া নিধুর-মাকেও বাইরে পাঠাতে হবে একবার। প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও উঠতে ইচ্ছে করলো না। কুঁড়েমি লাগলো। ওধারে বিলাসবাবুর সংসারে সোরগোল কানে আসছে। জানলাটা অন্ধকার। শিশুটি কাঁদছে না। হয়তো ঘুমিয়েছে। তৃপ্তি ব'সে রইলো আরও কিছুক্ষণ।

ভিতরের ঘরে কড়া নড়তেই চমকে উঠলো তৃপ্তি। আড়মোড়া

ভেঙে অলস শরীরটা তুলে নিয়ে দরজা খুললো—'তুমি! এসো এসো। কী হয়েছিলো তোমার?'

'কেন?'

'এতোদিন পরে এলে।'

শান্তা বিনীত ভঙ্গিতে হাসলো—'একদিন এসেছিলাম প্রসূনের সঙ্গে। আপনারা কেউ ছিলেন না।'

'ও তাই বুঝি। কিন্তু কই, ঝন্টু তো বলেনি সেকথা। আচ্ছা পাগল ছেলে, সব ভুলে যায়।'

দরজায় আবার খিল তুলে তৃপ্তি শান্তাকে নিয়ে এলো টেবিলের দিকে—'ঘরে বসবে? এসো বাইরে বসি। এতক্ষণ ব'সে ছিলাম, বেশ লাগছিলো।'

ঘর থেকে আরও একটা মোড়া এনে শান্তাকে পাশে নিয়ে বারান্দায় বসলো তৃপ্তি। শান্তার একটা হাত কোলে টেনে আলৃতোভাবে হাত বুলোতে লাগলো। যেমন ক'রে একটু আগে বেড়ালটাকে আদর করছিলো। তুজনেরই হাতের বালায় মৃতু একটা শব্দ হলো। শান্তা হয়তো লক্ষ্যই করলো না, কিন্তু তৃপ্তি শুনলো। ভালো লাগলো কানে। ঝন্টুর হয়ে একটু স্বপ্ন দেখলো তৃপ্তি। একটি বংশে নিভৃতের এই শব্দটুকু যদি মূল্যবান হয় কোনোদিন।

'শান্তা—'

'বলুন—'

'তুমি আমায় আপনি ডাকো কেন?'

রেলিং-এর জাফ্রি-কাটা আলোয়-ছায়ায় শান্তার সলজ্জ হাসিটা দেখতে পেলো তৃপ্তি। ওর মুখটা আরও ভালো লাগলো—'কিছু মনে কোরো না। খুব সহজভাবে বলছি। ঝন্টুকে তুমি বলতে কদিন সময় লেগেছিলো তোমার? তার চেয়ে আরও অনায়াসে তুমি আমাকে আপন করতে পারো না? তোমার একজন দিদি হিসেবে।'

শান্তা আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে। আরও ঘনিষ্ঠ হয়। যে-হাত

তৃপ্তির কোলে ছিলো সেই হাতের সঙ্গে অন্য হাত এক হয়ে তৃপ্তিকে জড়িয়ে ধরে। তৃপ্তির আঁচল ছুঁয়ে একটা হাত ব্লাউজের গলা স্পর্শ করে, কাঁধে হাত পড়ে। সখীর মতো তৃপ্তি ছোটো বোনের মাথা থেকে বিনুনি বেয়ে পিঠ পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেয়। রেলিং-এর নক্‌শা-কাটা আলো আর ছায়া ওদের জন্য একটা দৃশ্যপট তৈরি করে, অকৃত্রিম বাতাস কিছুটা স্নিগ্ধতা আনে।

'আমি জানি বৌদি, প্রসূনের মতো আপনি আমাকেও কতো স্নেহ করেন। কিন্তু, কিন্তু আমি কি ক'বে বোঝাবো আপনাকে, আমার কতো ভালো লাগে, রোজ আপনার কাছে আসতে ইচ্ছে করে— শান্তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে—আপনার যদি কোনো ছোটো বোন থাকতো কিংবা প্রসূনের কোনো বোন, আমি বুঝি, কী সুখে থাকতো সে, কতো আদর পেতো।'

তৃপ্তি আকাশের দিকে চোখ তুললো। আকাশে নক্ষত্র পেলো না। দৃষ্টি পড়লো সেই জানলাব উপর। চোখ সরিয়ে আনলো শান্তার দিকে—'শান্তা, একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কী কথা বলুন।'

'লজ্জা করবে না?'

শান্তা হাসলো—'বলুন শুনি।'

'আমরা সহজ হ'তে পারি। খুব সহজ। বন্ধুর মতো—মেয়েরা তা পারে।'

শান্তা চুপ ক'রে রইলো। যেন মেয়ে হিসেবেই এর সত্যতা অস্বীকাব করার উপায় ওর নেই।

'ঝন্টুকে তুমি কতোখানি ভালোবাসো?' শান্তার শরীরে এক ঝলক কাঁপুনি লক্ষ্য করলো তৃপ্তি। সেই সঙ্গে চোখে ক্ষনিক চঞ্চলতা—'ওকে তুমি বিয়ে করবে?'

শান্তা নিঃশব্দ।

'লজ্জা পাচ্ছো?'

'না।'
'তবে?'
'প্রসূনের যদি আপত্তি না থাকে।'
'তুমি তোমার কথা বলো।'
'আমি তো এছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না বৌদি।'
'বয়েস তোমাদের অল্প শান্তা। আরও কয়েকটা বছর তোমাদের এভাবে থাকতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে। তারপর?'
'তখনও আমার মত বদলাবে না।'
'জোর দিয়ে বলছো?'
শান্তা ঘাড় কাত করলো। মুখে উচ্চারণ নেই।
'যদি বিয়েতে কোনো বাধা আসে?'
'কিসের বাধা?'
'অসবর্ণ বিয়ে। তোমার মা-বাবা—'
'আমাব দিক থেকে হবে না। আমার বৌদিও ব্রাহ্মণের মেয়ে। কোনো বাধা তো হয় নি।'
তৃপ্তি একটা ধাক্কা সামলালো ভিতবের দিক থেকে। ঘন দীর্ঘশ্বাস লুকোতেই যেন টেনে-টেনে বললো—'কিছু মনে কোরো না শান্তা। ঝণ্টুকে বড়ো বেশি ভালোবাসি ব'লেই ওর জন্যে এতো আমার ভয়। সেজন্যেই তোমার সঙ্গে আলাদা একটু কথা বলবো ভেবেছিলাম। আজ সুযোগটা নিয়েছি। রাগ করলে না তো?'
'না না, রাগ করবো কেন?'
শান্তা আবার ওর হাত দুটো তৃপ্তির কোলের উপর রেখে বৌদির বাঁ-হাতটা নিজের মুঠোয় টেনে নিলো।
ডান হাতে আরও নিবিড় ক'রে শান্তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করলো তৃপ্তি—'জানো শান্তা, আমরা চোখ বুজে অনেক সইতে পারি, ভেতরে-ভেতরে পুড়ে চুপ ক'রে থাকতে পারি, কিন্তু ওরা পারে না। বড়ো সহজে ভেঙে পড়ে। তুমি ঝণ্টুকে বাঁচিয়ে রেখো। সামান্য

আঘাতে ওরা চুরমার হয়ে যেতে পারে। দূরে স'রে গিয়ে মেয়েরাও কিন্তু খুব সুখে থাকতে পারে না। কী ক'রে পারবে বলো। প্রতি মুহূর্ত তাকে পীড়ন করবে না—একটি পুরুষকে আমি বাঁচাতে পারতাম, তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব ছিলো আমার? দেখছো তো চারদিকের অবস্থা। পরীক্ষার রেজাল্ট, চাকরি-বাকরি, অভাব-অনটন এতো কিছুর মধ্যে আমাদের মেয়েদেরই কতো সমস্যা। আর ওদের কথা ভাবো তো। লেখাপড়া শিখুক ছাই না-শিখুক, সকলেরই এক ব্যাপার। হন্যি হয়ে ঘুরছে, চারদিক থেকে হেরে গিয়ে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, সেখানে ভালোবাসাটা বিড়ম্বনা বাড়িয়ে তোলে। আমরা হয়তো সব সময় বিদ্যা-বুদ্ধিতে ওদের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারবো না, না-ই বা পারলাম। এতোটুকু লজ্জা নেই। কিন্তু একটা জিনিস তো পারি। [আমরা কেউ মহীয়সী নই, হ'তেও চাই না, কিন্তু ওরা যদি মহৎ হতে চায় আমরা পেছনে থাকবো। ওদের প্রেরণা দেবো। চারদিক থেকে হেরে এসেও যেন ওরা বুঝতে পারে, এক জায়গায় ওদের জিৎ আছে। ওটুকু পারলেই আমাদের সব হলো।']

তৃপ্তির কোমল বুকে মাথা রেখে শান্তা চুপ ক'রে ছিলো। তেমনি অনড় রইলো।

তৃপ্তি একটু হাসতে চেষ্টা করলো—'তোমার বয়েস কম আর আমার বেশি। তোমার ওই মনটাকে আমি জানি শান্তা, কিন্তু তুমি আমারটা জানো না। তোমার মন আছে, অনুভূতি আছে কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আছে। সেটা তোমার নেই। কতো অদ্ভুত চরিত্র আমি দেখেছি। আরেকদিন বলবো সে সব কথা।'

'কিন্তু আমাকে কেন শোনাচ্ছেন এ সব?'

'রাগ কোরো না শান্তা, শোনাচ্ছি, জানো তো ঝণ্টুকে আমি কতো ভালোবাসি। ওর জন্যে আমার ভয় হয়।'

'বৌদি'—কিছু একটা বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো শান্তার।

তৃপ্তি অনুভব করলো শক্ত মুঠোয় ওর হাতটা চেপে ধ'রে শুধু চাপ দিচ্ছে। কিছু বলতে চাইছে, পারছে না।

'শান্তা'—আস্তে-আস্তে ছোটো বোনের পিঠে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে তৃপ্তি হাসলো—'কিছু বলবে?'

'কি ব'লে আমি তোমাকে বোঝাবো, আমি···'

তৃপ্তি হাসতে হাসতে বললো—'আর আমাকে বোঝাতে হবে না ভাই। আমিও তো মেয়ে। সবচেয়ে বড়ো সত্য কথাটা মেয়েরা মুখে বলতে পাবে না। আচ্ছা, তুমি একটু বোসো। আমি আসছি—'

তৃপ্তি আচম্‌কা উঠে দাঁড়ালো। সখী অনসূয়ার মতো আঁচল ধ'রে টানলো শান্তা—'না বৌদি, তুমি আরও একটু বোসো।'

'এই তো, এক্ষুনি আসছি। মিনিট খানেক।'

'না, না, আমি চা খাবো না। তুমি একটু বোসো—'

'আচ্ছা পাগল মেয়ে তো—তৃপ্তি নীচু হয়ে শান্তার গাল টিপে নাকের কাছে নাক এনে হাসলো—' তুমি ভাবছো, আমি তোমার জন্যে লৌকিকতা করতে যাচ্ছি। দূব, বোকা মেয়ে, আমি যাচ্ছি নিধুর-মাকে একটু দোকানে পাঠাতে হবে সেজন্যে। বেশ তো, এসো না, তুমিও এসো। ঘবেব আলোয় বসি নি। তাহলে এতো খোলাখুলি কথা বলতে পারতাম না তোমার সঙ্গে। এখন তো আর সে ভাবনা নেই।'

তৃপ্তিই মোড়া থেকে টেনে জোব ক'রে তুললো শান্তাকে।

ছাব্বিশ

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আরও একটি ব্যাপক সঙ্কটকাল সমাগত। পৃথিবীর যাবতীয় বিবেকী মানুষের একজন হয়ে কল্যাণও আজ বিচলিত, শঙ্কিত, নিঃশ্বাসরুদ্ধ। একেবারে আমেরিকার আঙিনায় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপময় রাষ্ট্র আটলান্টিকের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গশক্তিকে উল্টোদিকে বইয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। হোয়াইট হাউস জানিয়ে দিয়েছে এ স্পর্দ্ধা তারা সইবে না। অন্যদিকে পৃথিবীর অপরপ্রান্তে সান্ত্বনার বাণী উচ্চারিত, অথবা পাল্টা হুঙ্কার—শান্তিকামী মানুষের আত্মরক্ষার নৈতিক অধিকারকে স্বীকার করি আমরা। 'পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' আমরা প্রস্তুত। সুতরাং আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণস্রোতে উত্তাপ বাড়ছে, উত্তর সাগরের আইস্‌বার্গ নেমে এসে গ'লে ঝ'রে জলস্ফীতির কারণ ঘটাবে এবার, উতলা হয়ে, মথিত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর মাত্র একভাগ ভূমিখণ্ডকে প্লাবিত ক'রে সর্ব্বধ্বংসী বিপর্য্যয়ের সূচনা করবে, নোয়ার প্লাবন আরও একবার ঘটতে পারে পৃথিবীতে—এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

নিজের চেম্বারে একরাশ বই-পত্র, কাগজ দলিল নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় লেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো কল্যাণ। এ'লেখা আজ বা কালই নয়, অনেক বিচার-বিবেচনার পর দিনকয়েক বাদে ছাপা হতে পারে। কিছু আন্তর্জ্জাতিক আইন-বিধির বই, বিদেশী দৈনিকপত্র-সাপ্তাহিকের ফাইল, সম্পাদক ভবতোষবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর তৈরি করা যুক্তিসূত্র চারপাশে নিয়ে কল্যাণ ভাবছিলো। এবং ভাবতে-ভাবতে কখনও উত্তেজনায়, কখনও আতঙ্কে শিউরে উঠছিলো। কি একটা ভয়ঙ্কর

যুগে বাস করছি আমরা। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যতো আণবিক অস্ত্র তৈরি হয়েছে তার কিছু পরিমাণের প্রয়োগ ঘটলে পৃথিবী নামক এই গ্রহের অস্তিত্ব সৌরসভায় অন্য ভাবে চিহ্নিত হতে পারে, আর মানুষের শুভ বুদ্ধি যদি এই অস্ত্র সমষ্টির বিনাশ ঘটাতে চায় তবে সাগর আব মহাসাগরের তলায় গিয়ে সে'গুলি সারা পৃথিবীর জলকে বিষাক্ত করবে। সুতরাং মানুষেব হাতে গড়া মারণাস্ত্র আজ মানুষেবই নিবাপদ নিদ্রার শিয়বে শুধু ফণা তুলে থাকবে। উপায় নেই, মানুষ অসহায়। একটি বিদেশী পত্রিকায় কোনো বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এ'রকম আশঙ্কার কথা পড়ে কল্যাণ শিউরে-শিউরে উঠছিলো। অন্য একটি পত্রিকায় জনৈক বুদ্ধিজীবির সিদ্ধান্ত—একই শতাব্দীতে দু'দুটো মহাযুদ্ধের পর আর যুদ্ধ বাধবে না। কেন না, এযুদ্ধ সর্বমানবের ধ্বংসের বীজ। কল্যাণের কেমন একটু খটকা খটকা লাগলো—কথাটা বিচারসাপেক্ষ। পূর্ব পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি হয়তো নেবে না কেউ। কিন্তু ঘটনা হয়ে যুদ্ধ আসবে না আর, দুর্ঘটনা থেকেই তার জন্ম হবে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝিতে গোটা পৃথিবী তার নিরবধি কালেব প্রচলিত বিশ্বাসটাকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারে। ঠাণ্ডা-লড়াই শক্তিমানের আত্মবিশ্বাসের অস্ত্র নয় পরস্পরের শক্তি সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহের ফল। এই সন্দেহ থাকবে, নিদ্রার শিয়রে মৃত্যুর উদ্যত ফণা স্তিমিত হবে না অদূর ভবিষ্যতে। আর ততোদিন, মানুষ একটা রুদ্ধশ্বাস মৃত্যুর আতঙ্ককে কণ্ঠনালীতে চেপে ধরে ভবিষ্যতে আস্থা রাখবে, প্রেম-প্রীতি-করুণা-সত্য ও নিষ্ঠায় অটল থেকে কবিতা আর সঙ্গীত রচনা করবে, সন্তানের জন্ম দেবে, শিশুকে হাসতে শেখাবে, প্রণয়ীকে বিমুগ্ধ করবে। আকাশকে অসীম ভেবে, সমুদ্রকে বিরাট ব'লে মেনে নিয়ে, পর্বতকে শাশ্বতের প্রতীক মনে ক'রে ঈর্ষা করবে পম্পাই নগরীর অধিবাসীদের—তারা ভাগ্যবান। ধ্বংসের পর তারা কেউ বেঁচে ছিলো না। আর 'চার

দিকের এই ব্যাপক পতন আর ধ্বংসের মধ্যে বাঁচতে হচ্ছে, এমনি ভাবে বাঁচতে হবে তাদের।

ডানদিকের দেয়ালে টাঙানো বড়ো বিশ্ব-মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে কল্যাণ ভাবলো। কতো ক্ষুদ্র অংশে দাঁড়িয়ে আমরা এই সুবিশাল বিপন্ন গ্রহের কথা ভাবছি। বিভিন্ন বর্ণে-রঙে চিহ্নিত সাগর-মহাসাগর দেশ-মহাদেশ, দ্বীপ-উপদ্বীপের সমষ্টিতে গঠিত স্বদেশের অতীত এই পৃথিবীকে জননী-জন্মভূমি ব'লে চিন্তা করার অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘ ইতিহাসে ধারায় মানুষের জীবনে এই প্রথম। সমবেত মৃত্যু আর ধ্বংসের চিন্তা থেকেই এ চৈতন্যের সূচনা। জীবনের প্রয়োজনেই, বাঁচার তাগিদেই ভূগোলের বেড়া ভেঙ্গে আজ সব মানুষ এক। আবার অন্যদিকে জীবনের গতি ব্যাহত নয়, পরাজয়কে সে মানবে না, সৃষ্টিধর্মী নতুন নতুন আবিষ্কারে সে আত্মনিযুক্ত, বংশধরের হাতে সে শয়তানের সঙ্গে লড়বার শক্তি দিয়ে যাবে। একদিকে তৃপ্তি আর অন্য প্রান্তে অমিতের মতো এই পৃথিবীব কেন্দ্রেও যেন দুই শক্তি। সুবৃহৎ এবং ঝকঝকে এই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে কল্যাণ নিজের কথা চিন্তা করলো—এই অফিসে বসে, টেলিপ্রিণ্টার, রিপোর্ট, ফাইল, এডিটোরিয়াল পলিসি, রাজনীতি, বিশ্বপরিস্থিতি—সব কিছুর আবর্তে কেন আমি আমার ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল, আমার সংসার, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব সব ভুলে যাই! আমার স্ত্রী কি সত্যি সুখী? স্বামী হিসেবে আমার সাফল্য কতোটুকু? অমিত ছেলেবেলার বন্ধু। তবে কেন তাকে আজও ফেরাতে পারলাম না জীবনের পথে? তৃপ্তি নারী, নিজের শরীর থেকে সে একটি শিশুর জন্ম দেবে, জীবন সৃষ্টি করবে। দেহের আর মনের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে জীবনকে ভালোবাসার যে প্রেরণা, বা যে প্রেরণা থেকে সজীব প্রাণের মহার্ঘতাকে অনুভব করার বোধ বা চেতনা, সেই চৈতন্যের প্রেরণাতেই তৃপ্তি সর্বাত্মক ধ্বংসের রাহু থেকে অমিতকে বাঁচাতে চেয়েছিলো। কিন্তু গড়ানো-পাথরের অবধারিত পতনকে প্রতিরোধ করবার মতো

প্রবল শক্তি তার নেই। সে ব্যর্থ। ব্যর্থ আমরা। ওই মানচিত্রের উপর চোখ রেখে কল্যাণ যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, উত্তর সাগরের স্রোতে নেমে আসছে সুবিশাল বরফের পাহাড়, শুধু তার দৃশ্যমান অংশেই সে বিপুল, নিমজ্জিত অংশে সে আরও বিশাল, আট গুণ, যোজন-যোজন বিস্তৃত আটলান্টিকের নীল জলে ক্ষয় সুরু হলো, উষ্ণস্রোতে সে গলে গলে, ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে, বিশ্বময় একটি মহাপ্রলয় মহাপ্লাবনের আয়োজন। আর টেবিলের উপর পড়ে থাকা আজকের কাগজে ব্যানার হেড লাইন—অন্তরীক্ষ জয়ের পথে সোভিয়েট রাশিয়ার আরও একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। কল্যাণের মনে হলো—এ যুগে বাঁচবার আর অন্য কোন দ্বিতীয় পথ নেই। মৃত্যুর উদ্যত ফণাকে শিয়রে রেখেই আমরা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখবো। মৃত্যু বিষাদ, নৈরাশ্যের পাশেই আমাদের প্রেম, সুখ ভবিষ্যত। যে বিপন্ন সময়ের হাতে আজ অমিত নিহত, সেই ক্রুর সময়ই আমাদের শক্তি দিলো না ওকে বাঁচাবার। জীবনের এই চূড়ান্ত অপচয়কে চোখে দেখে আমরা দুঃখিত হবো কিন্তু নিজেদের জন্য সুখ চাইবো না কেন? আমি, তৃপ্তি, আমরা কেন পরিতৃপ্তি খুঁজবো না জীবনে?

'বাবু, টেলিফোন—'

কল্যাণ হঠাৎ বাধা পেলো ভাবনার স্রোতে। সামনে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেছে রবি। বললো—'আচ্ছা যাও, যাচ্ছি।'

টেলিফোন বার্তা-সম্পাদকের টেবিলে। পাশের চেম্বার। খুব তাড়াহুড়ো ক'রে কাগজ-পত্রগুলো কিছুটা গুছিয়ে, কয়েকটা পেপার-ওয়েট ইতস্তত চাপিয়ে উঠে এলো কল্যাণ।

'হ্যালো, হ্যালো কে? · তুই? তুই হঠাৎ ·

দূরাগত ধ্বনি এলো—'একটা খবর আছে।'

'বল্।'

'তোদের পত্রিকা অনেক বড়ো পত্রিকা। গোটা বাংলা দেশের মানুষ পড়ে ··

'কি হয়েছে বল্ না!'

'তোদের সম্পাদক মশাইকে বলবি একটা খবর ছাপতে।'

'কি?'

'ধরমতলা আর ম্যাডান স্ট্রিটের মোড়ে এই মাত্র একটা থুরথুরে বুড়ো ভিখিরি মরে গেলো। ভিড় হয়েছে খুব। একজন রিপোর্টার পাঠিয়ে দে। দেখে যাবে। তোদের সম্পাদক মশাইকে বলিস—এ বুড়োটার মরার কোন দরকার ছিলো না। কিন্তু পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে কতকগুলো বুড়ো বেঁচে আছে। ওদের মরা দরকার। পুরোনো বদ-রক্তগুলো না শোধরালে দুনিয়াটার পচা-ঘা কিছুতেই শুকোবে না।'

'মানে!' তুই কোথ্ থেকে টেলিফোন করছিস্—' কল্যাণ বিস্মিত, বিমূঢ়, হতবাক—'অমিত · অমিত · শোন · অমিত···

'ক্রিং—কল্যাণ রিসিভার রেখে দিয়ে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলো। অর্থ কি এ পাগলামির! একটা প্রকাণ্ড ধাঁধা অথবা রহস্য অথবা রসিকতা। আসলে এটা যে কি, বোঝার জন্যই টেবিলের উপর সোজা ক'রে দু'হাতের ভর রেখে মাথা ঝুঁকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো কল্যাণ।

'কি কল্যাণবাবু—' টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কি যেন লিখছিলেন বার্তা-সম্পাদক শশীবাবু। লিখতে লিখতেই বললেন—'রয়টার একটা খবর পাঠিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। দেখেছেন?

'হ্যাঁ—' কল্যাণ নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অত্যন্ত অনাসক্ত উত্তর।

'এবার কিন্তু বেশ জমবে। আমি কিন্তু এখন থেকেই লে-আউট ভেবে যাচ্ছি।'

'মানে!' কল্যাণ চলে যাচ্ছিলো, থমকে দাঁড়ালো—'গোটা দুনিয়া জুড়ে টেন্‌শান্ আর আপনি লে-আউটের কথা ভাবছেন।'

'দূর মশাই, টেনশান। লোহার তা'টা বেশ ভালোভাবে তেতে

উঠছে, আমরা আমাদের রুটি সেঁকে নেবো না! আর যুদ্ধ? যুদ্ধের কথা ভাবছেন! যুদ্ধ কি সহজ নাকি। একটা অ্যাটম বোমের দাম জানেন? কার অমন দায় পড়েছে।'

কল্যাণ যে-টুকু কানে এলো, শুনলো। বাকিটুকু শুনলো না। নিজের ঘরে ফিরে এসে প্রচণ্ড রাগ হলো—কি, কি অর্থ হয় এ ধরণের ছেলেমানুষি অথবা ক্ষ্যাপামির। কাজের সময় অনর্থক বিরক্ত করা। রহস্যময় টেলিফোনটার কথা সে ভাবলো—কোথ্ থেকে করলো, কেন করলো, কি অর্থ এ ধরণের রসিকতার?

কিন্তু—

চেয়ারে বসে আবার নিজের কাজে মন দিতেই কথাটা মনে পড়লো। চমকে উঠলো কল্যাণ। সে বারে আত্মহত্যার চেষ্টার আগে ঠিক এমনি ধরণের একটা পাগলামি করেছিলো অমিত। ডজন কয়েক বন্ধুকে দু'চার কথার একটা ক'রে চিরকূট পাঠিয়েছিলো। চিঠিটা পেয়েই আমরা সবাই কৌতূহলে ছুটে গিয়েছিলাম। ধরে ফেললাম ওকে। তবে কি? কল্যাণ আবার লাফিয়ে উঠে পড়লো। নিদেনপক্ষে একটা টেলিফোন করতে হবে লোকেনকে। ওর ডালহৌসির অফিসে।

সাতাশ

ভীষণ একটা গোপনীয়তাকে আড়ালে লুকিয়ে আস্তে আস্তে আলোকিত রাজপথে এসে দাঁড়ালো অমিত। হাজার হাজার মানুষের শোভাযাত্রায়, চোখ ধাঁধানো আলোয়, কোলাহলে, চীৎকারে মুখরিত শহরে মিশে গিয়ে আত্মগোপন করলো ভিড়ের মধ্যে। এবং একবার পিছনের দিকে তাকালো। সুড়ঙ্গের মতো যে-গলির ভিতরে ডাক্তার বিষ্ণুরাম ঘোষের চেম্বার নামক অন্ধকার খুপরি, সেই গলির মুখটা তখনও চোখের বাইরে যায় নি। হাতে 'সিরিঞ্জ' বাগিয়ে আর সামনে নীতিশাস্ত্রের পাতা খুলে বসে আছেন বুড়ো। বুদ্ধ আর যীশুর মতো পৃথিবীকে পাপমুক্ত করাই বুঝি তার ব্রত। প্রত্যেক বার ইঞ্জেকশানের সূঁচ ফোটাবেন আর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার ক'রে উঠবেন—'শালা বজ্জাত, হারামীর বাচ্চা, তোদের দাওয়াই দেওয়াও পাপ। তোদের গলা কাটলেও পাপ যাবে না শরীর থেকে।' এবং বিনা পয়সায় নীতি-উপদেশ বিলোতে বিলোতে টাকা গুনবেন, প্রতিটি টাকা আলোয় ধরে পরীক্ষা করবেন আর গজ-গজ করতে থাকবেন—'শালা, তোদের বিশ্বাস আছে। চোলাই মদ বিকোবি আর জাল নোট দিয়ে ফুর্তি করবি। হয় জেলে পচবি নয়তো পচা শরীর নিয়ে এখানে আসবি। যা শালা যা, গঙ্গায় গে ডুবে মর। তোরা মরলে আমাদের ভদ্দরলোকের হাড় জুড়োয়।' কথাগুলো একইভাবে অমিতের উপরও প্রযুক্ত হয়েছিলো কিন্তু অমিত প্রতিবাদ করে নি। বেশ মজা লেগেছিলো বুড়োর হাব-ভাব দেখে। দেখতে দেখতে বুড়ো তার পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর কাটিয়ে এসেছেন এবং যতদিন বাঁচবে পাপ ঘাঁটবেন। তবু তো ঘৃণা করেন না মানুষকে, শুশ্রূষা করেন। নোংরা কদর্যতা নিয়ে নাড়াচাড়া

করতে করতে গাটা যে গুলিয়ে ওঠে না, তা হয় তো নয়, কিন্তু বমির বদলে গালি-গালাজ বেরিয়ে আসে। এবং গুণ্ডা বদমাশ-ষণ্ডা মানুষগুলো পর্যন্ত মুখ বুঁজে বুড়োর ধমক সয়ে যায়। কবে যে বৃদ্ধ এ থেকে পরিত্রাণ পাবেন, সুস্থ সুন্দর পৃথিবীতে ফিরে যাবেন আর হাতের 'সিরিঞ্জ' ভেঙ্গে দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে বলবেন—এরা জানে না এরা কি করছে, ঈশ্বর, তুমি এদের ক্ষমা করো।'

আজ এই বৃদ্ধ বিষ্ণুরাম ঘোষকেই একটি অসামান্য মহাপুরুষ বলে মনে করলো অমিত। ডাক্তার হিসেবে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ, জীবনের নানাদিক থেকে ঠোক্কর খেতে খেতে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছে ওই এঁদো গলির অন্ধকার কুঠরিতে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত এই একটি মানুষ বুঝেছে, গীতা-বাইবেল-কোরাণের কথা মানুষ মানেনি। মানুষ কুৎসিত আর জঘন্য পাপ করে বলেই তার পসার, মানুষ অপরাধী বলেই যত পুলিশ, আদালত। কুলি-মজুরের হাতে পেনিসিলিন ঠুকতে ঠুকতে বুড়ো যখন প্রায় অধ-উন্মাদ এবং ক্লান্ত, হঠাৎ একটি শিক্ষিত পাতক পেয়ে গেলেন। বললেন—'তুই মহাপাতক। নরকেও ঠাঁই হবে না তোর। কিন্তু আয়, আমি তোকে শুধরে দেবো।' মহাউৎসাহে চিকিৎসা করলেন। বলতে বলতে প্রায় কেঁদেই ফেললেন একদিন—'আমি তোদের সারিয়ে দিতে পারি, শোধরাতে পারি না কেন বল্‌তো। কিসের দুঃখু তোদের। এই বয়েস। শালা, নিজের বৌ ছাড়া জগৎ-সংসারে একটা সতী মেয়ে দেখলাম না। আমার কাছে যারা আসে তাদের সকলেরই কি এই এক রোগ। কেন, আমি কি মেটারনিটি শিখিনি নাকি? বুড়ো হয়েছি বাবা আমার কি স্বাদ-আহ্লাদ নেই। শুধু এই জানোয়ার নিয়ে কাটাবো?'

সে'দিন অদ্ভুত ভালো লেগে গিয়েছিলো নগণ্য এই খ্যাপাটে মানুষটাকে। এ' উপলব্ধি মহৎ, এ' অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে মানুষ দুঃখ পায়, পাপ করে, কিন্তু পাপমুক্ত হোক মানুষ,

দুঃখের অবসান হোক, সুখী হোক—প্রাচীনতম মহামানবের উপলব্ধির সঙ্গে কোথায় যেন এক হয়ে মিশে যায় বিষ্ণুরাম ঘোষের মন। ঠিক এই কথা ভেবেছিলেন বুদ্ধ, এরই জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণা সয়েছিলেন যীশু। ইতিহাসে নাম না থাক, পৃথিবীতে কেউ না জানুক, চীৎপুরের একপাশে এই দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর গলির ভিতরে একটা মানুষ মানুষের জন্য আন্তরিকভাবে কাঁদেন, ব্যথা পান, কেতাবি-বুলি না আওড়ানো সত্যিকারের পাপীর মধ্যে মনুষ্যত্ব খোঁজে মানুষকে সৎ হ'তে বলেন। এই মহৎ হৃদয়টুকুর দাম কে দেবে দুনিয়ায় ?

নিজের আচরণে নিজেই হঠাৎ বিস্মিত হলো অমিত। বহুদিন পরে একটা সত্যিকারেব মানুষকে ভালো লাগল। মার কাছে ফিরে যেতে পারলে খুশি হওয়া যেত। মার কাছে থেকেও সুখ। নেশার ঝোঁকে মেয়েমানুষের কাছে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্য, একজন পুরুষেব জন্য, এমন ক'রে তো বিচলিত হই নি কোনদিন। নারী নয়, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নয়, এমন কি লোকেনও নয়। কারও কথা ভাবিনা। অনায়াসে সব ভুলতে পারি। কিন্তু এই পাগলা ডাক্তার? আরোগ্যলাভের সার্টিফিকেট পেয়ে বিদায় নেবাব পরও একবাব পিছন ফিরে তাকালেম। কিছুক্ষণ ভাবলাম।

অমিত দাঁড়িয়ে থেকেই আলো-জ্বলা রাজপথে চলতি মানুষ আব গাড়ি টাম-রিকসার দিকে তাকালো। বিচিত্র ধরণের অদ্ভুত সব মানুষ। কারও চোয়াল-তোবড়ানো, কারও মোষের মুখের মতো এগিয়ে-আসা থুতনি, কেউ আলুর মতো গোলগাল, একজনকে দেখেই বোঝা যায় তিনদিন খায়নি, একজন রাক্ষসের মতো গিলে ভুড়ি বাগিয়েছে, গায়ে আঁতর ছড়িয়ে পকেটে গোড়ের মালা নিয়ে আর-একজন এদিক ওদিক তাকিয়ে চলেছে, কেউ মাতাল, কেউ স্বাভাবিক। কিন্তু একজায়গায় সকলেই এক, সকলেই

মেকি এবং নকল এবং নির্বোধ। মিথ্যে ঘানি টেনে মরছে, ভাবছে দিব্যি আছি। এদের তবু ক্ষমা করা যায়। এরা সাধারণ, অসাধারণত্বের দাবি এদের নেই।

চিৎপুরের অপরিসর ফুটপাতে একটি লাইট পোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে ঘৃণায়, বিদ্বেষে বিরক্তিতে ভিতরে ভিতরে তেতে উঠলো অমিত— বিষ্ণুরাম ঘোষের আন্তরিক চোখের জল কোনদিনই এই দুনিয়াটাকে লজ্জা দিতে পারবে না। বিষ্ণুরাম ঘোষ অন্ধকারেই পোকা-মাকড়ের মতো মরে যাবে কিন্তু দুনিয়ার তাবত মরা মানুষগুলি থাকবে। যেমন, আমি আছি। আমি—শ্রীঅমিত গুপ্ত নামক একটি যুবক কোন অবিবাহিত কুমারীর স্বামী হ'বার উপযুক্ত সৎপাত্র সেজে এখানে, এই চিৎপুরে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলে বুঝবে না কেউ, জানবে না, এই ভদ্র যুবকটির শরীরে রক্তে এমন এক কুৎসিত ব্যাধির জীবাণু কিলবিল করছে যার এক ফোঁটা রক্তে একটি মেয়ের শরীর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পাবে। এই ক'লকাতা, কতো সহজে এখানে আত্মগোপন করা যায়, কতো অনায়াসে সাধু সাজা সম্ভব।

পথ চলতি একটি মহিলার শরীর থেকে স্পর্শ বাঁচাতে অমিত স'রে দাঁড়ালো। এবং তখনই মনে হলো এ'ভাবে দাঁড়িয়ে থাকারও কোন অর্থ নেই। কিছু একটা করতে হবে। দূর ভবিষ্যত না হোক, অন্তত এই রাতটুকু কাটাবার মতো একটা সংস্থান চাই, একটা আশ্রয়। অমিত দেয়ালের দিকে এগিয়ে এসে একটা দোকান থেকে সস্তা সিগারেট কিনলো, দড়িতে ধরালো। এবং পথ চলবার জন্য পা বাড়াবার আগে পকেটে হাত দিয়ে পরখ করলো কতো আছে পকেটে। শেষ সম্বল—আট টাকা আর কিছু খুচরো। অথচ পৃথিবীতে বাঁচতে হ'বে আরও কিছুদিন। পাথেয় হিসেবে এ'টুকুই যথেষ্ট নয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা সিগারেটে কড়া-টান দিতে পেরে ভালো

লাগলো। হাঁটতে সুরু করলো। উদ্দেশ্যহীন পথ-চলা। লোকেন নিশ্চয়ই এতদিনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে—আমি ফিরব না এবং যথারীতি চারদিকে প্রচারও করে দিয়েছে সে'কথা। ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অমিত লোকেনের তক্তপোষটার কথা ভাবলো। আসার আগে ওকে একবার জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিলো—বালিশ তোষক, চাদরগুলো যেন ধুয়ে দেয় ভাল ক'রে নইলে আগামী দশ বছরে সে'গুলো আরও ছিঁড়বে কিন্তু পরিষ্কার হ'বে না! আর এর মধ্যে নীতিজ্ঞানহীন জীবাণুগুলি যদি ওকেও ছেঁকে ধরে। অবশ্য নিজের শরীরে এ'সব আমদানী করার পথ লোকেন নিজেও জানে। কিন্তু ভয় সেজন্য নয়। লোকেন ভীরু। নিজে থেকে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েও এক জায়গায় থমকে দাঁড়াবে। তখন সাহস চাইবে। অমিত ভেবে খুশি হলো, বন্ধুকে সে নিঃসঙ্গ করেছে। ঠিক যে'কারণে নিজে একা হতে চায় তার বিপরীত কারণে। গৃহজীবনের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা মোহ আছে ওর। ও যদি সেখানে ফিরে যায়, তাতে সবচেয়ে যে বেশি সুখী হবে—অমিত বেশ জোর দিয়েই ভাবতে পারলো—সে আমি।

বিডন পার্কের মোড়ে এসে অমিত থমকে দাঁড়ালো। চারদিকে পথ। প্রমাদ গুনলো—যাব কোনদিকে। মোড়ের পান-বিড়ির দোকানের রেডিওতে তখন গান হচ্ছিলো। গানটা অকারণেই বেজে যাচ্ছে। রেডিওব মালিক ব্যবসায় মশগুল, রাস্তার মানুষের দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। জনাকীর্ণ রাজপথে কোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়েও অমিত কান পাতলো। রবীন্দ্রনাথের গান। এবং এই মুহূর্তে মনে হলো এ'গান শোনার মতো মানুষ নেই বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীতে।

কিন্তু গান যখন চলছিলো, অমিত সচেতন ছিলো না ওর মন কি নিয়ে ব্যস্ত। যখন গান ফুরোলো আবিষ্কার করলো—মানুষ দেখছিলো সে। সেই সব পথচারী মানুষ, আশে-পাশে যারা আসছে-যাচ্ছে,

ট্রামে, গাড়িতে, ট্যাক্সিতে, রিক্‌শায় যারা মুখ বাড়িয়ে আছে। থ্যাবড়া মুখ, অথবা ফর্সা সুখী-সুখী চেহারা, নাকে-মুখে বসন্তের দাগ কিংবা ফিট-ফাট কেতা দুরস্ত আদুরে, কেউ বুড়ো কেউ যুবক, কেউ বালক। বার কি তের বছরের দু'টো ছেলে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে চলে গেলো, বুড়িটা ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেতে খেতেও পড়লো না, মোড়ের মাথায় হঠাৎ ব্রেক কষলো ট্যাক্সিটা, ভিতরে গলা জড়িয়ে একটি যুবক একটি যুবতী, বোধ হয় নবদম্পতি অথবা নির্বোধ প্রেমিকা, বাসটার মধ্যে কোলাহল হয়তো নয়াপয়সার হিসাব নিয়ে কণ্ডাক্টারের সঙ্গে বিবাদ অথবা পকেটমার, একটি ভিখারি যুবতী প্রায় নগ্নদেহে, নিমতলাগামী একটি শবযাত্রা, ট্রাম আর বাস ষ্টপে ভিড় করা নরনারী, শো-কেসে সাজানো 'ডামির মতো কয়েকটি রংচঙে যুবতী – দেখতে দেখতে অমিত ক্লান্ত বোধ করলো। এরা সবাই কোথাও যাবে বলে রাস্তায় নেমেছে। এবং ঘর বলে একটা আস্তানা সকলেরই আছে, রাত হ'লে সেখানে ফিরবে। অথচ কেউ কাউকে চেনে না। আমার সঙ্গে কোন পরিচয় নেই এদের! শুধু এদের সঙ্গে নয়, এই শহরের সঙ্গে। আমার বহুদিনের পরিচিত কলকাতা, আমার চিরদিনের অনাত্মীয়। চিৎপুরের মোড়ে ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকাটাই পৃথিবীতে আমার এই মুহূর্তের আশ্রয়। ঠিক এক পা এগোলেই আমি নতুন আশ্রয় পাবো। যদি কেতাবি কথায় বিশ্বাস করতাম তবে বলতে পারতাম, কোথাও আশ্রয় নেই বলেই সর্বচরাচরেই আমি আছি। কতকগুলো ফাঁকা আর মিথ্যাকথা আউড়ে প্রবঞ্চিত হবার মতো অপরাধ আর নেই। ওই ভিখিরি মেয়েটা—অমিত ওদিকের ফুটপাতের দিকে তাকালো—নোংরা আর অজস্র গিঁট-দেওয়া শাড়িটুকু দিয়ে সুস্পষ্ট যৌবন ঢেকে মেয়েটা ভিক্ষে চাইছে। কিন্তু কাদের কাছে? এই পাথুরে দেওয়ালে ঘেরা সহরটাকে ও চেনে না কিংবা চিনেছে। কঠিন মূল্য দিয়ে চিনেছে। একটা মুরগি ভেবে ওকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে এ'শহর

ওর নিটোল বুকে কামড় দিতে ওৎ পেতে আছে শেয়ালগুলো। সতীত্বের দোহাই দিয়ে ওর গায়ে থুথু ছিঁটোবে যারা এবং কেতাবি-ভাষায় নষ্ট-মেয়েমানুষ বলে যারা ওকে পরিহার করবে, ওকে সুপুষ্ট ও লোভনীয় করার জন্য তারাই দানা জোটাবে কিছুদিন। অসহায় মেয়েটা তাই ঠুকরে ঠুকরে খাবে। তারপর হঠাৎ একদিন আর ভিক্ষে চাইবে না, কড়া-গণ্ডা মিলিয়ে আদায়ের টাকা চাইবে। সরযূ-মালতীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। আইনকে ফাঁকি দেবার মতো বুদ্ধিও শিখে ফেলবে। তখন এই সব ভদ্রলোকদের গায়ে লাথি মেরে মেরে গালে চড় কষে অনর্গল খিস্তি করবে। পোষা বিড়ালের মতো ঘুর ঘুর করবে এই মানুষগুলো।

কিন্তু তার আগে যদি আমি মরে না যাই এবং মেয়েটি যদি আমার কাছে আসে ওকে আশ্রয় দেবো। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে অমিত কিছু অসম্ভব কথা ভেবে সুখ পেতে চাইলো। সবচেয়ে আগে একটা ব্লাউজ কিনে এনে বলবে—বুক ঢাকো। এবং তারপর ওকে বাড়ি বাড়ি ঝি হ'তে বলবো, আমি যা হোক একটা কিছু ক'রে কাটাবো। বলবো—'ভয় নেই তোমার। নষ্ট-মেয়েমানুষের কাছে যাই বলেই তো মেয়েমানুষকে নষ্ট করব না। আমি গরিব মানুষ। আমার ক্ষুধা আছে, লোভ নেই। আমাকে বিশ্বাস করতে পার।' ও থাকবে ওর মতো। আমি থাকবো আমার মতো। আমি শুধু ওকে আড়াল করে রাখবো, ওর শরীরে যেন পোকা না পড়ে।

আঙুলের সিগারেটটা ফুরিয়ে আসার পর যখন পোড়া-সিগারেটের উপর অকারণ মমতা জন্মালো তখনই সচকিত হয়ে একটা বিকট অট্টহাসিকে ভিতরে ভিতরে থিতিয়ে নিলো অমিত। আমি রুগ্ন, অসুস্থ, কিন্তু উন্মাদ তো নই। পাগলের মতো কি ভাবছি এ'সব? এবং কয়েকটা টানে সিগারেটটা শুষে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরের হাইড্রেণ্টে। তাকিয়ে দেখলো, ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে এগোতে এগোতে মেয়েটি [illegible] অনেক-দূরে চলে গেছে। মনে হলো, ওকে

নিয়ে চিন্তা করার দায় আর ওর নেই। এই বর্বর দুনিয়ায় ওকে তো এ'ভাবেই বাঁচতে হ'বে। ওর জন্য কি-ই বা করতে পারি আমি, আমি! অমিত একা একাই একটু মজা পেলো এই ভেবে—আমিও আশ্রয় দেবার কথা ভাবি এবং একটি মেয়েকে, যুবতী মেয়েকে। মাথার চুলগুলো দু'হাতের আঙুলে পিছনের দিকে জোর কবে টেনে শরীরটাকে একটু চাঙা করে নিলো। এবং আবার সেই সমস্যা—তারপর? সামনে পরস্পারের মুখোমুখি দু'জোড়া রাজপথ—যাব কোন দিকে? প্রায় ষাট লক্ষ মানুষের বসতি, ভারতবর্ষের বৃহত্তম নগরীর বিপুল বিস্তারের মধ্যে আমি একটি নগণ্য মানুষ একটু মাথা-রাখার ঠাঁই চাইছি এবং পাচ্ছি না। পাবও না। অথচ রাত বাড়ছে, ক্ষিধে পাচ্ছে। আপাতত ক্ষিধে মেটানোর মতো সঙ্গতি আছে। কিন্তু তারপর?

এই চিৎপুরে আশ্রয়ের অভাব নেই, দিব্যি নেশা ক'রে বুঁদ হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় রাতটা। কিন্তু পাগলা ডাক্তার বিষ্ণুরাম ঘোষকে মনে পড়লো হঠাৎ। এই একটু আগে, পুরো এক ঘণ্টাও কাটেনি এখনও মানুষটা আমার হাত ধরে কেঁদেছে। পরম বিশ্বাসে ভগবানের দোহাই দিয়েছে, পাপের অভিশাপের কথা বলেছে, নরকের বিভীষিকার ছবি তুলে ধরেছে। ওর বিশ্বাসে আঘাত করতে ইচ্ছে হয়নি কিন্তু লোল চর্ম, নুয়ে-পড়া ভগ্ন স্বাস্থ্য বৃদ্ধের কাতরতায় বিচলিত হয়েছিলাম এবং মানুষটাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। অনেক মেয়েমানুষ [illegible] দেখেছি, ওদের স্বাদ সর্বত্রই এক, নেশাও করেছি প্রচুর [illegible] জীবনে একটা রাত, শুধু আজকের রাতটা ওই বুড়োর [illegible] করি—ক্ষতি কি? খাঁটি [illegible]ষ পায়নি অনেক [illegible] মাকে মনে পড়লো। এবং সেই মুহূর্তেই একটু [illegible] অমিত। দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার সিগারে[illegible]নের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। পারা-ওঠা সস্তা-কাচে[illegible]তে নিজের মুখটাকে আরও কুৎসিত দেখলো। [illegible] মতো বীভৎস।

অথচ এই কুলাঙ্গারের মা হবার লজ্জা নিয়ে, একটি বৃদ্ধা ধুঁকতে ধুঁকতে আজ তার মৃত্যুর দিন গুনছে কিংবা মরে গেছে। অমিত ওর শেষ দেখা মা'র ছবিটা মনে মনে চিন্তা করলো। এবং স্মৃতিটাকে দূর ক'রে সরিয়ে দিতেই যেন আরও একটা সিগারেট কিনলো। দড়িতে আগুন ধরাতে গিয়ে মনে হলো, শুধু একটা সিগারেট নয়, এই দুঃসহ স্মৃতি থেকে মুক্তি পেতে একটা রাত মদ খাওয়া যায়। মাকে ভুলতে পারি না কিছুতেই পারি না—একদিন আত্মহত্যার চেষ্টার আগে শুধু এই বুড়ির কথা ভেবেই আমি ঘেমে উঠেছিলাম। আর আজ মরতে চাই না কিন্তু মাকে আমি হারিয়েছি। বুড়ি হয়তো বেঁচে নেই তবু কিছুতেই আর ফিরে যাব না। ছেলে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়ে শহরে রোজগার করে, স্বার্থপরেব মতো একা-একা সুখ করে, বাবুগিরি করে, মা-ভাইকে দেখে না—মৃত্যুর আগে এই বিশ্বাস নিয়েই বুড়ি মরুক। কিন্তু জীবনের শেষ দিনে কিছুতেই তার কাছে গিয়ে এ'কথা জানাব না—তার লেখাপড়া-জানা সেই মহাপণ্ডিত ছেলে বড় শহর কলকাতার পথে পথে নাম হীন গোত্রহীন জারজের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এবং সে-ও আজ মৃত্যুর কাছাকাছি। সেও বাঁচবে না বেশিদিন।

এবং এতোদিন পরে দাদার কাছে গিয়েও কোনমতে বলা চলবে না —যদি তোমাদের মতো আদিম মানুষ হয়ে, চাষবাস ক'রে দিন কাটাতাম সুখে থাকতাম। হয়তো অশিক্ষিত মূর্খ হতাম, ক্ষতি ছিল না কিন্তু সভ্যতার আলো পেতে গিয়ে এমন ভাবে মরতাম না।

একটানা বিকট হর্ণের আওয়াজে কেঁপে উঠলো চারদিক।' অমিতের চিন্তাস্রোত বাধা পেলো হঠাৎ। বড় একটা দামি গাড়ি দুরন্ত গতিতে ছুটে গেলো পাশ দিয়ে এবং ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠলো সমস্ত শরীরটা। দুর্বল দেহ নিয়ে অমিত একটা দেয়ালে হেলান দিলো। এক মুহূর্তে সমস্ত আবহাওয়া কেমন থমথমে হয়ে উঠলো তারপরই

চিৎকার, গালাগালি, খিস্তি। অথচ বেপরোয়া গাড়িটা তখন পিছনে ধোঁয়া উড়িয়ে উধাও।

অমিত অনুভব করলো সে ক্লান্ত, কুকুরের মতো হাপাচ্ছে। এ'বার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে—কোথায় যাবে? আদৌ কোথাও যাবে কিনা। সামনে বিডন পার্কে ঘুমিয়ে থাকলে গভীর রাতে পুলিশ ধরবে। কিন্তু যদি বাসে ক'রে স্টেশনে যাওয়া যায়! শিয়ালদা কিংবা হাওড়া! সে'খানেও অনেক জায়গা এবং সেখানেও অসংখ্য পাইস-হোটেল।

বিষ্ণুরাম ঘোষ শুধু কিছু শুকনো চোখের জল ফেলেনি। সে খাঁটি মানুষ, এই শহরের মেয়র হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। অমিত তার অনুরোধের কথা স্মরণ করলো। অমিত হাসতে হাসতেই মজা ক'রে নিজের কথা বলেছিলো এবং এক মুহূর্তে কোন দ্বিধা না ক'রে ওকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো বুড়ো। বুড়ো-বুড়ির ছোট সংসার। একটা ঘরেই চলে যায় কিন্তু সেই যে যুদ্ধের আগে ত্রিশ সাল থেকে তিনটে ঘর নিয়ে আছে আজও ছাড়েনি। ভাড়া কম। একটা ঘর অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারবে। চাকরি-বাকরি ক'রে অমিত যদি নিজের খরচ চালাতে পারে বুড়ো নাকি খুশি হবে। আর যতোদিন কাজকর্ম না জোটে, গবিবের ঘরে নাকি চলে যাবে দিন কতক।

অমিত রাজি হয়নি। চেম্বার আর পোষাক দেখেই ডাক্তারকে চিনে নিয়েছিলো। মধ্যবিত্ত সংসার। কোনমতে চলে। তা'ছাড়া, বুড়ো-বুড়ির মধ্যে সে আরেক ঝামেলা। কিন্তু অমিত ঠিক সেই মুহূর্তে বেশি দূর তলিয়ে ভাবতে চাইলো না। অসুস্থ, ক্লান্ত,' ক্ষুধার্ত শরীরে সামনের দিকে পা বাড়াবার সাহস আর নেই। একটা রিকশা ডাকলো। এবং এক মুহূর্ত না ভেবে উঠে বসলো। হাঁকলো—'চলো ডায়না তরফ।'

চেম্বার বন্ধ ক'রে বিষ্ণুরাম ঘোষ তখন ঘরে '[illegible]ছিলো। বগলে

খাতা, এক হাতে একটা রেশন-ব্যাগ। ঠিক গলির মুখে দেখা। রিকশা থেকেই প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলো অমিত—'ডাক্তারবাবু।'

'হ'বে না, হ'বে না, দেখছিস না বাড়ি যাচ্ছি—'কে ডাকছে, না দেখেই এবং কেন ডাকছে খোঁজ না নিয়েই মুখ ঝামটা দিয়ে পাশ কেটে চলে গেলেন ডাক্তার।

অমিত রিকশা থামালো। আবার গলা চড়িয়ে বললো—'ডাক্তারবাবু আমি অমিত। সেই যে সন্ধ্যেবেলা এসেছিলাম—'

'বলছি তো বাপু, হ'বে না এখন। বাড়ি যা—' বিষ্ণুরাম ঘোষও কোনো পাত্তা দিলেন না। খেঁকিয়ে উঠলেন।

'অমিত দমলো না। রিকশার দাম মিটিয়ে পিছু ছুটে গিয়ে পাশে দাঁড়ালো—'ডাক্তারবাবু আমি! চিনলেন না? সেই যে সন্ধ্যেবেলা এতো কথা বললেন।'

'কে?' ডাক্তার ঘোলাটে চশমায় আলো ঢাকতে হাত দিয়ে চোখ আড়াল ক'রে উঁচিয়ে তাকালেন—'কে, সেই 'এম-এ' পাশ সেই ছোকরা।'

'হ্যাঁ সেই—'অমিত হাসতে হাসতে বললো।

'হারামজাদা! আবার এসেছিস। বলেছি না, আবার এলে 'ইঞ্জেকশানে বিষ ঠুকে দেবো। শেয়াল-শকুনের অভিশাপ আর সইছে না বাপু। বাড়ি যা, দূর হ, দূর হ—'

'না না, ডাক্তারবাবু শুনুন, আমি রোগ দেখাতে আসিনি।'

'তবে কেন এসেছিস।'

'ঘর ভাড়া দেবেন বলেছিলেন।'

'ঘর ভাড়া দেব? কেন, ঘর কি হাসপাতাল নাকি?'

'কিন্তু—'অমিত এ'বার একটু বিব্রত হলো—'কিন্তু আপনি বলেছিলেন।'

'সে তখন বলেছিলাম। তখন ডাঁট দেখিয়ে চলে যাওয়া হলো কেন শুনি।'

'আবাব তো এসেছি। আপনার কাছে থাকবো।

'কোথায় থাকা হয়েছিলো এতক্ষণ। হারামজাদা বজ্জাত তোদের বিশ্বাস আছে। কি আবার রোগের ডিপো নিয়ে এসেছিস।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কোথাও যাইনি। আপনি পরীক্ষা করুন—অমিত বেশ মজা পেলো মিনতি ক'রে বলতে।

'আমি তোদের বিশ্বাস করি না, ব্যাটা মিথ্যাবাদীর জাত—' আবার দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন বিষ্ণুরাম ঘোষ—'সত্যি ক'রে বলছিস্।'

অমিত বুঝে নিয়েছে, এ পাগলা মানুষটা এখন আয়ত্তের বাইরে। হেসে বললো—'মিথ্যে কথা তো আমি বলি না ডাক্তারবাবু।'

'তা'লে চল্। মা কালীর থানে দিব্যি কাটবি।'

'মা কালীর থান! সেখানে কেন!'

'পেন্নাম ক'রে দিব্যি কাটবি, এখন থেকে ভাল হবি, ও'সব পাড়ায় যাবি না, অখাদ্য কুখাদ্য খাবি না।'

'অমিত এ নতুন বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিলো না। বেঁটে-খাটো এই বিচিত্র মানুষটার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিত কৌতুকও বোধ করলো। এবার এড়ানো যায় কি ক'রে।

'কি হলো আবার তোর? চ', চ'—'

'মা কালীর থানে দিব্যি কাটলেই আপনি ঘর ভাড়া দেবেন ডাক্তারবাবু। আমাকে বিশ্বাস করবেন।'

'করবো না কেন! আমার কাছে বেইমানি করলে পার পাবি কিন্তু মার কাছে করলে রক্ষে নেই। শেয়াল-কুকুরে টেনে নেবে না। ডুব দিয়ে জল খেলে মানুষকে ফাকি দেওয়া যায় কিন্তু ভগবানকে? হুঁ, হুঁ বাপু, সাবধান।'

'চলুন—'

'চ'—বগলের ছাতাটা বাঁ-হাতে আরও একটু গুঁজে নিয়ে তরতর ক'রে এগিয়ে গেলেন বিষ্ণুরাম ঘোষ—'আয় তো ওই দোকানটায়।

ক'টা সওদা ক'রে ট্রামে উঠবো।'

দু'আনার ইসপ গুলের ভুষি এবং চিরতা দু'আনা। আড়াই কিলো চাল আর এক পো সরষের তেল, নুন পাঁচ পয়সার। কেনা-কাটা শেষ ক'রে ডাক্তার বললেন—চ', আমাদের পাড়াতেই মা'র মন্দির। আজ তিনশ বছরের জাগ্রত দেবী।'

দেবতার নামে জোড় হাত কপালে তুলতে দু'হাতের ব্যাগ আর ছাতায় বাধা পেলেন বিষ্ণুরাম ঘোষ। অমিত হাত বাড়িয়ে বললো—'দিন ও'গুলো আমার কাছে, আমিই নিয়ে যাই।

আটাশ

তিনশ বছরের জাগ্রত দেবতা রক্ষাকালীব মন্দিরে গড় হয়ে প্রণাম করতে বাধ্য হলো অমিত। বুড়ো বিষ্ণুরাম ঘোষ দু'হাত সামনে রেখে সটান উপুড় হয়ে অদ্ভুত এক অপরিচিত কণ্ঠস্বরে আছড়ে পড়লেন—'মা, মা, মাগো···'

পরীক্ষার হলে অসদুপায়ী কোন ছাত্রের মতো ডাক্তারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে যখন বুঝলো যে তার আশু গাত্রোত্থানের সম্ভাবনা নেই, অমিত উঠে বসলো। হাতের ধুলো ঝাড়লো, কপালটা মুছে নিলো। ধুলো পড়বার কথা অবশ্য নয়। মন্দিরের চেহারা দেখলে বোঝাই যাবে না যে, সে জব চার্ণকের সমবয়সী। বড়ো বড়ো চৌকো মার্বেল-পাথরের মেঝে। ভগবানের পদধূলি সে'খানে সুলভ না হলেও ভক্ত সমাগমে মসৃণ মেঝেও বালি কিরকির করছে। অমিত হাঁটু গেঁড়ে বসে ভয়াল দেবী-মূর্তির দিকে তাকালো। ও'দিকে পাড়ার বিধবা বুড়িদের জটলা। কারও হাতে রুদ্রাক্ষের জ্বালা, কেউ শুধু হাতেই কাপড়ের পুটলির মতো জবুথবু। আরও যে

ক'টা মানুষ টান হয়ে পড়ে আছে, বোঝা কঠিন তারা ঘুমোচ্ছে না ভক্তির আতিশয্য। দেবী-মূর্তির সামনে ফুলের ছড়াছড়ি, ধূপ-ধুনো, ঘটটাকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। একটা পিতলের বারকোশে প্রণামীর নয়া-পয়সা, দরজায়-দেয়ালে-চৌকাঠে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা। হাঁটু ভেঙ্গে বসে থাকার অনভ্যাসে কোমরটা ব্যথা ক'রে উঠলো। অথচ উঠে দাঁড়াতেও পারলো না অমিত। বিষ্ণুরাম ঘোষ একটু নড়ে উঠতেই সচকিত হয়ে দু'হাত এক ক'রে বুকে ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসলো, এবং যখন দেখলো, ডাক্তারের ভক্তি অতো সহজে ভাঁটা পড়ার নয়, তখনই আবার হাত পা ছড়িয়ে সহজ হয়ে নিলো। এবং অবশেষে বিষ্ণুরাম ঘোষ যখন সত্যি দেহ তুললেন অমিত অনুগত ভক্তের মতো স্থির তন্ময়। বিষ্ণুরাম ঘোষ নিজহাতে বার তিনেক কান-মলা খাবার আগেই সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে বিনৃত সুরে চিৎকার ক'রে উঠলো অমিত—

'মা, মাগো—'

বিষ্ণুরাম ঘোষ খুশি হলেন। অমিত অনুভব করলো, ওর পিঠে সস্নেহ হাত বুলোচ্ছে কেউ।—

কই গো ঠাকুর, দাও, একটু চরণামেত্ত দাও। পেসাদি ফুল দাও তো এই ছেলেটাকে। বড় দুঃখী ছেলে। বুঝলে কিনা। মা'র দয়ায় যদি স্বভাব ফেরে।'

'কে গো ই ছেলেটা কে ডাক্তার?'

'ভালো ছেলে, বড়ো ভালো ছেলে। 'এম-এ' পাশ—হুঁ। তবে বুঝলে কিনা স্বভাবদোষে কুপথে চলে গিয়েছিলো। তাই নিয়ে এলাম। বললাম, মায়ের পায়ে পেন্নাম কর, মায়ের ওপর ভক্তি রাখ দেখবি মতি ফিরবে। শান্তি পাবি।'

'ভালো করেছো, বেশ করেছো। দেখছো কেমন ভক্তি ব্যাটার।'

গড় হয়ে শুনছিলো অমিত। এ'বার মাথা তুললো। সামনে জটাধারী এক বৃদ্ধ। দাঁড়ি-বাবরি চুলের জঞ্জালের মধ্যে

ছুটো ঘোলাটে চোখ। মন্দিরের এতটুকু পরিসরের মধ্যে লোকটা যে কোথায় ছিলো বোঝা যায়নি এতক্ষণ। হাতের তামার বাটি থেকে কিছুটা জল নিয়ে কুশটা বাড়াতেই অমিত হাতের আঁজলা এগিয়ে দিলো। এবং মুখের কাছে মুখ আসতে তখনই বুঝে নিলো, মায়ের কারণটা কোন কোম্পানীর এবং পাঁইট কতো ক'রে, লেবেল কি। চবণামৃত মুখে দেবার নাম ক'রে ঠোঁটের কাছে এনে ডাক্তারকে অনুসরণ ক'বে সবটুকু মাথায় নিলো। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো—'তুমি বেশ সুখেই আছ ঠাকুব। দিব্যি আছ।'

'কি, কি বললি ?' ঠাকুরের কণ্ঠস্বব তখন বেশ আড়ষ্ট।

'না, এই বললাম, মায়েব কাছে আছো, চরণসেবা করছো। প্রাণ খুলে যা খুশি করো, তোমাব পুণ্যি মারে কে।'

'হেঁ, হেঁ, যা বলেছিস বাপ্—ঠাকুব এ'বাব তার দাঁড়ি-গোঁফের বীভৎস মুখে আরও বিকট দাঁতগুলো বেব করলেন—'তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি। এখন এই মা-ই তো ভরসা। তা বেশ বলেছিস। ডাক্তাব, তোমার এই ছেলেটি কতা বলে বেশ।'

'হবে না, এমনি এমনিই এতগুলো পাশ দিয়েছে ? কি রে কি বলিস্।'

পরম অনুগতের মতো অমিত ঘাড় নাড়লো।

'কিন্তু ডাক্তার—

'কি ঠাকুর—'

'কাল সকালে এসো তো একবার। আমার সেই পেটের ব্যথাটা—পেটের এককোণে আঙুল টিপে ঠাকুর এমনভাবে মুখ ভেংচে উঠলেন যেন এখনই ব্যথাটা চাগিয়ে উঠেছে—'আজ ছুকুরে বড্ড কষ্ট পেয়েছি ডাক্তার। শুধু কাত্‌রেছি।

'আচ্ছা, আচ্ছা সে হ'বেখন। তোমার ভাবনা কি, মা'র পা জড়িয়ে থাকলে কোন ব্যথাই তো ব্যথা নয় ঠাকুর। অমন ভাগ্যি কি আর আমাদের হলো।'

'না, না, ডাক্তার। কাল একবার আসবে।'

'আসবো নিশ্চয় আসবো—' তরতর ক'রে দু'পা এগিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে রাখা রবারের পাম্প-সুটা পায়ে গলিয়ে ডাক্তার বললেন—আজ চললাম ঠাকুর। কাল আসবো।'

ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে অমিত আগেই তৈরি হয়েছিলো। রাস্তায় নেমে বিষ্ণুরাম ঘোষ করুণ হয়ে বললেন—'ঠাকুর বড্ড কষ্ট পাচ্ছে রে। কি যে করি।'

'আমারও ব্যথাটা কমছে না ডাক্তারবাবু। বেড়েই চলেছে।'

'বাড়বে না। কেন বাড়বে না শুনি—'বিনা ভূমিকায় হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলেন ডাক্তার—'ঢক্ ঢক্ ক'রে আরও গিয়ে ছাইপাশ গেল্ল। লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, বাঁদর—'

'আর আপনার ওই ঠাকুর—'

'কি, আস্পদ্দা তো কম নয় তোর। ওঁরা তান্ত্রিক, ওঁদের সঙ্গে তোর তুলনা?'

অগত্যা থেমে যাওয়াটাই বিবেচনার কাজ মনে করলো অমিত। একটা অপরিসর গলির পথে পাশাপাশি চলতে চলতে একবার পাগলা বুড়োর দিকে তাকালো। এবং করুণাও হলো। সে'কালের 'এল্-এম-এফ্' ডাক্তার। কি-ই বা শিখেছে চিকিৎসাশাস্ত্রের? না-শেখা ভাগটাই বেশি। নইলে বুঝতো, সব মানুষেরই শরীরের নিয়মটা এক। অন্যথা নেই।

'আয়—'

অমিত ঘাবড়ে গেলো—'কোথায়?'

'আয় না আমার সঙ্গে।'

কুমারটুলির অন্ধকার গলি। রাজপথ ছেড়ে এসেছে অনেক আগে। এতক্ষণ তবু আলো-বাতাসের অস্তিত্ব আছে এমনি একটা গলির মধ্যেই পথ চলছিলো। কিন্তু এ যে ভীষণ গলি। দু'হাতও চওড়া নয়। গ্যাসের আলো কিংবা কোন বাড়ির জানালার উদ্বৃত্ত আলোও

নেই। অন্ধকার! কোথায় যেন হাইড্রেন্টে জল পড়বার শব্দ হচ্ছে একটানা। অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে চলতে গিয়ে অমিত হাত ফেললো শ্যাওলা-পড়া একটা ভেজা-দেয়ালে। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে ট্যাঙ্কের জল উপচে পড়ছে আবহমান কাল ধ'রে। রাস্তাটা ভেজা। শিশুর কান্না, হাঁপানি রোগীর প্রাণান্তকর কাসির শব্দ, পাগলের চিৎকার, বাজখাঁই গলায় কোন এক গৃহস্বামীর শাসন, এবং জাহাজের ভেপুঁ—মনোরম আবহ। অমিত জানে, কলকাতার কুৎসিততম গলি হ'লেও উন্মুক্ত গঙ্গা এ'খান থেকে বড়ো জোর মিনিট দুয়েকের পথ।

এ'জাতীয় গলি খুঁজিতে পথ-চলায় অমিত অনভ্যস্ত নয়। কিন্তু দু'পাঁচ গজ পিছনে রেখে তরতর করে এগিয়ে আবছা-ছায়ার মতো বিষ্ণুরাম ঘোষের মূর্তিটা যে'খানে এসে থামলো, সেখান থেকে বাড়িটার আয়তন বা উচ্চতা কিছুই বোঝা গেলো না। তবে উপরের দিকে তাকাতেই যে একফালি সরু আকাশ চোখে পড়লো তাতে অনুমান ক'রে নিতে এতটুকু কষ্ট হয় না যে, এই পিঁপড়ের গর্তে আর যাই থাকুক আলো আর বাতাসের প্রবেশ বে-আইনি।

ছোট বাড়ি কিন্তু অনেক মানুষ। নীচের তলায় ভাড়াটেরা এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে! সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠার সময়ে কোণের ঘরের দরজার কাছে একটা আধা-নেভানো হারিকেন দেখা গেলো। অমিতকে সিঁড়ির মুখে দাঁড় করিয়ে ডাক্তার সে'দিকে এগিয়ে গেলেন। খুব নীচু গলায় ডাকলেন—'বৌমা—'

একটু পরে যে-মেয়েটি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, আবছা-অন্ধকারে অমিত তাকে ঠিক দেখতে পেলো না। তবে বোঝা যায়—যুবতী।

'হরিশ এখন কেমন আছে মা?'

বৌ-টির কণ্ঠস্বর শোনা দুঃসাধ্য। একতরফা ডাক্তারের গলাই শোনা গেলো- 'সেকি আজও? কতখানি? অনেক? আঃ,

আর পারি না মা, ভগবান যে কবে তোদের ওপর মুখ তুলে চাইবেন। যাক্—তোর সেই 'এক্স-রে' প্লেটটা আমাকে কাল আরেকবার দিস তো মা। অশ্বিনী ডাক্তারকে দিয়ে চলবে না, আরও বড়ো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। না, না, সে তোকে ভাবতে হ'বে না। হরিশবাবা ভাল হোক, এই বুড়োকে পেট ভ'রে খাইয়ে দিস। কাঁদিস না, কাঁদিস না, মা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ। তিনিই জন্ম দিয়েছেন তিনিই সব দেখবেন। মা, মা তারা, সবই তোমার ইচ্ছায় মা। তুমিই জানো—

পৃথিবীতে আরও একটি দুঃখের কাহিনী এবং কান্নার কথা। অমিত ব্যাপারটা অনুমান করলো এবং নিসংশয় হলো, অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নির্লিপ্তভাবে অভ্যাসবশে পকেটে হাত দিলো কিন্তু সিগারেটের প্যাকেটটা বের ক'রে হঠাৎ খেয়াল হলো, পাগলা ডাক্তাব বোধহয় এতটা সহ্য করবে না। সুবোধ বালকের মতো আবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ভাবলো, সিঁড়ি ভেঙ্গে কয়েক ধাপ উপরে উঠে যাবে কিনা কিন্তু সাহস হলো না। যা অন্ধকার। সাপ-টাপ না থাক, কাঁকড়াবিছে তো নির্ঘাত আছে। অপরিচিত সিঁড়ি। বড়ো রকমের একটা হোঁচট মোটেই অসম্ভব নয়।

হাঁটুর উপর হাত চেপে সিঁড়ি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বিষ্ণুরাম ঘোষ বললেন—'এখানে থাকবি, একটু সাবধানে থাকিস বাবা। বড্ড ছোঁয়াচে রোগ। তোর আবার যা স্বাস্থ্য। দ্যাখ দেখি, ভগবানের কি নিয়ম। অমন কচি মেয়েটা। দেড় বছরও হয়নি বে হয়েছে, সাধ-আহ্লাদ কিছুই মিটলো না, স্বামীটা পড়লো অসুখে। কে জানে কি হ'বে। সব অদৃষ্ট, বুঝলি না, কপাল কপাল—'

পায়ের শব্দ পেয়ে হারিকেন লণ্ঠন হাতে একজন মহিলা সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এসেছিলেন। হঠাৎ অমিতকে সঙ্গে দেখেই ধপ ক'রে লণ্ঠনটা রেখে চোখের পলকে ঘোমটা টেনে স'রে দাঁড়ালেন।

বিষ্ণুরাম ঘোষ ফোকলা দাঁতে হাসলেন—'এই দ্যাখো, তোমার

আবার হলো কি। আরে, এ তো সেই ছেলেটা। কাল যার কথা বলছিলাম তোমাকে। এম-এ পাশ। তোমার ছেলের বয়সী। ওকে দেখে লজ্জা।'

অমিত পায়ের ধূলো নিতে নীচু হলো। মহিলাটি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালেন। লণ্ঠনটা হাতে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন ছ'জনকে। এবং সেই রাতেই আপন হলেন। স্বামীর দুঃখ-দারিদ্র্যের অংশীদার হয়ে সন্তানহীনতার নিঃসঙ্গ কারাবাসে ক্লান্তিকর জীবনকে বহন ক'রে চলেছেন। অসংখ্য শীতে রস-নিংড়োন খেজুরগাছের মতো ক্ষত-বিক্ষত শরীরে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। ভালোবাসার আবেগে গ্রাম্যতা। অমিতের ভালো লাগলো। কিন্তু একটু পরেই বিরক্তি জন্মালে। ভদ্রমহিলা ঘর দেখিয়ে বললেন—এই তোমার ঘর। হাত-পা ধুয়ে নাও বাবা। ভীষণ রাত হয়েছে। লজ্জা করো না কিন্তু। তোমার আপন ঘর।'

চ্যাপ্টা ধরনের একটা ঘর, একটা ভাঙ্গা তক্তাপোষ। একটা মাছুরের উপর একটা বালিশ রেখে পরিপাটি ক'রে বিছানা করলেন ভদ্রমহিলা। অমিত একটু দাঁড়িয়েই ঘেমে উঠলো এই আশ্বিন মাসে। ভাবলো এ'ঘরে রাত কাটবে কি ক'রে? দরজাটার প্রয়োজন মোটামুটি বোঝা যায় কিন্তু এই বদ্ধঘরে কোণের ওই জানালাটা কোন উপকার সাধন করছে বা কেন তৈরি হয়েছে—অনুধাবন অসম্ভব। প্লাষ্টার খসে পড়ে জীর্ণ দেয়ালটা বিশ্রী একটা ভ্যাঁপসা গন্ধ ছড়াচ্ছে। অমিত নাক ঢাকবার প্রয়োজন বোধ করলো না। তবু তো পৃথিবীতে একটা মানুষ ওর সব পাপ, সব অন্যায়কে জেনেও সহজভাবে আশ্রয় দিয়েছেন, স্ত্রীকেও পরিচর্যার দায়িত্ব দিয়েছেন। বেশিদিন হয়তো টিকবে না, তবু যতো অল্পদিনই হোক, পৃথিবীতে একটু অস্থায়ী গৃহজীবনের স্বাদ, মন্দ কি?

রান্নাঘর ছোট। বারান্দাতেই একটা এনামেলের গামলাকে উপুড় ক'রে লণ্ঠন রাখা হলো। পাশাপাশি ছ'জন—স্বামী আর অতিথি।

বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করলো না অমিত। খাবলে খাবলে খেতে লাগলো। উপকরণ সামান্য। মোটা ভাত, একটু শাক, কয়েক ফোঁটা ডাল, একটা শুকনো চচ্চড়ি, ছোট এক বাটি ঝোল, থালায় উপুড় করতেই গোটা তিনেক চিংড়িমাছ বেরোল আর এক টুকরো আলু। তবু অমৃত লাগলো স্বাদে। থালার উপর হাত দিয়ে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে ভাত দেবার, এমন ক'রে সামনে বসে আদর ক'রে খাওয়ানোর মধ্যে একটি মহিলার সুখ। কতদিন এ'ভাবে খাইনি। অমিত খেতে খেতে চিন্তা করলো এবং পাশাপাশি দু'জনকে মনে পড়লো—মা'কে এবং লোকেনদের মেসের সেই চাকর-টাকে। অন্যের ক্ষুধাকে নিজের ক্ষুধা ব'লে নিজের অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়ে এমন সস্নেহ পরিবেশন—শুধু মা পারতেন। আব এতদিন পরে—অমিত চোখ তুলে তাকালো—সামনে সেই বুড়ি।

'তোমায় একটু ভাত দেব বাবা ?'

'না, না, এ'গুলোই শেষ হোক—' অমিত থালার কার্নিশে হাত চাঁচতে চাঁচতে বললো।

'না বাবা, তা হোক তুমি নাও। জোয়ান ছেলে—' মাটির হাড়িটা সামনে এনে ঠক্‌ঠক্ শব্দ ক'বে দু'হাতা ভাত দিলেন ডাক্তার গিন্নি।

'খা, খা পেট ভ'রে খা। লজ্জা করিস না—' বিষ্ণুরাম ঘোষ চুপচাপই ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ বললেন—'সে ছিলাম আমি। হ্যাঁ, খাইয়ে ছিলাম বটে। আমি এক পাঁঠা আর আমার বাপে এক পাঁঠা! নেমন্তন্ন করতে ভয় পেতো লোক। আর বুঝলি কিনা, তোর এই মাসি। যেমন রাঁধতে জানতো তেমনি খাইয়ে আনন্দ পেতো। কিন্তু এখন কি আর সে'দিন আছে। আমিও খেতে পাইনা, ও-ত আর খাওয়াবে কা'কে।'

কথার মাঝখানেই অমিত হেসে উঠেছিলা, শেষ হতেই একেবারে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো—'কি বললেন, আপনি এক পাঁঠা আর আপনার বাপে এক পাঁঠা।'

ডাক্তার গম্ভীর—'কি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না না, বিশ্বাস করবো না কেন। তবে—'

'আর একটু ঝোল দিই বাবা—ঝোলের বাটিটা একেবারে সামনে এনে ডাক্তার-গিন্নি বিনা-অনুমতিতেই থালার উপর উল্টে দিলেন—'তুমি লজ্জা করছো বাবা। নইলে অমন শুকনো ক'রে খাচ্ছ কিছু বলছো না।'

অমিত বিস্মিত—'এ কি করলেন আপনি। সব দিয়ে দিলেন। আপনি?'

'আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হ'বে না, তুমি খাও। মেয়েমানুষ একদিন একবেলা না খেলে কিছু হয় না। তাই ব'লে তুমি না খেয়ে থাকবে?'

'কিন্তু'—অমিত দ্বিধাগ্রস্ত।

'না বাবা, তুমি খাও, পেট ভ'বে খাও।'

'খা খা, তুই-ই খা—' বিষ্ণুবাম ঘোষ পুরো এক গ্লাস জল পান ক'রে ঢেকুর তুললেন- কা'কে বলছিস্। শুধু কি ঝোল, দেখছিস্ না হাঁড়িও বাড়ন্ত। বললাম কি তোকে, তোর মাসির খাইয়েই আনন্দ। হেঁ, হেঁ –'

বিচিত্র আত্মপ্রসাদে হাসলেন ডাক্তার। আর অমিতের সঙ্কোচ ভাঙ্গতে ডাক্তার-গিন্নিও হেসে বললেন—'লজ্জা করো না। খাও বাবা, খাও। গরম হচ্ছে, বাতাস করবো?'

উনত্রিশ

ইলিশ মাছ। আঁশ ছাড়িয়ে, গলাটা চিরে আঙুলের সাঁড়াশি ডুবিয়ে নাড়ি-ভুড়ি আর তেল বের ক'রে আনলো তৃপ্তি। রক্তে ভেসে গেলো হাত। সে রক্ত লাল এবং নীল। খুশি হয়ে বললো—'মাছটা বেশ তাজা এনেছো নিধুর-মা। দেখেছ, কি রক্ত।'

ওদিকে বাটনা বাটছিলো নিধুর-মা। প্রশংসায় তৃপ্ত হওয়া দূরে থাক, ঘাড় ফিরিয়েই সোরগোল তুলে দিলো—'দিলে তো, দিলে তো অমন সুন্দর মাছটা নষ্ট ক'রে? আমি তখুনি বলেছিলুম—তুমি পারবে নি। সক্কলেই কি সব পারে?'

'কেন, কি করেছি? এই তো কেটেছি।' তৃপ্তি অবাক।

'কেটেছ না মাথা কিনেছ—' নিধুর-মা তখন শিল-নোড়া ফেলে বঁটির কাছে উঠে এসেছে—'ছিঃ মা, বাঙাল দেশের মেয়ে হয়েছো আর ইল্‌শে কুটতে শেখনি। পিত্তি গলে গেছে যে। ও কি খেতে পারবে কেউ? নাও, নাও, ঢের হয়েছে। ওঠো দিকিন। ইস্‌, অতো দামের মাছখান—'

বিনা আপত্তিতে বঁটির উপর নিজের দখল ছেড়ে দিলো তৃপ্তি এবং ছেড়ে দিয়ে বাঁচলো। এ'সব কাজে অভ্যাস নেই কোনদিনই। তা'ছাড়া ও'ভাবে পিঁড়িতে-বটিতে বসতে বেশ কষ্ট হয় আজকাল। বোধহয়, সে'দিকে ইঙ্গিত করেই প্রথম বারণ করেছিলো নিধুর-মা। বেশি কিছু বলতে সাহস পায় নি। তৃপ্তি জোর ক'রে বসেছিলো। বসে মাছটা নষ্ট করেছে। গামলায় ভিজিয়ে রাখা মাছ আর টুবুটুবু রক্তাক্ত জলের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি নিজের মনেই হাসলো। মজা লাগলো নিজের ছেলেমানুষিতে।

'ঘরে দু'কাপ চা করে দিয়ে এসো তো নিধুর-মা।' ঘরের কোণে নর্দমার ফুটোর কাছে হাত ধুতে ধুতে তৃপ্তি বললো।

'ভদ্দরলোক এয়েছেন, আমি যাব কেন—নিধুর-মা নতুন জলে কচলে কচলে মাছটা ধুচ্ছে তখন—'আমি করে দিচ্ছি তুমি যাও।'

'না, তুমি যাও। আমি যাব না।' পরিষ্কার হবার পরও দু'হাতের পাতা নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলে তৃপ্তি এবং তৃতীয়বারের জন্য সাবান নিলো। আশটে গন্ধে বমি আসে।

নিধুর-মা গিন্নির গলায় একটু শাসনের স্বর শুনে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, আস্তে আস্তে বললো—'এমন তো কখনও হয়নি মা।'

'আজ হবে।

নিধুর-মা নীরব।

ও'ঘরে লোকেন এসেছে। লোকেন যে অবশ্যই একজন ভদ্রলোক এবং অন্যান্য সব বন্ধু পরিচিতের মতোই অতিথি, নিধুর-মার সঙ্গে সে ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই তৃপ্তির। তবু লোকেন আলাদা মানুষ। এ কথাগুলো তৃপ্তি শুধু নিজে ভাবতে পারে, বোঝাতে পারে না নিধুর-মাকে।

রান্নাঘরের স্বল্প পরিসরে তৃপ্তি বিরক্তি বোধ করলো। অথচ তৃতীয় ঘর নেই। শোবার ঘরে কল্যাণ কথা বলছে লোকেনের সঙ্গে। নিশ্চয়ই জরুরি কথা। হয় তো অমিতের প্রসঙ্গে কিংবা লোকেনেরই কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন। নইলে ও-তো কোনদিন অনাহূত হয়ে আসে না এ'বাড়ি। দরজা খুলে দিয়েই চমকে উঠেছিলো তৃপ্তি। কিন্তু মুহূর্তের বিস্ময় মাত্র। পর মুহূর্তেই হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, কুশল জিজ্ঞাসার উত্তর নিয়েছে, বসতে দিয়েছে। তারপর কল্যাণ সব দায়িত্ব নেবার পর এসে আশ্রয় নিয়েছে রান্নাঘরে। কতদিন পরে কথা হলো লোকেনের সঙ্গে। তৃপ্তি চিন্তা করলো। ছাত্র জীবন পেরিয়ে আসার পর বোধ হয় এই প্রথম। অথচ একটা মানুষের প্রতি অকারণে রূঢ় ব্যবহার, অবিচার করা কি উচিত। ছেলেবেলায়, হ্যাঁ, ছেলে বেলাই তো বলবো তাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন পেরিয়ে আসার পাঁচ বছর পরে ছাত্রজীবনের স্মৃতিকে

ছেলেবেলা ছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারি। সেদিন যদি হঠাৎ ঝোঁকে, কাঁচা উচ্ছ্বাসে একটি ছেলে একটু দুর্বল হয়েই পড়ে আর অবিবেচকের মতো একটি মেয়ের কাছে বোকার মতো একটা প্রস্তাবই করে বসে, আজ এতদিন পরেও কি তাকে মনে রাখতে হবে। ছেলেমানুষি বলে হেসেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায়। লোকেনেরও নিশ্চয়ই মনে আছে সে কথা, এবং আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পুরোনো কথা ভেবে ও-ও নিশ্চয়ই লজ্জা পাবে, সঙ্কুচিত হবে। আর আমি যদি নিজে গিয়ে ওকে একটু সহজ হবার সুযোগ দিই তবে ও-ও নিশ্চয়ই খুশি হবে। কিন্তু—

ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে তৃপ্তি আবার থমকে দাঁড়ালো। সেজন্য নয়, অন্য কারণেই লোকেন আজ অসহ্য। ওই কাকের মুখে ঠুকরে ঠুকরে খাওয়া কাঁচা আমের মতো কদাকার জঘন্য ব্রণে ভরা মুখ আর ওই ঘোলাটে চোখ দু'টোর দিকে তাকালেই যেন আরও অনেক কথা মনে পড়ে যায়। সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই জাহান্নামে গেছে লোকটা। আর নোংরা কুৎসিত জঘন্য সব কথা শুনে শুনে ওর উপর একদিনের জন্যও শ্রদ্ধা আনতে পারেনি তৃপ্তি। কিন্তু মানুষ তো বদলায়। হয় তো লোকেন আর সে মানুষ নেই। নইলে কল্যাণ, অমিত, বিভাস, প্রেমাংশু সবাই ওর কাছেই যাবে কেন, আর ওরই আশ্রয় নেবে, ওকেই সহ্য করবে কেন। একটু দাঁড়িয়ে, নিধুর-মার হাতের কাজ দেখতে দেখতে একটু বুঝতে চেষ্টা করলো ও'ঘরে যাবে কিনা। কিন্তু মনে হলো, মানুষটাকে ক্ষমা করা অসম্ভব। উই-এ-কাটা পুরোনো দামি বই-এর মতো বাতিল হয়ে গেছে অমিত। এবং সেজন্য দায়ী এ'মানুষটা।

তৃপ্তি ফিরে দাঁড়ালো—'আমি একটু নীচে যাচ্ছি নিধুর-মা। সুন্দরীদির কাছে। বাবুর কাছে যে ভদ্রলোক এসেছেন, উনি চলে গেলে আমায় ডেকো।'

অনুমান মিথ্যে নয়। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কিছুই

শুনতে পেলো না, মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছিলো তৃপ্তি। শুতে যাবার আগে পর্যন্ত স্বামীকে গম্ভীর দেখে একটি অশুভ সঙ্কেত লক্ষ্য করেছে এবং প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করেছে, এবার কিছু বলবে কল্যাণ।

কলেজের 'প্রি-টেস্ট' পরীক্ষার খাতা দেখে তৃপ্তি যখন শুতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো, কল্যাণ স্তব্ধতা ভাঙ্গলো—'অমিতের কোন খবর জানো?'

'অমিত! কেন কি হয়েছে ওর?'

'নিখোঁজ।'

'নিখোঁজ মানে! কোথায় গেছে?'

'কোথায় গেছে, তাই যদি জানবো নিখোঁজ বলবো কেন? মাতৃভাষার মাষ্টারি করো, একটা সাধারণ শব্দের অর্থ শেখোনি।'

খুব একটা আমল দেবার মতো বিদ্রূপ মনে করলো না তৃপ্তি। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই স্বামীর দিকে তাকালো—'এজন্যেই বুঝি লোকেন এসেছিল?'

'হুঁ—'

'আর কি বললো?'

'অনেক কিছু।'

'শুনি না।'

'অতো কথা কি মনে আছে না কি ছাই নাও, বাতিটা নিভিয়ে দাও। ঘুম পেয়েছে।' বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে এবং দু'হাতের পাতা মাথার নীচে রেখে কল্যাণ একটা হাই তুললো। ঘুম যে সত্যি পেয়েছে তার প্রমাণ।

'ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। মানুষটা মরলো কি বেঁচে আছে জানতে ইচ্ছে করে।'

'মরেনি। মরলে খবর পেতাম।'

'কি ক'রে?'

'সংবাদ পত্রের আপিস যাবতীয় খবর পাবারই আপিস।'

'অমিত তো তেমন আমীর উজীর নয়।'

'পুলিসি সূত্রে খবর আসতো। 'আন্‌আইডেন্টিফাইড্‌ ডেড্‌বডির বিজ্ঞাপন দেয় পুলিস, জানো না ?' খুব নির্লিপ্তভঙ্গিতে কল্যাণ স্ত্রীর দিকে তাকালো।

'অন্তত সে'দিন আইডেন্টিফাই করার মতো দু'চার জন বন্ধু কি অমিত পাবে ?'

'যা কিছু বন্ধু অমিতই পেয়েছে তৃপ্তি। আমরা পাইনি।'

তৃপ্তি কল্যাণের দিকে তাকালো—'কি বলছো তুমি ?'

'অবাক হচ্ছো ?'

'নয় তো কি।'

'আমাদের পরিচিতের সংখ্যা অনেক। ট্রামে-বাসে রাস্তায় ডাকাডাকি করে বেড়াই। কিন্তু অমিত ওর বন্ধুদের নিষ্ঠুরভাবে পরখ করতে পেরেছে। একে একে নাক সিঁটকে ফিরে গেছে অনেকেই। শেষ পর্যন্ত যারা কাছে ছিলো, যারা ভালোবেসেছিলো তারাই তো খাঁটি বন্ধু।'

'মদের আড্ডায় অমন অনেক বন্ধু জোটে। নেশা কাটলে আর কেউ কাউকে চেনে না। সব দেখা আছে।' তৃপ্তি এবার সত্যি বিরক্তিতে সরে গেলো দেয়ালের দিকে। আলো নেভাবে।

'অমিতের জন্যে দুঃখ পাও, ক্ষতি নেই। কিন্তু লোকেনকে ভুল বুঝো না।'

হাত বাড়িয়েছিলো তৃপ্তি। থমকে দাঁড়ালো।

কল্যাণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলো। তাকিয়ে রইলো।

'লোকেনের প্রশংসা কি আমাকে শুনতেই হবে এখন ? অমিত সম্বন্ধে একটা দু সংবাদ জানালে একটু আগে।'

'অমিতকে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি। বোধ হয় পারিনি। কিন্তু লোকেনকে বুঝেছি। ওকে নিয়ে কথা বলাই 'সেফ্‌'।'

'কিন্তু শ্রোতার ধৈর্যের দিকে লক্ষ্য রেখো।'

কল্যাণ হাসলো—'বিরক্ত হচ্ছো ?

'খুশি হবার কারণ তো নেই। এমন কিছু প্রেমালাপ নয় যে না ঘুমিয়েও রাত ভোর করব।'

তৃপ্তি বাতিটা নিভিয়ে দিলো। নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করার অন্য কোন উপায় ছিলো না বলেই যেন সুইচটা টিপলো। অথচ কল্যাণের হাতে সিগারেটটা জ্বলছে এবং ঠোঁটে ধোঁয়া টানার মুহূর্তে একটু তীব্র হয়েই আবার মিইয়ে যাচ্ছে। সেটাকে লক্ষ্য করেই তৃপ্তি এগিয়ে এলো খাটের দিকে। বিছানার একপাশে বসে হাত রাখতেই কল্যাণের পায়ের পাতায় হাত পড়লো। যেন অকারণেই হাতটা সরিয়ে নিলো তৃপ্তি, হাতের সোনাটা আরও একবার কল্যাণের পায়ের পাতায় ঘসে গেলো।

'তোমার ধারণা, অমিতকে আমি সহ্য করতে পারি না। না ? আরও নির্মম সত্যকথা বলতে হলে হয় তো বলবে—ঘৃণা করি। তাই না ?'

যেন অন্ধকারের কাছেই জবানবন্দী দিচ্ছে এমনিভাবে কল্যাণ কথাগুলো আওড়ালো।

তৃপ্তি তখন খুব দ্রুতগতিতে কয়েকটি দিন আর কয়েকটি ঘটনার কথা ভেবে যাচ্ছিলো মনে মনে। সেই রোগা লম্বা বিশীর্ণ মানুষটা প্রায় সরেই গিয়েছিলো চোখের পর্দা থেকে। স্মৃতিতে আছে, সুযোগ পেলেই ডুব-সাতারুর মতো গলা উঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠে। ডুবতে ডুবতে তলানি থেকে লোকটা কিছু কাদামাটি তুলে আনে, চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। আর তখন সেই ঘোলাটে জলের মধ্যে মানুষটাকে ডুবে থাকতে দেখে কুৎসিত লাগে, দেখে কষ্ট হয়।

'কি হলো [illegible]সে রইলে যে, ঘুম পায়নি তোমার ?'

'উঃ—[illegible]াও নাড়া খেলো।

'শোবে না ?'

'হুঁ—তৃপ্তি হাত বাড়িয়ে পাশবালিশটাকে দু'জনের মাঝখানে রাখলো। তারপর কাতরাতে কাতরাতে গড়িয়ে পড়লো।

লোকেন চলে যাবার পর গোটা সন্ধ্যা আমি কি ভেবেছি জানো? জানি বিশ্বাস করবে না। তবু বলি, অমিতকে ভেবেছি। একটু কাজ ছিলো, বেরবো ভেবেছিলাম। বেরোই নি।'

'শ্মশানের ওপর চোখের জল না ফেলে জ্যান্ত অবস্থায় মানুষকে ভালোবাসতে শেখো।'

তৃপ্তির শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর কল্যাণকে স্পর্শ করলো। আন্তরিক উপলব্ধি থেকে কথা বললে কতো দার্শনিক স্তরে উঠতে পারে মানুষের ভাবনা। প্রায় গীতোক্ত মন্ত্রের মতো গম্ভীর আর গভীর কথাগুলি মনে মনে ভেবে কল্যাণ নীরব হলো। এতো সুন্দর করে কথা বলতে তৃপ্তিকে সে কখনও শোনেনি। অথচ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে তৃপ্তি কি ভাবছিলো, কল্যাণ তার খবর জানে না। অথচ অপরপক্ষের নৈঃশব্দ্য ওকে কিছুতেই এগিয়ে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না ওর ভাবনাকে অথবা যে-কথা বলতে চায় সে-কথা বলতে। কল্যাণ একমনে আরও কিছুক্ষণ সিগারেটের টুকরো আগুনটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলো, বার কয়েক ধোঁয়া টানলো এবং অপেক্ষা করলো অন্ধকার তার নীরবতা ভাঙ্গে কিনা। এবং যখন প্রায় সিদ্ধান্তে পৌঁছোলো, তৃপ্তি তার গোপনতার অন্তরালে কিছু ভাবছে কিংবা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, তখন নিজেই একটু নড়ে উঠলো, খুব নরম গলায় ডাকলো—'তৃপ্তি।'

'হুঁ—'

'ঘুমোও নি?'

'না।'

'একটা কথা শুনবে।'

'হুঁ—'

যেন একই খাটের পাশাপাশি শরীর ছুঁয়ে নয়, দূর থেকে, বহুদূর

থেকে কথা বলছে কল্যাণ। ক্লান্ত, জড়িত, কুণ্ঠিত স্বর—'তুমি আমায় অপরাধী বলবে?'

'কেন?'

'আমার একটা বউ আছে বলে।'

অন্ধকারের গভীরে আৎকে উঠলো তৃপ্তি।

ও'দিকের কণ্ঠস্বর আরও করুণ হলো, আরও আকুলতা পেলো—'আমি সংসারী, আমি দায়িত্ব মানি। বন্ধুদের কাছে একঘরে হয়ে আছি। ওরা সব ম'রে যাচ্ছে তৃপ্তি। আমি কষ্ট পাই কিন্তু আমাকেও তুমি ওভাবে মরতে বলবে? আমি তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা-বেদনা-হতাশা সব বুঝি কিন্তু আমার অবস্থাটা বোঝার মতো কেউ নেই। আমি যে অফিসে কাজ করি সেখান থেকে গোটা দেশটাকে, বলতে পারো গোটা পৃথিবীটাকে দেখা যায়। সেখান থেকে আমি কি দেখি জানো! আদর্শ বলো, ব্যক্তিত্ব বলো, মান-সম্মান-সম্ভ্রম বলো কোথাও কোন কিছুর দাম নেই। একটা জঘন্য কুৎসিত নোংরামি চলছে চারিদিকে আর তুমি-আমি তার মাঝখানে অসহায়। কি বলবো তোমাকে, ধরো, তোমার সন্তান হলো—তুমি জানো, আমি বিশ্বাস করি এ আমার। কিন্তু লোকে যদি বলে তোমার সন্তানের পিতা আমি নই। তুমি ভাবতে পারো, কি বিশ্রীভাবে একটা যন্ত্রণা সয়ে বাঁচতে হ'বে অথচ ভয়ঙ্কর মিথ্যেটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখবো আমাদের কথা কেউ শুনছে না। তৃপ্তি, আমি-আমিও ঠিক এমনি একটা অবস্থার মধ্যে আছি। আমাকে ভুল বোঝ ক্ষতি নেই, কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত নেবার আগে বোঝার চেষ্টা করো।'

শেষ টান না টেনেই কল্যাণ ওর সিগারেট ফেলে দেয়। তৃপ্তি চুপ ক'রে পড়ে থাকে। কল্যাণ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে। অন্ধকার যেন আরও অন্ধকার হয়, ওরা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ ক'রে কল্যাণ হাত বাড়ায় তৃপ্তির শরীরের দিকে। স্পর্শ পেয়ে

তৃপ্তি তু'হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নেয় সে-হাত। বুকে চাপে। আর কাঁপতে থাকে। এতো নির্মম আর এতো কঠোর কঠিন প্রশ্ন যে হ'তে পারে এবং সে-প্রশ্নের উত্তর যে কিছুতেই হয় না, হ'তে পারে না, বড় বেশি দাম দিয়ে আজ সে বুঝেছে ব'লেই শুধু নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে, নরম বুকের উপর স্বামীর হাত দলিত-মথিত ক'রে নিজের নগ্নতার কাছে নিয়ে যায়। শুধু আত্মসমর্পণ, শুধু আত্মনিবেদন ছাড়া স্বামীকে দেবার মতো অন্য কোন শব্দ, কোন বাক্য, কোন উত্তর আজ আর তার নেই। শুধু বিশ্বাস, শুধু আনুগত্যের অঙ্গীকার।

ত্রিশ

সারারাত যন্ত্রনায় এক ফোঁটা ঘুমোতে পারেনি অমিত। অথচ এখনও কি ভোর হয়নি কলকাতা সহরে! ভোরের আলো দেখতে হয় বাইরে গিয়ে। কিন্তু কাকের ডাক! অমিত কান পাতলো বাইরের দিকে।

আলো হয়ে আসার পরও অন্ধকার তার সাম্রাজ্য হারায় না। পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকার জড়ো হয় তার গোপন গুহায়। আলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটে। আলোর সঙ্গে শত্রুতা তার চির-কালের, চিরকাল স্থায়ী।

কথাগুলো ভাবতে পেরে অমিতের মনে হলো সে এখন সুস্থ আছে এবং নতুন ক'রে যন্ত্রণাটা বেড়ে ওঠার আগে এখনই, অন্তত যতোটুকু সময় পাওয়া যায় তার মধ্যে এখান থেকে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা সে স্থির ক'রে নেবে। একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলের চেয়েও কুৎসিত স্যাঁতসেঁতে গুমোট ঘর, হোটেলের দেয়ালগুলোর সঙ্গেও যতোটুকু আত্মীয়তা থাকে তার সিকি ভাগ বন্ধনও এখানে

নেই। অর্থাৎ যাব বললে 'চলে যাওয়াটা' কঠিন মোটেই নয়। পালানো যায় যে-কোন মুহূর্তে, এখনই, ঠিক এই মুহূর্তে—

কিন্তু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার আরামটুকু নষ্ট হবে ব'লে পাশ ফিরতে যার ভয় তাকে আরও একটু ভাবতে হয়। অমিত দুভাঁজ করা বালিশটা আরও একটা ভাঁজ করা যায় কিনা, মাথার নীচে বালিশ রেখেই সে চেষ্টা করলো এবং যতোটুকু শক্তি থাকলে এ-কাজটুকু সম্ভব সেটুকুও নেই বলে হাত ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো। এমন বিশ্রীভাবে বোকা-হাবা কচ্ছপের মতো চিৎ হয়ে পড়ে থাকা যে কি জঘন্য আর কতো বিরক্তিকর প্রতি সেকেণ্ডে সইতে সইতে মনে হলো—এবার সে পালাবে। পালাতেই হবে। শুধু মনে হওয়া নয়—সিদ্ধান্ত। সে মরিয়া হয়ে উঠে পড়তে চাইলো। কিন্তু মন থেকে যতোটা তেজ আর সাড়া পাওয়া গেলো শরীর ততোখানি সামর্থ্য দিলো না। বাধ্য করলো কাতরাতে-কাতরাতে নেতিয়ে পড়তে, মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লো তক্তপোশটার উপর। তক্তপোশটার অবস্থাও এতো সঙ্গীন যে এই ভারহীন শক্তিসামর্থ্যশূন্য রোগা মানুষটার ভারেও সে কঁকিয়ে ওঠে। করুণা নয়, অমিত বিরক্ত হলো ওর উপর। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে দু'হাতে পেট চেপে ধরে রুদ্ধ উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করতে লাগলো পেটের ভিতর সেই পচা গলিত লিভার আর নাড়ি-ভুড়ি গুলো আবার এক সঙ্গে চাগিয়ে ওঠে কিনা। নিজের শরীরের কাছেই অনুকম্পা ভিক্ষা করে মাথা মুড়ে রইলো। এবং অনেকক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থেকে যখন বুঝতে পারলো দেহ ওকে কিছুক্ষণের জন্যও করুণা করেছে তখন সন্তর্পণে কাত হয়ে, শরীর বাঁকিয়ে আবার চিৎ হলো এবং হাঁপাতে লাগলো। মুখ দিয়ে বাতাস নিয়ে পেটের হাপর টানলো আরও কিছুক্ষণ।

সামনে অন্ধকার। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে হাঁপাতে লাগলো, শুধু হাঁপাতে লাগলো আর ভেবে ভেবে ক্লান্ত হলো—যন্ত্রণার পরমায়ু কতো দীর্ঘ, কতো দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে। একবারের

জন্যও মনে হলো না এই কাতরানি আর গোঙানির শব্দে সেই বিরক্তিকর বুড়ো ডাক্তার আর তার বুড়ি ছুটে আসতে পারে। বুড়িটা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করবে আর বুড়োটা পাশে বসে এক নাগাড়ে ভগবানের দোহাই পাড়বে। খারাপ লাগে! হয়তো খারাপ কিছু বলে না ওরা। কিন্তু কেমন যেন সব কিছুতে গোলমাল পাকিয়ে দেয়। তখনই হাঁফ ধরে। কুৎসিত লাগে মানুষ গুলোকে।

আবার একটু একটু ক'বে নিজেকে গুটিয়ে এনে, শান্ত ক'রে অমিত একরাশ অন্ধকারের দিকে তাকালো! তারপর সবচেয়ে আগে যে কথাটা মনে পড়লো, তা মদ। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে এমন কুকুরের মতো পড়ে থাকা—কথাটা মনে হতেই আবার সমস্ত শরীরে, রক্তে, তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে উত্তেজনা বাড়ালো, ইচ্ছে হলো শরীরে আরও একবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে, মুখ থুবড়ে প'ড়ে, আবার উঠে, পায়ের কাছে যা পড়বে সজোরে লাথি মেরে দু'দিকে ছুঁড়ে ছুড়ে, দৌড়ে কিংবা টলতে টলতে যেমন ক'রে হোক এ-নরক থেকে বেরিয়ে যায়। এখানে থাকলে মরবো, কুৎসিতভাবে ইঁদুরের মতো মুখ থেত্‌লে মরবো। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে মনে হলো—শুধু মদের অভাবে এত যন্ত্রণা। যা খেলে এমন সব অসহ্য যন্ত্রণা অনায়াসে ভুলে থাকা যায়, তা না খেয়ে অকারণে এভাবে অমানুষিক কষ্ট পেয়ে লাভ? কোন লাভ নেই। টাইপ-গেরস্ত ঘরের আবহাওয়াকে আজকাল কেমন যেন প্যাচপ্যাচানি মনে হয়। এর চেয়ে অমিত যেন অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করলো—তার চেয়ে অনেক ভালো কোন গণিকার বহুব্যবহৃত শরীরে মাথা রেখে এবং নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে আনমনে নিজেরই শৈশবের কথা চিন্তা করা, যেখানে পাপ-নরক অন্ধকার কিছুই ছিলো না কিংবা সুযোগ পেলে যেখানে ফিরে গিয়ে নতুন করে জীবনটাকে সাজানো যেতো আবার। অথচ গড়াতে

গড়াতে যেখানে এসে পৌঁছেছি সে'খানে লিভারের পচুনি মেনে না নিয়ে উপায় নেই, এবং অন্য কোন পথ নেই জেনে, মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন গতি নেই ব'লে বলির-কাঠে মাথা রাখা পাঁঠার মতো জীবনের জন্য, বাঁচবার জন্য কাতরাবো! অসম্ভব। অমিত ভিতরে ভিতরে একটা দানবশক্তি নিয়ে ফেটে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো, কিঞ্চিত মাথা তুলতে গিয়ে আবার আছড়ে পড়লো বালিশে। যেন আততায়ীর কয়েকটি ছোরার আঘাতের পরও ওর আত্মরক্ষার প্রয়াস এবং আবার আঘাত। অমিত ছ'চোখ খুলে এক-গা ঘাম নিয়ে হাপাতে হাঁপাতে তার আততায়ীকে খুজলো। ঘরে শুধু অন্ধকার এবং সে একা।

ঘরের ভাঙ্গা কপাট ছুটো মড়মড় ক'রে শব্দ করতেই অমিত অনেক কষ্টে মাথা তুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু একরাশ অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তিকে চেনা যায়—সেই বিরক্তিকর বুড়ি।

'অমিত, বাবা—'

অমিত জানোয়ারের মতো ক্রুদ্ধচোখে তাকিয়ে রইলো। মৃদু হাতের চাপ পড়লো মাথায়—'কেমন আছিস বাবা।'

অন্ধকারে ভুল জায়গায় পা ফেললেন ডাক্তার গিন্নি। খোঁচা-খাওয়া কুকুরের মতো চেঁচিয়ে উঠলো অমিত— 'এসেছেন? বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে। কে বলেছে আপনাদের দয়া দেখাতে, কেন বেধে রেখেছেন আমাকে। বেরোন, বেরোন বলছি। কোথায় ডাক্তার, ডাকুন, ডাকুন—'

সহজ মেয়েছেলে! অকৃতজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় হয়তো কম, কিংবা একেবারেই নেই। সহসা ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেন একটু। হতচকিত ভাব সামলে মুখ খুলতে সময় লাগলো আরও একটু— 'তুই, তুই কি বলছিস বাবা, তোর যে অসুখ।'

'অসুখ! আমার অসুখ আপনার কি? আ-প-নার কি-ই-ই--' গলার রগ-ছেঁড়া মর্মান্তিক চিৎকার করে ফেটে পড়লো অমিত — 'অসুস্থ মানুষকে বেঁধে রাখার জন্যে এই ঘর? বলি, এটা কি?

এটা কি মর্গ না জ্যান্ত মানুষের ঘর। আমি কে? আমি কি মানুষের বাচ্চা না শূয়োর।'

'আমাদের তো এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা নেই বাবা।'

'নেই তো দয়া করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছেন কেন। ছেড়ে দিন না এ'বার।

তক্তপোশ থেকে স'রে গিয়ে দূরে দাঁড়ালেন ডাক্তার-গিন্নি। কাল রাতেও পেটের যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে যে-মানুষটা ছটফট আর দাপাদাপি করেছে, প্রলাপ বকেছে এবং সারারাত ধরে শিয়রে জেগে থেকে যে ছেলেটাকে একটু ঘুম পাড়িয়েছেন এখন তার মুখে এমন কুৎসিত ভাষা আর কর্কশ চিৎকার শুনে তিনি আতঙ্কিত হলেন। ছেলেটা পাগল হলো না তো। পেটের যন্ত্রণায় মানুষ নাকি পাগল হয়। ডাক্তারের অষুধ তো দূরের কথা, তুক-তাক মন্ত্র আর কবচ-মাদুলিতেও নাকি সে-রোগ সারে না। মনে পড়লো কোথায় যেন শুনেছেন তিনি। দূরে দাঁড়িয়ে কিছুটা ভয়ে এবং কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে ভাবতে লাগলেন। রাগ ক'রে লাভ নেই, হাজার হোক বাপ-মা মরা ছেলে, তাতে অসুখ। সুস্থ হ'লে কি এমন নেমকহারামি করতো।

বাইরে বিষ্ণুরাম ঘোষের গলার স্বর শুনে যেন আবার প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নেবার সাহস পেলেন ডাক্তার-গিন্নি। ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন। নতুন উপসর্গ! স্নায়ুবিকার। নিউরোটিক কমপ্লেম। রোগী যেন ক্রমশই তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে কিংবা বড়ো ডাক্তারেরা যে কতো অনায়াসে কতো দুরূহ সব অসুখ নিয়ে হামেশা নাড়াচাড়া করে, এবং মানুষকে আরোগ্য দিতে কতো অসাধ্য সাধন করে আর তিনি যে কতো নির্বোধ - সে'টা বুঝিয়ে দেবার জন্যই যেন ষড়যন্ত্র ক'রে অমিত তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোগের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। ভয়ে ভয়ে এগোলেন ডাক্তার। যথেষ্ট

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কোমল গলায় ডাকলেন—'অমিত, বাবা।'

'কে ডাক্তার ?' অস্বাভাবিক শান্ত অমিতের কণ্ঠস্বর।

বিষ্ণুরাম ঘোষ একটু সাহস পেয়ে এগিয়ে এলেন আরও দু'পা—'হ্যাঁ বাবা, কিছু বলবি ?

'ডাক্তারি কিছু শিখেছেন ?'

'বাবা—'

'বলছি ডাক্তারির বিদ্যে কতোটুকু জানা আছে।'

মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণগুলো লক্ষ্য করার জন্য বিষ্ণুরাম ঘোষ উদগ্রীব হলেন। একবার ইচ্ছে হলো, আলো জেলে রোগীর মুখ দেখেন কিন্তু সাহস পেলেন না।

'মরফিয়ার নাম শুনেছো ডাক্তার—'অমিত যেন দম আটকে এক ঝলক যন্ত্রণাকে সামলাবার চেষ্টা করলো।

'মরফিয়া, মর···ফি···য়া, কেন—'বিষ্ণুরাম ঘোষ ঝুঁকে ছিলেন, মাথা তুললেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ একটা মরফিয়ার ইঞ্জেকশন দাও। দাও এক্ষুণি—নইলে, নইলে আজই তোমাদের ঘরে নিজের গলা নিজে টিপে মরবো। লোকে বলবে তামরা মেরেছো। তোমরা বুড়ো-বুড়ি। পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে। যা বলি করো ডাক্তার, উঃ,—

ততক্ষণ বাকশক্তি হারিয়েছেন বিষ্ণুরাম ঘোষ। ও'দিকে একটা আর্তনাদ উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে ছুটে বেরোবার শব্দ। ডাক্তার-গিন্নি লোক ডাকতে নীচে গেলেন। কবচ-মাদুলিতে সারে না এমন কঠিন রোগ, তার স্বামী সারাবেন কি ক'রে। ভূত ভর করেছে মানুষটাকে। নইলে অলক্ষ্মী ঢুকবে। পথ থেকে কি আপদই না কুড়িয়ে এনেছেন তার ভালোমানুষ স্বামী।

'ডাক্তার শুনছো ? যাও—তোমার ওই ঠাকুরের কাছ থেকে, ওই

যে তোমাদের ওই বুড়োটা, ওর কাছ থেকে ছ'পাইট নিয়ে এসো এক্ষুণি, আর একটা মরফিয়া—যাও, যাও বলছি—'

'এসব, গিলবি! এখন! এই অসুখে!

'ও'সব গিলবো না তো তোমার ওই ছাইপাশ অষুধ গিলবো!' অমিত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

ক্ষ্যাপা মানুষকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বড় বেশি সাহস পেলেন না ডাক্তার। অমিত তখন তার কাছে একটি ঘোরতর সমস্যা। চালচুলোহীন একটা অচেনা মানুষকে আশ্রয় দিয়ে এই বিপদ! মানুষ এতো শঠ হ'তে পারে? এমন বে-আক্কেল। বিষ্ণুরাম ঘোষ মনে মনে কপাল চাপড়ালেন এবং ভাবতে লাগলেন—কি করবেন। ক্ষমতা বা বিদ্যে-বুদ্ধি কিছুই নেই যে নিজে চিকিৎসা করবেন, টাকা নেই যে ভাল ডাক্তার ডাকবেন। পরের ছেলেকে আপন ক'রে ভালোবাসার বিপদ এতো ভয়ঙ্কর হ'তে পারে? নিজেকে অসহায় বোধ করলেন তিনি।

আধো-অন্ধকারে রোগীর পাশে বসে থেকে কেমন একটু বিপন্ন বোধ করলেন ডাক্তার। আলো জ্বালবেন কিনা ভাবলেম, আবার ভয় পেলেন, বেরিয়ে যাবেন কিনা চিন্তা করলেন, লোকটা তা'হলে কুকুরের মতো চিৎকার করবে, চুপ ক'রেই রইলেন। শুধু রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে চুপ ক'রে বসে থেকে রক্ষাকালীর সিঁদুর মাখা পায়ের ছবিটা চোখের উপর স্পষ্ট করতে চাইলেন। শুধু এ'বার, এই ঘোরতর সর্বনাশ থেকে ভগবান তাকে রক্ষা করুন।

'ডাক্তার'—

বিষ্ণুরাম ঘোষ চমকে উঠে ঝুঁকে পড়লেন—'কিছু বলবে বাবা?'

'একটা রিকশ ডাকো আর দুটো টাকা দাও আমাকে।'

'কোথায় যাবি?'

'রাস্তায়।'

'এই শরীরে!'

'যা বলি করো ডাক্তার। নইলে- ' সমস্ত শরীরে মোচড় দিয়ে কাতরাতে কাতরাতে কোনমতে উঠতে চাইলো অমিত এবং বিষ্ণুরাম ঘোষ ওকে সাহায্য করলেন উঠে বসতে।

ডাক্তার দু'পা এগিয়ে খোলা-জানালায় বাইরের আলো দেখে এলেন। বেলা হয়েছে। বেরোতে হবে তাকে। কিন্তু এমন একটা দস্যি আর বে-আক্কেলে মানুষকে ঘরে রেখে কি ক'রেই বা যাবেন।

'ডাক্তার -- '

'কি বলবি বাবা—'

'আমাকে ধরো।'

'বাইরে যাবি।'

'হ্যাঁ।'

'বাইরে কোথায় যাবি ?'

'আঃ, ধরোই না ছাই। কতো জ্বালাবে তোমরা।' একদলা চিরতার জল গলায় ঢেলে যেন চিৎকার করলো অমিত।

ধমক খেয়ে ছুটে এলেন ডাক্তার। সত্যি উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য রুগ্ন-ক্লিষ্ট একটি যুবকের কঙ্কাল শরীরের চাপ বইতে গিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় পীড়িত বৃদ্ধের দেহ নুয়ে পড়লো ভারে। তবু রুদ্ধশ্বাস, গুমোট ঘরের অন্ধকার ডিঙিয়ে একটু আলোর জন্য চৌকাঠের দিকে এগোলো দু'জন। তক্তপোষ থেকে দরজা—কয়েকটি পদক্ষেপ মাত্র, কিন্তু এ'টুকুতেই বিষ্ণুরাম ঘোষ ঘেমে নেয়ে হাঁপিয়ে উঠলেন। অতিথি-মানুষটিকে তখন তার নির্মম মনে হলো, হৃদয়হীন। তার এতো দুঃখের যন্ত্রণার এক কণাও যদি লোকটা অনুভব করতো, যদি একটু করুণা করতো তবে মুক্তি পেতেন তিনি। একটা ছেলেকে ভালোবাসার, একটি জীবনকে জড়িয়ে থাকার সুযোগ পেতেন।

ভিতরের বারান্দায় ছোট একটা রোদের ত্রিভূজ এসে পড়েছে। একটা চড়ুই থেকে কিছুটা বড়ো একটা শালিকের চেয়ে ছোট একটু

রোদ। কোত্থেকে এলো? হয়তো পাশের তিনতলা বাড়ির ছাদের রেলিং ভেদ ক'রে। অমিতের নেশা লাগলো। কতোদিন পরে আলো দেখেছে। তাজা আলো। একহাতে দেয়াল-দরজা হাতড়ে অন্যহাতে ডাক্তারের কাঁধে ভর ক'রে আরও জোরে পা বাড়াতে চাইলো। কিন্তু এর পরিণাম নির্মম হলো ডাক্তারের উপর। বৃদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিলেন একবার।

'আপনাদের খুব কষ্ট দিচ্ছি, না ডাক্তাব?'

বিষ্ণুরাম ঘোষ চমকে তাকালেন। উদ্ভট, জটিল মানুষ, আপনি-তুমির জ্ঞান পর্যন্ত নেই। মানুষটাব ডাকে কুঁজো হয়েও হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে হাসতে চাইলেন—'না বাবা, কষ্ট? কষ্ট কি আব এমন। তুই ভালো একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নে। তারপর—

'ডাক্তার কাল কোথায় যেন মড়া-কান্না শুনলাম মনে হলো। আপনারাও কাঁদলেন।'

'কই না তো, আমি না, তোর মাসি কেঁদেছে—'বিষ্ণুরাম ঘোষ কঁকিয়ে ককিয়ে অনেক কষ্টে বললেন—নীচের তলার সেই যে ছেলেটা– হরিশ মরে গেছে। বৌটা কাঁদছিলো, আহা কচি মেয়েটা দেড় বছরও বে হয়নি রে, আর এরই মধ্যে—কপাল বাবা, কপাল। সবই ভগবানের লীলা।'

'ডাক্তার?'

'হুঁ—'

'কাঁদছেন?'

'কই না তো।'

'লুকোবে না ডাক্তার, লুকোবে না। সব বুঝি মানুষকে অতো বোকার মতো ভালোবেসোনা ডাক্তার। বড়ো কষ্ট, মিছিমিছি কষ্ট পাবে।' অমিত সেই একফোটা আলোর সামনে এসে রেলিং-এ আছড়ে পড়লো এবং ন্যাড়া-কুকুরের মতো হাপাতে লাগলো

ডাক্তার।' রেহাই পেয়ে বিষ্ণুরাম ঘোষও একটু আরামের নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। বড়োবাবুর ডাকে আর্দালির আৎকে ওঠার মতোই ব্যস্ত হয়ে ফিরে তাকালেন– 'কিছু বলবে বাবা।'

'আমাকে দিয়ে আসুন।'

'কোথায়।'

'বাইরে।'

'বাইরে?'

'রাস্তায়– '

'সে কি বাবা, তুই যে অসুস্থ।'

'আমি সুস্থ হবো না ডাক্তার। যা বলি করো। ভয় নেই, চাও তো সন্ধ্যেবেলা আবার ফিরে আসবো।'

'না বাবা, রাস্তায় গেলেই তুই আবার সব ছাইপাশ গিলবি কু-জায়গায় যাবি—' যেন মন্ত্রণা দিচ্ছেন, এমনি ভঙ্গিতে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন, তোর মাসিকে বলিনিরে, তোর এমন চরিত্রির খারাপ। জানলে কষ্ট পাবে।'

অমিত হাসতে চাইলো। কিন্তু ঠিক তখনই চার পাশের দেয়াল, কড়িকাঠ-বরগা, বিষ্ণুরাম ঘোষ প্রচণ্ডভাবে দোল খেয়ে উঠলো। একটু একটু ক'রে চিনচিন করছিলো পেটের ডানদিক, হঠাৎ নাড়া দিয়ে উঠলো। দাঁত-মুখ খিচিয়ে বাঁ হাতে পেটটা চেপে ধ'রে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রেলিং-এ। আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়লো নীচে। কাতর গলায় শুধু বলতে চেষ্টা করলে 'ডা···ক্তার—'

বিমূঢ় ডাক্তার রোগীকে জড়িয়ে ধ'রে আর্তনাদে ফেটে পড়লেন। চীৎকারে ছুটে এলেন ডাক্তার-গিন্নি, হুড়মুড় ক'রে উঠে এলো নীচের তলার মানুষ।

অমিত কাতরাচ্ছে। এ'পাশ-ও'পাশ ক'রে, দাপাদাপি ক'রে গোঙাতে গোঙাতে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এলো। এবং ব্যস্ত হয়ে জল নিয়ে এলেন ডাক্তার-গিন্নি, হাতের কব্জি ধ'রে নাড়ি

খুঁজলেন বিষ্ণুরাম ঘোষ। আর ভিড়ের মানুষগুলো দাঁড়িয়ে রইলো যন্ত্রণা দেখলো শুধু। যেমন কলকাতার রাস্তায় মৃগী রোগীর মুখে ফেনা দেখে ভিড় করে হাজার মানুষ। ভুলে যায়—কি করতে হবে, কি করা উচিত। ভুলে যায়--মানুষের যন্ত্রণায় মানুষকে দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পাওয়া উচিত।

শুধু ডাক্তার-গিন্নি অসুস্থ মানুষটার মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে ঘটি ঘটি জল ঢেলে নিজেকে ভেজালেন, চোখের জলে ভিতরটাও ভিজলো। আর বিষ্ণুরাম ঘোষ, নিজে ডাক্তার হয়েও রোগীর পাশে বসে, কোন জটিল অঙ্কের উত্তর মেলাতে না পারা বালকের মতো অসহায় হতবুদ্ধি হয়ে করুণভাবে তাকিয়ে রইলেন। ঘন, গভীর, বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বগতোক্তির মতোই উচ্চারণ করলেন—'গিরীশটা মরলো, আর এই বয়সে এমন একটা ছেলে, এম-এ পাশ—কি না করতে পারতো এই জীবনে। উঃ—কিন্তু মরবে, এই দেখ না ক'দিন আর? মরলো ব'লে। সব ভগবানের হাত, বুঝলি না, সবই তিনি। কি যে তার লীলা, বুঝি না। সবই কপাল, অদ্দেষ্ট—'।

বিষ্ণুরাম ঘোষ সজোরে কপাল চাপড়ালেন। আর অমিত কাঁপতে কাঁপতে, গোঙাতে গোঙাতে ক্লান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে এলো।

কে যেন বললো ভিড়ের মধ্যে—'হাসপাতাল।'

একত্রিশ

পাঁচমিশেলি হাসির ছোটো একটা ঝড় হঠাৎ ফেটে পড়েই ঘরের বাতাসে কাঁপতে লাগলো। গমকে গমকে সে হাসি উদ্দাম হলো। হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের দিকে তাকালো, হাসির মাত্রা হারালো সবাই। এক সময় রেশ কমে এলে কল্যাণ হাসির তোড়েই নিজের মনে বললো 'উঃ আজকাল ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে এমন। কথা বলে কার সাধ্য।'

তৃপ্তি হাসতে হাসতে কাশতে সুরু করেছে। কোন মতে সামলে, আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে ওদের দিকে তাকালো—'তারপর শান্তা, তুমি কি বললে?'

'কি আবার বলবো। যা বলেছি ওতেই সব চুপ।' শান্তা আঁচল টেনে কপালে ঘসলো। শূন্য চেয়ার থাকতে ঝকঝকে মেঝের উপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিলো ঝণ্টু। বৌদির পা ছুঁয়ে মাথা। হঠাৎ কনুই এ ভর দিয়ে শরীরে মোচড় দিলো—'বাঃ, বৌদি তুমি তো বেশ। হাসতে হাসতে যে আসল কথাই ভুলে গেলে। চা!'

'এই তো যাচ্ছি ভাই-' খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিলো তৃপ্তির। একটু উঠে দাঁড়াতে পেরে স্বস্তি পেলো। হাসতে হাসতে বললো—'শান্তার স্মার্টনেসের পরিচয় পেলাম বটে। ওকে নিয়ে চলো কি ক'রে ঝণ্ট। ও যে তোমাকে চড়িয়ে বেড়াবে।'

একটা যুতসই উত্তর বোধ হয় কোনমতে সামলে নিলো ঝণ্টু। নেহাতই কল্যাণের অস্তিত্বের কথা ভেবে মুখ ফেরাতে হলো। শান্তা কি করবে ভেবে না পেয়ে অকারণেই হাতের ছোট রুমালে মুখ মুছলো একবার। কল্যাণ সিগারেট্ ধরাবার আগে তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে মৃদু হাসলো।

খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু হাসবার জন্য মনটা যখন পুরোপুরি তৈরি থাকে যতো সামান্যই হোক সেটা ব্যাপক হয়। পরিহাসে তরল আবহাওয়ায় যে কোন রসিকতাই তখন উল্লসিত করে। তৃপ্তি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শান্তা বললো—'কল্যাণদা, আপনাদের জার্নালিস্টদের কাজ বুঝি খুব কঠিন।'

অ্যাসট্রের গলায় সিগারেট ঝুলিয়ে অন্যমনস্কভাবে ছাই ফেলছিলো কল্যাণ। প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকালো—'মোটেই না। একেবারে জলবৎ··· ।

'তবে মেয়েরা 'জানালিস্ট' হয় না কেন?'

'সেটা একটা প্রশ্ন বটে—'কল্যাণ শান্তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকে হাসলো—'তা তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো।'

'দেখবই তো। দেবেন একটা চাকরি।'

'কি করবে।'

'এ···ই নেহরু-ক্রুশ্চেভ-কেনেডি-জনসন-রাশিয়া-আমেরিকা-আণবিক বোমা-মহাকাশে নতুন উপগ্রহ-ভারত সরকার-পশ্চিমবঙ্গ সরকার, খাদ্যমন্ত্রী-রেলমন্ত্রী এই সব লিখবো।'

'বাঃ তাহ'লেই বুঝি খবরের কাগজ হু হু করে কাটবে।'

'নয় তো কি। আপনারা তো বসে বসে তাই করেন।'

'দূর, তোমাদের নিজেদেরই ঠিক নেই।'

'কেনো।'

'তুমি তামাম দুনিয়ার মেয়েদের হয়ে বলছো জার্নালিস্ট হবে আর তোমাদের বৌদি বলেন খবরের কাগজ পড়া নাকি মেয়েদের সময় নষ্ট।'

শান্তা উল্লসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো—'তাই নাকি! বৌদি বলেন নাকি এ'কথা।'

'জিজ্ঞেস করো।'

'তা একরকম ঠিকই তো বলেছেন—শান্তা হঠাৎ কৃত্রিমভাবে

গম্ভীর হলো—' খবরের কাগজ, রেলের টাইম-টেবিল, ফোন গাইড পড়ার ধৈর্য্য বা সময় মেয়েদের নেই।

'বাঃ, তোমাদের 'টিম-স্পিরিট' তো বেশ ভালো। বেশ, বেশ— কল্যাণ শব্দ ক'রেই হাসলো।

মেঝেতে শুয়ে থেকে ঝণ্টুও সে হাসিতে যোগ দিলো। আড়মোড়া ভেঙ্গে পাশ ফিরে শুলো আরও একবার—শেজদা, তোমাদের ওই পত্রিকাটা কারা পড়ে?'

'কেন, তোরা।'

'আমরা! হুঁ, আমরা পড়ি বটে তবে কেন জানো? দেশটা যে কতোদূর উচ্ছন্নে গেছে তোমাদের কাগজটা আমাদের কাছে তার একটা 'ব্যারোমিটার।'

কল্যাণ গম্ভীর, ঝণ্টু লক্ষ্য করলো। শেজদাকে ভয় করে না ঝণ্টু, সমীহ করে।

'আমাদের কাগজের সার্কুলেশন কতো জানিস?' কল্যাণ শাস্তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সিগারেটে ধোঁয়া টানলো—'সরকারী লাষ্ট রিপোর্টে--'

'থাক্ থাক্ জানি আশি হাজার, নব্বই হাজার, এক লাখ—'

'তবে?'

'তাতে কি। বাংলাদেশে পত্রিকা পড়ে এমন এক শ' জনের মধ্যে ষাট জন ইংরেজি জানে না। ওতে কি প্রমাণ হয়।'

'তোর কথাতেই বা কি প্রমাণ হচ্ছে। ইংরেজি ভাষায় লিখলেই কাগজ ভালো হয়ে যায়?'

'না তা হবে কেন। তবে ওগুলোর তবু বরং একটু চোখলজ্জা আছে, কিন্তু তোমাদের কথা আর বলো না। ইলেক্সানের আগে এক চেহারা, পরে আর এক, কোথাও শ্রমিকরা, ছাত্ররা ধর্মঘট করলে ফলাও ক'রে ছাপবে, আর মালিকরা 'লক-আউট' করলে বেমালুম চেপে যাবে, রুশ-গভর্ণমেণ্ট ভালো কিন্তু রাশিয়ার কম্যুনিষ্টগুলো

বজ্জাত, রাশিয়ার হাইড্রোজেন, অ্যাটম বোমায় পৃথিবীর বাতাস পচে গেল। আর ক্যাপিটেলিস্টদের বোমায় দুনিয়া পবিত্র—কি যে তোমরা লেখো আর লেখো না নিজেরাই জানো না।'

সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে কল্যাণ জমাট ধোঁয়া ছাড়লো। শান্তা দেখলো, আস্তে আস্তে কল্যাণদা গম্ভীর হয়ে উঠছেন, কিছু ভাবছেন। ঝন্টুর দৃষ্টি টানতে চাইলো। কিন্তু ঝন্টু মেঝের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ। হঠাৎ তরল গলায় শান্তা বললো—'কল্যাণদা রাগ করেছেন?'

'কেন?'

'এই প্রসূন একেবারে যা নয় তাই বলে যাচ্ছে। ওকে ধমকে দিন। আমি কিন্তু ছেলেবেলায় আমার স্কুলকে কেউ কিছু বললে ভীষণ রেগে যেতাম। মেরেই বসতাম একেবারে।'

কল্যাণ হাসতে চাইলো কিন্তু বড়ো শুকনো লাগলো সে হাসি—'কারণ স্কুলটা সত্যি তোমার কিংবা ধরো তোমাদের। কিন্তু কাগজটা আমি যেখানে কাজ করি সেটা? আমরা শুধু রোটারি মেসিনটা চালু রাখি শান্তা, কাগজ চালায় মালিকরা।'

'আপনার কষ্ট হয় না কল্যাণদা—' ঠাট্টা-পরিহাসের হাল্‌কা আমেজ কাটিয়ে ছাত্র-আন্দোলনে অভিজ্ঞ মেয়েটি হঠাৎ যেন একটু তার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে চাইলো—'আপনি যা জানেন না, বিশ্বাস করেন না, তাই দিনের পর দিন শুনতে হচ্ছে লিখতে হচ্ছে।'

'তারও চেয়ে বড়ো দুঃখ আছে শান্তা। পাশ করো, চাকরি-বাকরি করো তখন বুঝবে। এখন বুঝবে না—' কল্যাণ নিঃশব্দে আরও একটু সিগারেটের ধোঁয়া টেনে নিয়ে মলিন হাসলো—'আগের দিনে ক্রীতদাসরা শরীরের ঘাম বিকিয়ে জীবনটা নষ্ট করতো, আমরা বিশ্বাস বিকোই, অস্তিত্ব বিকোই। সে একই কথা—দাসত্ব। তফাৎ শুধু এই, ওরা পিঠে চাবুক খেতো, আমরা বিবেকে মার খাই।'

'আপনি কলেজে চেষ্টা করেন না কেন?'

'মাস্টারি। জানি তোমরা সবাই ওই স্বপ্ন দেখো। তাই না? কিন্তু

ওটাই কি খুব ভালো চাকরি? তোমার বৌদির কাছে, বন্ধু-বান্ধবের মুখে এটা-ওটা নিয়ে হাজার অভিযোগ শুনতে শুনতে ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলাম।'

'তবে ওই কাজই করবেন?'

'একদিক থেকে আমি ভাগ্যবান, বোঝ না? আমার যা 'অ্যামবিশান' ঠিক সেখানে এসে পৌঁছেছি। তবে যা চেয়েছিলাম তা পাইনি। সাংবাদিক হতে চেয়েছিলাম খবরের কাগজের অফিসে চাকরি পেয়েছি। স্বাধীনতা পাইনি। পাবও না। যে সমাজে যে যুগে আছি তাতে কোনদিন পাবও না, কোথাও পাব না।'

'আপনি এমনভাবে বলেন, কল্যাণদা ভয় হয় সত্যি।'

'ভয়! ভয় কেন? একেবারে ছেলেমানুষ—'কল্যাণ হাসতে হাসতে শান্তার দিকে তাকালো—'তবে সাবধান থেকো। নিজের জীবিকা সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কতোগুলো ধারণা সাজিয়ে রেখো না তা হলেই ডুববে। যে সময়ে জন্মেছ তা'তে চাকরি মানে স্রেফ চাকরি। চাকরিও করবে আবার খুশিমতো কাজও করবে, জীবিকার সঙ্গে জীবনকে মেলাবে ওসব করেছ কি গেছো। দেখবে কপালে অশেষ দুঃখ। তবে এরই মধ্যে যেটুকু পারা যায় চেষ্টা করতে হবে বৈকি। চারদিকে অসৎ আর কুৎসিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে বলে কি আমিও হাত গুটিয়ে বসে থাকবো সেটাও তো কাজের কথা নয়।'

'যাক গে, সে এখনও বছর খানেক পরের কথা। আগে পরীক্ষা তো দিই-'শান্তা হঠাৎ খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—'আপনারা দু-ভাইয়ে কথা বলুন। আমি দেখি রান্নাঘরে বৌদি একা একা কি করছেন। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ সিরিআস কথা শুনলে এমনি মাথা ধরে।'

শান্তার কথায়, বিশেষত ওর বলার ভঙ্গীতে কল্যাণ আবার হাসলো। কিন্তু ওর অবর্তমানে দু'ভাইএর আলোচনা আর জমলো না। কল্যাণ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো ওর কাগজপত্র নিয়ে। আর ঝন্ট

মেঝেতে সটান হয়ে শুয়ে সিলিংএর দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন কড়ি-বরগায়ও নিসর্গ আছে।

অনেক পরে তৃপ্তি আর শান্তা হাতে চায়ের কাপ আর জলখাবার নিয়ে ঢুকলো। সঙ্গে নিধুর-মা। ঘরে ঢুকেই ধমকে উঠলো তৃপ্তি—'তুমি কি করছো বলো তো ঝণ্টু। তখন থেকে মাটিতে পড়ে আছো। কেন' এ'বাড়িতে কী শোবার-বসবার জায়গা-টায়গা নেই?'

'এই তো দিব্যি আছি। দাও, দাও, কি এনেছো দাও দেখি—' এক ঝটকায় মেঝেতে উঠে বসলো ঝণ্টু।

'এখানে? না, উঠে বসো।'

'কেন কি হয়েছে এখানে।'

'ধুলো যে।

'ধ্যেৎ, রেখে দাও তোমার ধুলো। এ'খানে লঘুজন তো কেউ নেই। গুরুজনদের পায়ের ধুলোয় লুটোপুটি খেলে কিছু হয় না। পুণ্যি হয়। কই দাও—' তারপর আর প্লেটটা এগিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না ঝণ্টু। এক লাফে উঠে এসে বৌদির হাত থেকে লুচির প্লেটটা কেড়ে নিয়ে থাবা মেরে একটা আস্ত লুচি মুখে পুরলো। ও'দিকে অতি সযত্নে, প্রায় নিবেদনের ভঙ্গীতে সুচারুভাবে শান্তা লুচির প্লেট আর চায়ের কাপ সাজিয়ে রাখলো কল্যাণের টেবিলে। তৃপ্তি সেখানে হাতের কাপটা রেখে বললো—'ঝণ্টু, তোমার চা রইলো কিন্তু এখানে।'

ওরা চলে যাবার পরও অনেক সময় ছিলো। অন্তত খাওয়া-দাওয়ার আগে পর্যন্ত রাতটাকে স্বীকার করতে কেমন যেন কষ্ট হয়। আলো জ্বেলে বসে থাকলেও সন্ধ্যার ঘোর কাটে না।

টেবিলে কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলো কল্যাণ। রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ সেরে ঘরে ঢুকেই তৃপ্তি মৃদুস্বরে রেডিওটা বাজিয়েছিলো। টেবিলে টেবিল-বাতিটা জ্বেলে সারাঘরে অন্ধকার ছড়িয়ে রাখলো।

এইভাবে আবছা অন্ধকারে চুপচাপ থাকতে ভালো লাগে। নিজেকে বেশ একটু আলাদা রাখা যায়।

'ওরা ছুটিতে কিন্তু মিলেছে ভালো। বেশ লাগে।'

কল্যাণ কি কতোগুলো টাইপকরা কাগজ পড়ছিলো। পাতা উল্টে স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই বললো—'মেলেনি মিলতে চলেছে।'

'ওই, ওই হলেই হলো। 'কজ্' তৈরি হচ্ছে, 'এফেক্ট' হবেই।' তৃপ্তি হাসতে হাসতে কল্যাণের সামনে চেয়ারে এসে বসলো।

টেবিল-বাতির আলোটা তৃপ্তির মুখের উপর পড়েছে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

কল্যাণ একবার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিতে পারলো না হঠাৎ।

'একটা ইজি-চেয়ার কিনবে তো, নইলে বেতের বড়ো চেয়ার।'

'কেন, এ'চেয়ারগুলো কি দোষ করলো।'

'হুঃ, ভাল লাগে না।'

'খাট আছে, শুয়ে থাকো।'

'সারাক্ষণ শুয়ে থাকা যায়?'

'বসে থাকো।'

'যতো বাজে কথা। বলছি একটা ইজি-চেয়ার কিনতে হবে। কিনবে। না পারো তো বলো, আমি নিধুর-মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কিনে আনবো।'

'হুঁ, শাস্তার কথা কি বলছিলে।' কল্যাণ আবার ওর কাজের দিকে মন দিলো।

'হাসছো কেন?'

'হাসছি, হাসি পেলো তাই—' মৃদু হাসিটা এবার কল্যাণের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

'অকারণে হাসি পেলো?'

'আচ্ছা, তোমাকে হঠাৎ এতো সুন্দর লাগছে কেনো বলতো। ক'দিন ধরেই লক্ষ করছি ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'কুৎসিত ছিলাম কবে।' তৃপ্তিও হাসলো।

'না, তা ছিলে না। তবে—' কল্যাণ আবার চোখ তুলে তাকালো।

'দেখো, এভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থেকো না। শেষে নিজেই লজ্জা পাবে।' তৃপ্তি উচ্ছ্বাস চেপে কৃত্রিম বিরক্তিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে বসলো। বোঝা যায়, কাঠের চেয়ারে সত্যি ওর অসুবিধা। হাটুতে হাতের ভর রেখে দাঁড়াতে হয়—'বয়স তো ঢের হয়েছে। এই বুড়ো বয়সে ন্যাকামি কেন?'

'বুড়ো বয়েস, না?'

'নয় তো কি। ঝণ্টু-শাশ্বা এখন প্রেম করছে।'

'খুব যে, নাতি-নাতনি সম্বন্ধে কথা বলছো মনে হচ্ছে।'

'বয়সে ওরা আমাদের কতো ছোট জানো।'

'তবু এক জেনারেশন নয়। নেক্সট্ জেনারেশন ইয়েট্ টু কাম্।'

হঠাৎ টলে পড়তে গিয়ে তৃপ্তি টেবিল ধরে সামলে নিলো। কল্যাণ কাগজের দিকে তাকিয়ে কাজ করছিলো। তৃপ্তি চেয়ার ছেড়ে উঠছে অনুভব করেও চোখ তোলেনি। হঠাৎ টেবিলটা নড়ে উঠতেই তাকিয়ে দেখলো তৃপ্তির চোখে-মুখে বেদনা আর যন্ত্রণার ছাপ। এক পলকে উঠে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিকে ধরলো—'তোমার এ'চেয়ারে সত্যি খুব কষ্ট হয়, না তৃপ্তি? তোমায় কালই একটা ইজি-চেয়ার এনে দেবো। না, ইজি-চেয়ার না, ওগুলো ভাঁজ করা, খোলা অনেক হাঙ্গামা। বরং একটা বেতের চেয়ার কিনবো। বেশ গা-এলিয়ে শোয়া যায় এমন একটা বড়ো চেয়ার।'

'যথা অভিরুচি।' অল্প হেসে তৃপ্তি ওর কাঁধ থেকে কল্যাণের হাত দুটো সরিয়ে দিলো।

'চলো কাল ডাক্তারের কাছে যাই।'

'কেন।'

'দেখানো দরকার।'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'সে কি।'

'বলছি তো, সময় হয়নি। নীচের সুন্দরীদি, কলেজের সুষমাদি, সন্ধ্যাদির চেয়ে এ'ব্যাপারে বড়ো ডাক্তার নেই। স্বামীকে পিছনে রেখে তৃপ্তি এগিয়ে এলো রেডিওটার দিকে। বিরক্তিকর আধুনিক গান চলছিলো একটানা। নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুলো। কল্যাণ দাঁড়িয়ে থেকে তৃপ্তিকে লক্ষ করলো সাবধানে। তারপর ফিরে গেলো নিজের চেয়ারে।

বত্রিশ

কোথাও পাওয়া গেলো না লোকটাকে। যেন সারা পৃথিবী ঘুরে এসে লোকেন তার শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। পুলিশে ডায়েরি করতে বাধা দিয়েছিলো সবাই। রাত্রির অন্ধকারে যদি ওকে নর্দমায় খুঁজে পায় ওরা কিংবা সরযু-লতিকার ঘরে, বিপদ বাড়বে। বরং নিজেই সেখানে ছুটে গেছে, তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, মদের দোকানে, মেয়েমানুষের ঘরে, পায়নি। বন্ধুদের খবর দিয়েছে, সহানুভূতি পেয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা জোটেনি কোথাও। দেশের গ্রামে দৌড়েছে। বুড়ি-মা মারা গেছেন, ছেলেটি একবার শেষ দেখাও দেখতে যায়নি বলে অমিতের ভাইদের কাছে, গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে ধিক্কার কুড়োতে হয়েছে প্রচুর। অর্থ গেলো, শ্রম গেলো, সময়ের অপচয় ঘটলো তবু লোকটার হদিস মিললো না। তাই কলকাতার মেসে ফিরে এসে লোকেন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো বিশ্বাস করতে—লোকটা নেই। শুধু নেই নয়, আত্মহত্যা করেছে। একদিন যা চেষ্টা করেও পারেনি, আজ তা অবিশ্বাস্য নয়।

এবং এই বিশ্বাসে পৌঁছে তার মনে হলো, একটা মানুষকে সে কি কুৎসিতভাবে ভালোবেসেছিল। মূর্খের মতো, বোকার মতো। নইলে আজ কেন এমন বিশ্রী অসহায়, একা মনে হবে। ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা কিছু নেই, চারিদিকের অনাদর, অবজ্ঞা, ঘৃণা, ধিক্কার, অভিশাপ কুড়িয়ে লোকটা যখন মরতে বসেছে তখনও সেই প্রায় মরামানুষটার চোখে আমি প্রতিভা দেখতাম। যন্ত্রণা দিয়েছে, লাঞ্ছনা দিয়েছে, অত্যাচার করেছে—শুধু সহ্য করেছি, ভালোবেসেছি, দুহাতে আগলে রেখেছি। মনে হতো আমি ছাড়া ওকে দেখবার আর কেউ নেই। আর আজ! লোকেন ঘন নিঃশ্বাসে মাথার উপরে কড়ি বরগার দিকে তাকালো—আজ মনে হচ্ছে, ওই মানুষটা ছাড়া আমিও স্বজনহীন। লোকেন তার বাপ-মা-ভাই-বোনের কথা ভাবলো। যাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই বললেই চলে। মাসান্তে টাকা পাঠানোর চুক্তি। কখনও পাঠায়, কখনও পাঠায় না, দেখা-সাক্ষাত আরও কচিত ঘটে। আজ আবার সেখানে ফিরে যাওয়া চলে সর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করা যায় পারিবারিক জীবনের কাছে। হয়তো তখন মানুষটাকে ভুলতে পারবো। একেবারে ভুলবো। শোকের দুঃখ চিরদিন টেঁকে না। যদি টিকতো, পৃথিবীতে দুদিনেই অচল হতো মানুষের জীবন। মানুষ দুঃখ পায়, শোকে বিমর্ষ হয়, আবার জীবনের প্রাত্যহিকতায় ফিরে যায়। কিন্তু অমিতের ক্ষেত্রেও কি সেটা সম্ভব? অন্তত এই মুহূর্তে লোকেন যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না সত্যটা। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে মার কথা ভেবে আৎকে উঠিনি কোনদিন, গণিকার ঘরে বোনের কথা মনে করেও কাঁদিনি কখনও। অমিত সঙ্গে ছিলো। ও-ই যেন ভুলিয়ে রাখতো সব কিছু। ও আমাকে নেশার কাছে টেনে নিতো, নেশা ধরাতো এবং ও নিজেই আমার নেশা হয়ে থাকতো। কখনও কখনও ওকে অনেক বড়ো মনে হতো, অনেক উঁচু, কখনও বন্ধু, কখনও পিতার মতো

অভিবাবক। ওকে আমি তু'হাতে সামলাতাম। ওকে আমি মেয়েমানুষের মতো, মাতাল হয়ে ভালোবেসেছি, যেন আমার জীবনের জন্যই ওর অস্তিত্বের প্রয়োজন, ওকে বাঁচিয়ে রেখে আমি বাঁচবো। নিজেকে কোথাও মেলাতে পারবো না আর। সংসারে ফিরে গিয়ে ভুলতে পারবো না অমিতকে। সংসারকে ভালোবাসিনি কোনদিন, অমিতকে চেয়েছি।

কি এক তুর্বোধ্য যন্ত্রনায় লোকেন অস্থির হয়ে উঠলো। অফিস থেকে ফিরে বাবুরা আবার যে-যার মতো বেরিয়ে গেছে, ঘরে ঘরে অন্ধকার, স্তব্ধতা। সন্ধ্যেবেলার মেসবাড়ির মতোই নিঃসঙ্গ লোকেন ছটফট ক'রে মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে উঠলো অমিতকে আমি ফিরে পাবো না. অথচ আমি বাঁচবো, স্বার্থপরের মতো বেঁচে থাকবো। এক ঝামটায় তক্তপোষ থেকে মেঝের উপর উঠে দাঁড়ালো। অকৃতজ্ঞ জানোয়ারটা কোন দাম দিলো না আমাদের বন্ধুত্বের, শেষ পর্যন্ত আমাকেও বিশ্বাস করলো না, একবারও ভাবলো না—আমি, অন্তত আমি ওকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতাম, আর ও না থাকলে আমি ওর কথা ভেবে-ভেবে ভেবে-ভেবে পাগল হবো, আমিও বাঁচার আনন্দ পাবো না।

লোকেনের হঠাৎ যেন মনে হলো, সে একজন কয়েদী, ঘৃণিত কয়েদী। বাইরের তুনিয়া থেকে মার খেয়ে তাড়া খেয়ে গায়ে একপাল মানুষের থুথু আর পদাঘাতের ধুলো মেখে কয়েদে ঢুকেছে। কয়েদের গারদে এসে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে আরেকজন কয়েদীকে, অনেক বড়ো অপরাধী সে। কিন্তু সে মানুষটা বেইমান। সময় ফুরোবার পর একদিন ছাড়া পেয়ে চলে গেলো। মুক্তির আনন্দে বিদায় পর্যন্ত চাইলো না। আর লোকেন গারদে বসে বসে সেই মানুষকে ভালোবাসার যন্ত্রণায় ভুগছে। ওর মেয়াদ ফুরোতে এখনও অনেক বাকি।

অস্থিরতার অনুভূতিতে পাগল হয়ে আবছা-অন্ধকারের ঘর থেকে

ছুটে গিয়ে রেলিং-এ দাঁড়ালো লোকেন। বাইরেও অন্ধকার জমেছে। সরু নোংরা গলির মোড়ে গ্যাস বাতিটা আততায়ীর চোখের মতো জ্বলছে। বস্তির দুটো মেয়ে কি যেন কথা বলছে একটু দূরে, পাশে কালো উল বাচ্চা ছেলে। লোকেনের ভালো লাগলো না, ফিরে এলো ঘরে। ভালো লাগলোনা, শুয়ে পড়লো তক্তপোশে, ভালো লাগলো না, উঠে দাঁড়ালো, পায়চারী করলো এ'দিক ও'দিক। এ'বার সত্যি সে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত ভুলবে, সত্যি পাগল হয়ে যাবে। দু'হাতে মাথার চুল টান ক'রে ধরে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে দম টেনে রইলো। তারপর নাকে মুখে একসঙ্গে নিঃশ্বাস ছেড়ে একটু যেন স্বস্তি পেলো, হালকা মনে হলো শরীরটা। লোকেন জানে, সে চিরকাল একই ভাবে, এতো নিষ্ঠুরভাবে ভেবে ভেবে কষ্ট পাবে না অমিতের জন্য। একদিন স্বাভাবিক বলে মনে হবে সব কিছু। কিন্তু যতোদিন তা না হয়, যতোদিন স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে না পারে! ততোদিনই কি এমনি করে শ্বাসরোধ-করা যন্ত্রণাকে বুকে চেপে কাতরাতে হবে মানুষটার জন্য। ট্রামে-বাসে পথে-অফিসে, দিনে-রাতে, অসংখ্য মানুষকে দেখেছি এ'কদিন। কলকাতা ঠিক তেমনি আছে, মানুষগুলোও ঠিক তেমনি চলছে। কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। একটা মানুষের অন্তর্ধান কিংবা মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যার কথা ভেবে থমকে দাঁড়ায়নি কেউ। কেমন যেন ঈর্ষা করতে ইচ্ছা করেছে যাবতীয় নারীপুরুষকে। দুঃখতাপহীন মুখ নিয়ে মানুষগুলো চলছে, ঘরে ফিরছে, হাসছে, বৌকে সোহাগ করছে, প্রেমিকাকে ফুল দিচ্ছে। শুধু একটা মানুষকে ভালোবাসার যন্ত্রণায় ভুগছি আমি। ঘরের এই নির্জনতায় এবং নিঃসঙ্গতায় লোকেন হঠাৎ যেন যুক্তিবোধে অনুপ্রাণিত হলো। হঠাৎ যেন মনে হলো, সে ভুল করেছে। অমিত মরেছে! আত্মহত্যা করেছে! কার কি? কেন তারা ভাববে? কে অমিত! খবরের কাগজে অসংখ্য আত্মহত্যার সংবাদ পড়ে, অনেক দুর্ঘটনা, অঘটন, মৃত্যুর

নৃশংস ছবি দেখে কোনদিন বিচলিত হয়েছি কি আমি? হইনি। তবে কারও তো দায়-দায়িত্ব নেই অমিতের জন্য ভাববার। শুধু আমি, একা এবং একমাত্র আমি ভাবছি, কষ্ট পাচ্ছি, ভাববো, কষ্ট পাবো। একজন ঘৃণিত, অনাদৃত মানুষকে ভালোবাসার অপরাধে বঞ্চনা কুড়োব। কেন না, আমি, আমি ওকে একটা বোকা মুর্খ মেয়ে মানুষের মতো ভালোবেসেছিলাম। এবং আমি আমি

দাপাদাপি করতে করতে লোকেন কখন এসে তক্তপোশে লুটিয়ে পড়েছিলো জানে না এবং কখন যে ঘুমে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলো সেটাও বোঝেনি। ইতিমধ্যে ঘরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, সন্ধ্যা না তখন পরিপূর্ণ রাত। আধো-তন্দ্রায় হঠাৎ যেন মনে হলো কে যেন ডাকলো এইমাত্র। চোখ খুলে সবকিছু বুঝে নিতে সময় লাগলো বেশ। প্রথম ধাক্কায় বুঝে উঠতেই পারলো না এখন সন্ধ্যা না শেষ রাত, কখন সে ঘুমিয়েছে এবং কতোক্ষণ ঘুমিয়েছে, আদৌ সে রাতে খেয়েছে কিনা।

'আজ্ঞে শুনছেন।'

'কে?' এ'বার বাস্তব। লোকেন ধড়মড় করে উঠে বসলো তক্তপোশে। দরজার চৌকাঠে সত্যি একটা মানুষের ছায়ামূর্তি—

'কে, কে আপনি।'

'এখানে কি লোকেনবাবু বলে কেউ থাকেন?'

লোকেন ছিটকে গিয়ে আলো জ্বাললো। সত্যি একটা জ্যান্ত মানুষ এবং অদ্ভুত রকম অপরিচিত। কস্মিনকালে এ'মানুষকে সে দেখেনি, বরং স্পষ্টতই যেন মনে করতে পারলো, জীবৎকালে ট্রামে-বাসেও কোনদিন একটা সিট ভাগাভাগি করে যেতে হয়নি কোনদিন। বেটে, বুড়ো, মাথায় কাচা-পাকা চুল, গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, গায়ে ফতুয়া, পরণে হাঁটু কাপড়।

'কি চাই আপনার?' লোকেনের বিরক্তিটা যেন ক্রোধের মতোই শোনালো।

'আজ্ঞে, লোকেনবাবুকে দরকার।'

'আমি লোকেন।'

'তুমি লোকেন, বাঁচাও বাবা, বাঁচাও। এই বুড়ো বয়সে বাড়ি-হাসপাতাল, হাসপাতাল বাড়ি ক'রে মরলাম বাবা। বাঁচাও – বুড়ো সত্যি যেন পরিত্রাণ চাইছেন। দু'হাত তুলে লাফালাফি ক'রে এগিয়ে এলেন লোকেনের দিকে। এবং ক্লান্ত ছিলেন বলে ধপ ক'রে বসে পড়লেন তক্তপোশে—'তোমার বন্ধু গো, অমিত। আমায় ডোবালো।'

অমিত! প্রথম ধাক্কাটা ঠিক সামলাতে পারলো না লোকেন। মনে হলো এ' নাম সে কোনদিন শোনেনি। এ'নাম নতুন ক'রে শোনার জন্য সে প্রস্তুত নয়। না, না, অসম্ভব এতো দিনের এতো পরিশ্রম, এতো অর্থের অপচয়, এতো যন্ত্রণার অনুভূতি, সব দিয়ে সে যেন মনে মনে চায়নি কোনদিন—অমিত বেঁচে থাক। আবার সেই নাম, সেই মরা মানুষটার নাম। দ্রুতগতি রক্তের প্রবাহ গোটা শরীরে রোমাঞ্চিত হলো। সোজা সরলরেখায় দাঁড়িয়ে লোকেন প্রথম ঝোঁকটা সামলাতে চেষ্টা করলো। যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সংবাদ এসেছে, একবার মৃত বলে ঘোষিত সৈনিকটি আসলে মরেনি, বেঁচে আছে। কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো চিৎকার ক'রে উঠলো অতর্কিতে— 'কে, কে আপনি? কোথায় খবর পেলেন অমিতের?

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা একটি আস্ত উন্মাদের হাতে পড়ে বৃদ্ধ বোধ হয় ভয় পেলেন। কেঁপে কেঁপে বললেন—সব বলবো বাবা, চলো এখন। ওকে বাঁচাতে চাও তো চলো। ডাক্তার বলছে ওকে বাঁচাতে হলে অনেক টাকার দরকার। আমি গরিবমানুষ।'

লোকেনের উত্তেজনা ধীরে ধীরে থিতিয়ে এলো। অমিতের নামটা নতুন ক'রে শোনার অনিচ্ছাটা এবার সে অনুভব করছে। দম টেনে বললো—'ও এখন কোথায়?'

'হাসপাতালে।'

'কোন্ হাসপাতাল ?'
'আর জি কর, বাবা।'
'আপনি কি পুলিশের লোক ?'
'এই দেখো, আমি পুলিশ হবো কেন ?'
'কোথায় পেলেন ওকে ? রাস্তায় ; মদ খেয়ে পড়েছিলো ?'
বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন। .হঠাৎ ভারী গলায় বললেন—'অতো বাজে কথার সময় নেই বাবা। ছেলেটাকে বাঁচাতে চাস্ তো চল্। নইলে ... কথাটা শেষ করলেন না বৃদ্ধ। হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইলেন—শেষ পর্যন্ত ঠিকানাশুদ্ধ একটা মানুষের নামই ওর কাছ থেকে পাওয়া গেলো, সে তুই।'
বৃদ্ধের তুই– তুমি আপনির গোলমাল, কথাবার্তা, আচার-আচরণ বেশ কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলো লোকেন। একটা সহজ-সারল্য বলেই যেন মনে হলো সব কিছু। এবং সিদ্ধান্ত নিলো যদি ছলনা হয়, প্রতারণা হয়, অন্য যে কোন রকম বিপদ ঘটে, ঘটুক। এই মুহূর্তেই সে বেরিয়ে যাবে। আর কোথাও না হোক, অমিতের কাছে নিয়ে যেতে না পারুক, এ বৃদ্ধ অন্তত অমিতের শ্মশান দেখাতে পারবে। এক পলকে ব্র্যাকেট থেকে ধুতিটা টেনে নিলো লোকেন। তাড়াতাড়ি করে কোমরে জড়িয়েই হ্যাচকা টানে জামাটা গলাতে গলাতে, তক্তাপোশের তলায় পা ঘসে চটি খুঁজতে খুঁজতে বললো—'চলুন।'
মর্গ নয়, হাজত নয়—ভদ্রলোকের মতো হাসপাতাল। যতো বড়ো অসুখই হোক—সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে লোকেন ভাবলো—অমিতকে নিয়ে এ'বার ওর শেষ লড়াই। ওকে বাঁচাতেই হবে।
এবং একটা উদ্দাম ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বিষ্ণুরাম ঘোষ অন্ধকার সিঁড়িতে ব্যাঙের মতো লাফালেন, শেষদিকে ক্লান্ত হয়ে রেলিং ধরে কাত্‌রালেন। তবু মনে মনে ভাবলেন—এবার স্বস্তি, এবার আরাম। এতোদিনে একজন আপন মানুষের হাতে ছেলেটাকে তুলে দেওয়া গেলো।

তেত্রিশ

ভর দুপুরে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো তৃপ্তি। দিন দিন পরিবর্তন ঘটছে শরীরে। এখন আর সব কিছু সম্ভব নয়। সামান্য কিছুতেই ভেঙ্গে পড়তে হয়, অকারণে ক্লান্তি লাগে।

অথচ উপায়ও ছিলো না আর। রবিবারের সকাল ছুটির দিন। সকালবেলা কলেজের সহকর্মী প্রণতি ওর স্বামীকে নিয়ে হাজির। 'নাইট-ডিউটি' চলছে কল্যাণের, সকাল ন'ট. পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে সামনেই একটা হলে 'মর্নিংশো' খুঁজে বের করলো ওরা। ভালো ছবি। ওদের জোর-জবরদস্তিতেই যেতে হলো শেষ পর্যন্ত। নইলে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না তৃপ্তির। শরীরটা আজকাল আর সব কিছু পারে না। টলতে টলতে হাঁপাতে হাঁপাতে রেলিং ধরে উপরে ওঠার পর বুকটা ধড়ফড় করতে লাগলো। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। যে-যন্ত্রণার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না জীবনে। যা রোগ নয়, ব্যাধি নয় কিন্তু রোগ আর ব্যাধির মতোই তীব্র।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পত্রিকায় মুখ ঢেকে কাগজ পড়ছিলো কল্যাণ ধোঁয়া উঠছিলো ওদিক থেকে, হয়তো ঠোঁটে সিগারেট। অনেক কষ্টে টেনে আনা শরীরটাকে চেয়ারের উপর ঢেলে দিয়ে একটু যেন স্বস্তি পেলো তৃপ্তি। ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানতে লাগলো। চশমাটা রাখলো টেবিলের উপর, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছলো ভালো করে। ফ্যানটা ঘুরছে মাথার উপর, তবু আঁচলটাকে টেনে এনে হাতপাখার মতো বাতাস করতে লাগলো নিজেকে। আড়চোখে দেখতে চেষ্টা করলো, কল্যাণ লক্ষ করছে কিনা।

কল্যাণ তাকিয়েছিলো। চোখ পড়তেই মুখ ফেরালো।

তৃপ্তি ক্লান্তগলায় জিজ্ঞাসা করলো—'কখন এসেছো ?'

'অনেকক্ষণ। প্রায় এগারটায়।' উদাসীন উত্তর।

'স্নান-খাওয়া শেষ।'

'হুঁ—'

তৃপ্তি কথা বাড়ালো না। বুঝলো, ওর জন্য অপেক্ষা না করার মধ্যেই কল্যাণের ক্ষোভ স্পষ্ট। একটু বিশ্রাম ক'রে নিজেও উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ কল্যাণের অনাসক্ত কণ্ঠস্বরই ঘরের নীরবতা ভাঙ্গলো—'এই দুপুরে কি বেরোনো একান্তই প্রয়োজন ছিলো ?

মনে মনে বোধ হয় স্বামীর শাসনই চাইছিলো তৃপ্তি। নইলে হঠাৎ সে এমন খুশি হয়ে উঠবে কেন ? কৈফিয়তের ভঙ্গীতে হেসে বললো —'না, ওরা এসেছিলো তাই একটু গিয়েছিলাম। এই তো সামনে পূর্ণ সিনেমায়। ট্যাক্সিতে গেছি, ট্যাক্সিতে এসেছি। সে তুমি কিছু ভেবো না। কিছু হয়নি আমার, ভালো আছি।'

দ্বিতীয় প্রশ্নও নেই, দ্বিতীয় উত্তরও অবান্তর।

স্নান সেরে রান্নাঘরে এলো তৃপ্তি। জল-পিঁড়ি পাতাই ছিলো। কোন রকমে পা'দুটোকে পিছনের দিকে ছড়িয়ে বসে জলের গ্লাসটা কাত ক'রে হাতটা ধুয়ে আঙুল-ভেজা ফোঁটা ফোঁটা জল মেঝেতে ছড়াতে ছড়াতে বললো—'কি যে রাঁধো নিধুর-মা, খেতে ইচ্ছে করে না।'

ভাত বাড়ছিলো নিধুর-মা। বেশ একটু ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিলো—'খেতে ইচ্ছে করে না সে কি আমার দোষ ? ভাতে অরুচি, এত যে বলি ··'

অনেকদিন ধরেই কি যেন বলতে চাইছে নিধুর-মা। বলতে পারছে না। কিছুটা সাহসের অভাব, কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা সঙ্কোচ। তবে কোন প্রসঙ্গে যে বলতে চায় তৃপ্তি সেটা বোঝে। শুনতেও চায়। কিন্তু কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা সম্ভ্রমবোধে প্রশ্ন করতে বাধা। ভাতের থালাটা সামনে এগিয়ে দিয়ে নিধুর-মা সরোষেই বললো—

'কি জানি বাপু, তোমরা এতো লেখাপড়া শিখেছো, এতো-এতো বই পড়েছো, এতো জানো-শোনো আর এ'টুকুন বোঝ না ?'

বিনা কথায় তৃপ্তি হাসলো মাত্র।

কিন্তু নিধুর-মা অতো সহজে থেমে যাবার মানুষ নয়। বলেই চললো —'সুখের অঙ্গ তোমাদের। এ'সময়ে এতো গায়ে-গতরে খাটুনি সইবে কেন বলো ? আজ এই এতো বেলায় আবার কেন বেরোলে বলো দিকিন। ছুটির দিন, আজ তো আর কলেজ ছিলো না।'

তৃপ্তির ভাত-ভাঙ্গা থালায় ডালের বাটিটা উপুড় ক'রে দিয়ে নিধুর-মা সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে—'রাগ করোনা মা। তোমার মঙ্গল জ্ঞানেই বলি, এটু সাবধান হও। আমরা দেশ-গেরামের হাবাগোবা মানুষ। আটমাসেও ঢেঁকিতে পাড় দিয়েছি, ন'মাসেও মরদদের রেঁধে খাইয়েছি আর দশমাসে পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়ে পথে ছেলে বিইয়ে ঘরে ফিরেছি। তাই বলে তোমরা পারবে কেন ?

ঘরে না আছে শাশুড়ি, না বুড়ি মা। সেজন্যেই যেন কথাগুলো বলার একটা নৈতিক অধিকার জন্মেছে বলে নিধুর-মার বিশ্বাস। তৃপ্তিও রাগ করে না, ক্ষুব্ধও হয় না এতোটুকু বরং চুপ করে শোনে। শোনাটা প্রয়োজন মনে হয়।

একটু ডাল-মাখা ভাত মুখে তুলতেই কেমন বিস্বাদ লাগলো সবকিছু। জোর করে চিবোতে চিবোতে তৃপ্তি নাকেমুখে বিরক্তি তৈরি করলো— 'এ আর ভালো লাগে না নিধুর-মা। খাওয়া যায় না। বাজার থেকে একটু তেঁতুল আনতে পারো না। এতো যে বলি—'

'কি যে তোমরা বল মা, কিছু বুঝি না—' পঞ্চাশ বছরের বুড়ি নিধুর-মা মুখ ঝাঁকালো এবার। উনুনের দিকে উঠে গেলো—'তেঁতুল খাবে কি মরতে ? এই বুঝি তোমাদের বইপুঁথিতে লেখা থাকে ? ও'সব খেয়ো না গো মা, খারাপ হবে। দেশে গেরামে আবাগী মেয়েগুলোকে দেখেছি উনুনের পোড়ামাটি, দইয়ের খুরি গিলছে আর ধমক খাচ্ছে শাশুড়ি-ননদের।

নিধুর-মা পিছনে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো। আরও একটা ভাতের গ্রাস মুখে তুলে ছিলো তৃপ্তি। কড়া চোখে তাকালো। এখানেই নিধুর-মার স্পর্ধা।

দোষ নেই নিধুর-মার। হিতৈষী বলেই বলে কিন্তু মধ্যে মধ্যে নীচের তলার সুন্দরীদির মতো মুখের লাগাম ছেড়ে দেয়, এই যা দোষ।

কিছু খেয়ে, কিছু না খেয়ে স্বাদগন্ধহীন ভাতকে থালার কোণে ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো তৃপ্তি। ধোয়া হাত আঁচলে মুছতে মুছতে ঘরে এসে দেখলো, কল্যাণ বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিছুই করার নেই এখন। অলস দুপুর। শুয়ে শুয়ে বই পড় যায়, ঘুমোন যায়, একটু পরে রেডিও খুলে 'অনুরোধের আসর' শোনা চলে। বিরক্তিকর আধুনিক গান। তার চেয়ে ঘুম ভালো। মেঝের উপর পাটি বিছিয়ে, কল্যাণের হাতটা সরিয়ে খাট থেকে নিজের বালিস দুটো নিয়ে এলো। দরজাটা বন্ধ করে মনে হলো খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমোন উচিত নয়। সেদিন দর্শনের সন্ধ্যাদি কলেজে বসে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। পনের বছরের অভিজ্ঞ এবং তিন সন্তানের মার কাছে আহারে অরুচি থেকে পরিবার-পরিকল্পনার তত্ত্ব পর্যন্ত সবই মন দিয়ে শুনেছিলো তৃপ্তি এবং সেকারণেই শুলো না। পিঠে এলোচুল ছড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। কোণাকুণিভাবে ছায়া পড়েছে আড়াই-হাত চওড়া ঝুলানো বারান্দার উপর। দেয়ালে হেলান দিয়ে ছায়ায় দাঁড়ালো। চুড়ি থেকে সেফ্‌টিপিন খুলে দাঁত খুঁটতে লাগলো।

ও'দিকের ওই জানালাটা খোলা। রামকৃষ্ণের ফটো, তার নীচে পেরেকে ঝোলানো রেন-কোট। তার উপর আবার একটা নোংরা সার্ট। রেন-কোটটা সরায় না কেন ওরা? অন্তত সার্টটা! কি ভয়ঙ্কর দেখতে। হয়তো খুব পুরোনো, কেউ পরে না। প'ড়ে আছে তো প'ড়েই আছে, কেউ তাকায় না। তৃপ্তির মনে পড়লো

সেই মেয়েটিকে। বারান্দায় দাঁড়ালেই মনে পড়ে। শরীর মন অবশ হয়ে আসে।

তৃপ্তি নিজের দিকে তাকালো। বাইরের চেহারার দিকে নয়, শাড়ির ভিতরে, চামড়ার ভিতরে যে মেয়েলী শরীর, তার দিকে। ঠিক এমনি এক অবস্থায়, এমনি উপলব্ধির স্তরে এসে পৌঁছেছিলো মেয়েটি। শরীরতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মদানের লগ্ন এসেছিলো ওর দেহে। কিন্তু মেয়েটি জন্ম দিলো না, নিজে মরলো। শুধু নিজে মরলো না, একজনকে হত্যাও করলো। একদিকে আত্মহত্যার কলঙ্ক, অন্যদিকে হত্যার অপরাধ, পাপ। তৃপ্তি আৎকে উঠলো সে কথা চিন্তা ক'রে এবং তীব্রতম যন্ত্রণার মধ্যে একজন অচেনা, অদেখা, অজানা, রূপহীন, আকারহীন অস্তিত্বকে উপলব্ধির মধ্যে অনুভব ক'রে চোখ বুজে অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ ক'রে তুললো, শিরায় শিরায় ধমনীতে সঞ্চারিত শিহরণ কেঁপে কেঁপে রক্তের মধ্যে অনুভব করলো ভবিষ্যত কাকে বলে ?

ওদের জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। রোদ নেমেছে পায়ের উপর। খুব আলতোভাবে গোড়ালির দিকের শাড়ি আর সায়াকে একটু তুলে নিজের পায়ের দিকে তাকালো। ধবধবে পা-দুটো ফুলে ফুলে উঠেছে, আঙুল রাখলে আঙুলের ছাপ পড়ে। নিজেরই শরীর অথচ তারই মধ্যে কতো নতুন কিছু আবিষ্কার, নিজেকে নিয়েই গবেষণা। আজ নিজেকে নিয়ে মেতে থাকার ছেলেমানুষীতে অদ্ভুত একটা মজা।

'সেফটিপিনটা' আবার চুড়িতে আটকে নিয়ে তৃপ্তি ঘরে ফিরে এলো। মাথার চুলগুলো শিয়রের দিকে ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো পাটিতে। কড়িকাঠের দিকে তাকাতেই ও'বাড়ির মেয়েটির মুখ ভেসে উঠলো আবার। নিজের বেদনার সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছে ছবিটা। এমনি বেদনার মধ্যে মেয়েটি কাঁচা-বয়সে মরেছিলো। কিন্তু তৃপ্তি মরবে না। কথাটা ভেবে যেন একটু সুখও পায় তৃপ্তি। মাতৃত্বের

গৌরব ওর স্বাস্থ্যে, ওর শরীরে, মনে, যৌবনে। নিজের মধ্যে অন্য-জনের অস্তিত্বকে অনুভব ক'রে যে যন্ত্রণার উপলব্ধি, যন্ত্রণার মধ্যে যে সুখ, সে সুখে চোখ বোজে। ঘুমোয়।

বিকেলে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লো কল্যাণ। সন্ধ্যায় গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, রেডিওটা খুলে খাটে শুয়ে বেশ আমেজি আরামে বই পড়ছিলো তৃপ্তি। হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো। অতিথি-অভ্যর্থনায় এগিয়ে গিয়েই তৃপ্তি চমকে উঠলো দেখে-- লোকেন। ওর দরজায় যার উপস্থিতি অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, কিছুটা অবাঞ্ছিতও বটে। সেই লিক্‌লিকে স্বাস্থ্য, ব্রণে-ভরা চোয়ালভাঙ্গা চাষাড়ে চেহারা।

'আস্‌তে পারি ?'

'নিশ্চয়ই—' তৃপ্তি উৎসাহেই হাসলো—'কি ব্যাপার ? হঠাৎ তুমি ?'

লোকেন ঘরে এসে বসলো চেয়ারে। তৃপ্তি খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'চা খাবে ?'

'না, না, চা-ফা কিছু না। একদম সময় নেই। তোমার সঙ্গে দুটো দরকারি কথা ব'লেই চলে যাব –' খুব তড়্‌বড় ক'রে কথাগুলো শেষ ক'রেই লোকেন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো—'চাঁদা চাইতে এসেছি, চাঁদা দাও।'

'চাঁদা!' তৃপ্তি হাসলো –'কিসের চাঁদা! বুড়ো বয়সে পুজো-কমিটির সেক্রেটারি-ট্রেজরার হ'লে নাকি ?'

'না, ও'সব কিছু নয়, বলতে পার 'রেড-ক্রশ', রীতিমতো হিউম্যানিটির কাজ।'

'কি বলো তো ?'

'সে কি ? কল্যাণের কাছে শোননি কিছু ?'

'কই, না তো।'

'অমিতের অসুখ। সিরিঅস কণ্ডিশান।'

'অমিত!' ভীষণভাবে নিজের মধ্যে একটা ধাক্কা খেলো তৃপ্তি। খাটের বাজু ধ'রে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো—'অমিতের অসুখ! কি অসুখ, কি অসুখ লোকেন।'

'ভুগছিলো অনেকদিন থেকেই। জানো তো, অনেকদিন থেকেই ওর খোঁজ পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ কাল এক বুড়ো এসে খবর দিলেন। ওঁর কাছেই ছিলো এতোদিন। গরীব মানুষ, একটু বেড়ে উঠতেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন মাঝে মাঝে 'সেন্স' ফেরে আবার অজ্ঞান হয়।'

'খুব, খুব সিরিঅস?'

'মরবার পক্ষে যতোটা দরকার তার চেয়ে কম নয়।' খুবই সহজভাবে বললো লোকেন এবং প্রচ্ছন্ন হাসলো। যেন কিছুই নয়।

ঠাণ্ডা জমাট বাধা রক্তের চাপ হঠাৎ গলতে সুরু করেছে। শিরশির ক'রে বয়ে যাচ্ছে শিরায় শিরায়। তৃপ্তি ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, তাকিয়ে রইলো লোকেনের দিকে। ভুলে গেলো, একজন পুরুষের দিকে এ'ভাবে তাকিয়ে থাকাটা কতো অশোভন, কতো অন্যায়। সব দোষ এ' লোকটার। এ' লোকটা অমিতের কোন ভালো খবর আনতে জানে না, অমিতের মৃত্যুর কথায় হাসে। রাগ হলো নিজের উপর। মিথ্যে অভিমান নিয়ে এই মাস পাঁচেক অমিতের কাছে যায়নি আর এই পাঁচ মাসে এমন কি হলো যে অমিত প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো লোকেন—'কি, দেবে না চাঁদা? অমিত নইলে ম'রে যাবে।'

তৃপ্তি বারকয়েক ঢোঁক গিলে চোখ তুলে তাকালো। সংযত করলো নিজেকে। কাঁপা গলায় বললো—'আমার টাকা, না, না, আমাদের চ্যারিটির টাকা অমিত নেবে?'

'এতোদিন নেয় নি। নেয়নি বলেই তো রোগটা অ্যাদ্দুর গড়ালো। গোড়ায় চিকিৎসা করলে কি এতোটা হয়?' লোকেন ছোট একটা

নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললো—'এখন সেন্সলেস হয়ে আছে। এখন তো চাঁদা তুলতে ভয় নেই। এ'জন্যে যদি রাগ করে তো বেঁচে উঠে করবে। তা করুক, তখন দেখা যাবে।'

'কতো দেবো লোকেন?'

'যা তোমার খুশি, যতো পারো। আমাদের অনেক টাকার দরকার।'

বালিশের তলা থেকে চাবিটা তুলে নিলো তৃপ্তি। কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেলো আলমারিটার দিকে। এখনও জমা আছে খরচের পর অনেক গুলো টাকা। কিছু দশ টাকার, কিছু পাঁচ টাকার, কিছু খুঁচরো। তদুপরি একশ টাকার দুটো। দু'জনের উপার্জন। বাড়ি-ভাড়া, মাসের খরচ, কাগজ, দুধ, নিধুর-মা, মেথর যাবতীয়—মেটানোর পরও মাসের দশ তারিখে অনেক মনে হয়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো টাকাগুলোর উপর। এর সব তুলে দিলে যদি অমিত ভালো হয় তবে তাই কি দেওয়া যায় না চোখ বুজে? কল্যাণ তো হিসেব চায় না, চাইবেও না কোনদিন। তৃপ্তি ভাবলো। হাত বাড়ালো। হাতে উঠে এলো মাত্র একটা এ'কশ, আর উঠলো না। তৃপ্তি তবু ভাবলো। এক শ'। নিজের কথাও ভাবতে হয়। বোধ হয় এ'মাসেই প্রয়োজন হ'বে অনেক টাকার। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে বেশি সময় লাগলো না! এগিয়ে এলো লোকেনের দিকে—এই নাও লোকেন, আমাদের দু'জনের। এর পরেও আরো দরকার হ'লে—'

'সে কি, কতো এখানে?'

'এক শ।'

'এক শ!' লোকেন খুশি হয়ে হাত বাড়ালো। অন্যমনস্কভঙ্গীতে নখ দিয়ে বই এর পাতা উল্টনোর মতো টাকাটার উপর একবার আঙুল বুলিয়ে গেলো—'কল্যাণ ষাট দিয়েছে, তুমি একশ'। এর বেশি কতো আর পারে মানুষ। তোমাদেরও তো খরচ আছে।'

'কল্যাণ দিয়েছে! কল্যাণ জানে নাকি এসব।'

'জানে মানে, কল্যাণ তো সারাটা সকাল আমাদের সঙ্গে ছিলো। ও তো এখনও বোধ হয় হাসপাতালে।'

খুব সাবধানে তৃপ্তি আরও একটা ধাক্কা সামলে নিলো।

'আমি আজ যাই তৃপ্তি ওরা সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্তে।'

লোকেন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

তৃপ্তির ইচ্ছা হলো, জিজ্ঞাসা করে লোকেন যে ওর কাছে এসেছে কল্যাণ জানে কিনা। কিন্তু লোকেনের মতো ছেলেব কাছে এ'প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হলো না। বললো—'একটু দাঁড়াও লোকেন, অমিত কোন হাসপাতালে আছে লিখে দাও। কি ক'রে যাব?'

'কল্যাণ সব জানে, ওকেই জিজ্ঞেস কবো।'

'না, তবু তুমি লিখে দাও। এই কাগজ, এই তো কলম।'

লিখে দিয়ে গেলো লোকেন। হাসপাতাল, ওঅর্ড, বেড নম্বর। —সব।

চৌত্রিশ

নাইট ডিউটি'। দশটায় পৌছোনো দরকার। ন'টার একটু আগে পড়ি-মবি ক'রে ফিরে এলো কল্যাণ। বাইরের বারান্দায় পাটি পেতে চুপচাপ অন্ধকারে বসে ছিলো তৃপ্তি। লোকেন চলে যাবার পর একটা বিষাদ আচ্ছন্ন করেছে সবকিছু। পায়ের শব্দে, 'চিঠি আছে কিনা' নিধুর-মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করার হাঁকে বুঝলো— কল্যাণ ফিরেছে।

তৃপ্তি উঠে এলো ঘরে।

'কেমন আছো?'

'ভালো।'

'শরীর খারাপ লাগছে না?'

তৃপ্তি মাথা নাড়লো।

'অষুধ খেয়েছো।'

তৃপ্তি আবার মৃদু মাথা নেড়ে জানালো।

'হরলিক্‌স্‌ ?'

'ইনসিওরেন্সের প্রিমিঅম দিয়েছো ?'

হাতের ঘড়ি আর চশমা টেবিলে রেখে পাঞ্জাবি খুলছিলো কল্যাণ। একটু বিরক্ত হলো—'আঃ, যা বলছি বলো।'

'বললাম তো ভালো আছি। দুধ, হরলিক্‌স্‌, অষুধ সব খেয়েছি। এখন আমার কথার উত্তর দাও। প্রিমিঅম দিয়েছো ?'

'না, আজ আর সময় পেলাম কই। কাল দেব।'

'তা হ'লে টাকাটা দাও তো। এখন আর আলমারি খুলতে ভালো লাগছে না। মুদি দোকান থেকে টাকা চাইতে এসেছিলো সন্ধ্যেবেলা। দাও, মিধুর-মাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। একটু পরে বরং তোমাকে আবার দিচ্ছি।'

ইতস্তত করলো কল্যাণ। বিরক্তিটা চোখে-মুখে স্পষ্ট—'কতো চাই ?'

'পুরোটাই দাও।'

'আঃ, কি কুড়েমি করছো, দাও না ওখান থেকে খুলে।'

'তোমারই বা টাকাটা দিতে অতো আপত্তি কিসের ?'

'টাকাটা এখন নেই। অফিসের এক বন্ধুকে ধার দিয়েছি, কাল-পরশু দেবে।'

দেয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো কল্যাণ। তৃপ্তি লক্ষ করছিলো ওকে। হঠাৎ বললো—'অমিত কেমন আছে এখন ?'

পাঞ্জাবিটা ব্র্যাকেটে রাখতে এগোচ্ছিলো কল্যাণ। থমকে দাঁড়ালো—'তুমি কি করে জানলে ?'

'যে ভাবেই হোক জেনেছি। একেবারে শেষ অবস্থায় একটা মানুষ মরতে বসেছে আর তখনও তুমি কথা লুকোচ্ছো ?'

মাথার উপর লুঙি গলিয়ে কোমরে বেড় দিলো কল্যাণ। ধুতির কোঁচা সরিয়ে গিঁট খুলতে লাগলো মন দিয়ে।

'কি কিছু বলছো না যে, অমিত কেমন আছে এখন ?'

'ভালো না।'

'কি বলেছে ডাক্তার ?'

'অবস্থা খারাপ।'

'কোথায় আছে ?'

'হাসপাতালে।'

'সে জানি, কোন্ হাসপাতাল ? ওঅর্ড, সিট নাম্বার ?'

'কেন ?'

'আমি যাব। নিয়ে যাবে আমাকে ?'

কল্যাণ চুপ করলো। ধুতিটা আলনার উপর রেখে লুঙির গিঁট বাঁধলো কোমরে। গেঞ্জিটা নীচের দিকে একটু টেনে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললো— 'ভাত দিতে বলো নিধুর-মাকে। সাড়ে ন'টা বাজে। উঃ, একদম সময় নেই।'

যাও না রান্নাঘরে। জল-পিঁড়ি তো পেতেই রেখেছে। গেলেই হয়·—' তৃপ্তি খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো—'তুমি কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর দিলে না। এক্ষুনি তো চলে যাবে। কাল সকালে ফিরতে দেরি করলে আর দেখাই হবে না। আমি কিন্তু কলেজ থেকে সোজা চলে যাব। ফিরবো তোমার সঙ্গে।

কল্যাণ আবার চুপ করলো। একটা জটিল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাবলো—কি বলবে তৃপ্তিকে। চারদিক রক্ষা ক'রে নিজের বক্তব্যকে প্রকাশ করতে হবে অথচ তার উপযোগী কোন ভাষা খুঁজে না পেয়ে মস্তিষ্কের শিরায়, স্নায়ুতে জ্বালা বোধ করলো। সবশেষে খুব লঘু গলায় প্রশ্ন করলো—'তুমি কি অনুমতি চাইছো, তৃপ্তি ?'

'যদি বলি, হ্যাঁ।'

'আমার কথা রাখবে ?'

'কেন, যেতে দেবে না ?'

কল্যাণ আরও নরম হলো, আরও আন্তরিক। এগিয়ে এসে আদরের

ভঙ্গীতে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলো—তুমি এর আগে কোনদিন তো অনুমতি চাওনি, কখনও-কখনও জানিয়েছ মাত্র।'

'তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কিছু করেছি কখনও?'

'না।'

'আজ অনুমতি চাইছি, কারণ আছে ব'লে।'

'আমি কি কোনোদিন তোমার কোনো কাজে, কোনো ইচ্ছায় বাধা দিয়েছি?'

'আমি তো বলিনি সে'কথা।'

'আজ আমার একটা কথা রাখবে, প্লিজ—'কল্যাণ ওর শেষ শব্দটায় বেশ একটু জোর দিয়ে কণ্ঠস্বরে করুণ আবেগ আনতে চাইলো।

'বলো—'

'তুমি ও'খানে যেতে চেয়ো না। আমার একমাত্র অনুরোধ তোমার কাছে।'

স্বামীর হাতের দুটি শক্ত থাবার স্পর্শ নিজের কাঁধে অনুভব করে তৃপ্তি চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর খুব আস্তে আস্তে কল্যাণের হাত দুটো নিজের শরীর থেকে নামিয়ে সরে দাঁড়ালো দূরে। কল্যাণ স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলো। সে জানে, ঘরের এ মৌন দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করেছে, তার পরিণতি ব্যাপক। আবার সময়ের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে। অপেক্ষায় থাকতে হবে অনেক দিন, অনেক সময়। কিন্তু তৃপ্তিকে আজ কাছে রাখা দরকার আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।'

'তৃপ্তি—' খুব আস্তে আস্তে লঘুস্বরে প্রতিটি শব্দকে উচ্চারণ ক'রে কল্যাণ বলতে লাগলো—'জানি তুমি কষ্ট পাবে, এ তোমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। অমিতকে সত্যি তুমি ভালোবাসো ও হাসপাতালে পড়ে থাকবে আর তুমি—কিন্তু, কিন্তু তৃপ্তি তুমি নিজেও তো সুস্থ নও।'

তৃপ্তি ফিরে তাকালো—'এটা আমার ব্যাধি নয়।'

'ব্যাধি তো বলিনি আমি। তুমি সুস্থ নও। আসছে সোমবা
থেকে তুমি কলেজে ছুটি নিচ্ছো। তারপর থেকে শুধু বিশ্রা
নেবার কথা।'

'একদিন ওখানে গেলেই কি—'

'ছিঃ, ছেলেমানুষি করো না—' কল্যাণ কথাটা শেষ করতে দিলে
না তৃপ্তিকে—'ভুলে যাচ্ছো কেন, ওটা হাসপাতাল। ওটা কি শু
শরীরের প্রশ্ন ? মন ; আমি জানি, সেখানে তুমি অমিতকে দে
শান্ত থাকতে পারবে না। ভয় পাবে, দুঃখ পাবে, শোক পাবে
সেই থেকে সারাদিন, সারারাত, সারাক্ষণ শুধু ওই ভাববে। তৃপ্তি
ভেবে দেখো, এভাবে এ সময়ে অবুঝ হওয়াটা কি উচিত হবে
তোমার ? একদিকে একটা ডায়িং-ম্যান', অন্য দিকে একটি
গ্রোয়িং-চাইল্ড।'

ও'দিকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলে
তৃপ্তি। তাকিয়ে রইলো এবং অপর পক্ষের নীরবতা কল্যাণকে
চিন্তিত করলো আরও। তৃপ্তির দাঁড়ানোর ভঙ্গী, অন্যমনস্কত
ওর দৃষ্টি—সব কিছুর মধ্যেই যেন কল্যাণ একটা অশুভ পরিণামকে
লক্ষ করলো। রক্ত-মাংসের সঙ্গে নিষ্ঠুর-ক্রূর-কুটিল যন্ত্রণার
বোঝাপড়া। কল্যাণ আতঙ্কিত হলো—'আমি জানতাম, এটা হবে
আমি জানাতে চাই নি, তবুও তুমি জেনেছো। আমি কি বুঝি না
এই যে আমি এতো কথা বলছি এরই ফলে ক্ষতি হচ্ছে তোমার
এখন থেকে সারাক্ষণ তুমি অমিতের কথা ভাববে, কষ্ট পাবে, কাঁদবে
তৃপ্তি, ডাক্তার তোমাকে কি বলেছেন ? ভাল ভাবে থাকবে, হাসি-
ঠাট্টা করবে, সিনেমা দেখবে। খুশিতে থাকবে বলেই না ঝন্টু,
শান্তাকে আসতে বলেছো রোজ সন্ধ্যেবেলা ’

নিজের সঙ্গেই লড়াই করছিলো তৃপ্তি। দপ্-দপ্ করছিলো
মাথাটা। সেই মানুষটা একটু একটু ক'রে ক্ষয়ে যেতে-যেতে
কোথায় এসে নেমেছে, কে জানে। হয় তো বাঁচবে না। অথচ

আমি আজ অসহায়। শুধু একবার দেখতে যেতেও বাধা। কল্যাণের প্রচণ্ড আপত্তিকে অস্বীকার করতে কোথায় যেন বাধছে। তৃপ্তি ভাবলো—সত্যি যদি কোন বিপদ ঘটে যায়? কল্যাণের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার উপায় থাকবে না। তৃপ্তি এক পলক স্বামীর দিকে তাকালো। তারপর খাটের দিকে এগোতে-এগোতে বললো—'তুমি আপিসে যাবে না? যাও, খেতে যাও, নিধুর-মা বসে আছে।'

তৃপ্তির এই আকস্মিক প্রসঙ্গান্তর প্রবোধ দিলো না। একা থাকলেই তৃপ্তি এখন ঘর অন্ধকার করবে, রেডিও বাজাবে না, একা হ'বে, একা একা ভাববে, ভেবে-ভেবে মনকে পীড়িত করবে। এতো কথা চিন্তা ক'রেই কল্যাণ ঘর ছেড়ে যেতে ভয় পেলো। ঝণ্টু আসবে। যতোদিন ওর রাতের 'ডিউটি', সে কদিন ঝণ্টুর এখানে থাকার কথা। কিন্তু যদি ও দেরি করে, অন্তত অফিসে বেরিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত না আসে তবে উৎকণ্ঠায় রাত কাটাতে হবে অফিসে।

তৃপ্তি বিছানার উপর শরীর এলিয়ে বসলো। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কল্যাণ। পিঠে হাত বুললো, তৃপ্তির মাথাটা নিজের বুকের কাছে তুলে আদর করলো গালে কপালে মৃদু হাত বুলিয়ে—'তৃপ্তি।'

তৃপ্তি নিঃশব্দে চোখ বুঁজে রইলো।

তৃপ্তির খোলা চুলে হাত ডুবিয়ে নরম পিঠে হাত বুলিয়ে কল্যাণ নিজের মাথাটা নামিয়ে আনলো, থুতনিটা রাখলো স্ত্রীর সিঁথির উপর '—আমাকে তুমি বিশ্বাস করো তৃপ্তি, বিশ্বাস করো। অমিতের জন্যে যা কিছু করা যায়, যতোটুকু সাধ্য সব করবো। রোজ তোমার কাছে ওর খবর এনে দেবো। কিন্তু তুমি যেয়ো না, যেতে চেয়েও না লক্ষ্মীটি। ওর যা অসুখ, তুমি তো জান না সেখানে মেয়েরা যায় না, যাওয়া উচিত নয়।'

'জানি—'

কল্যাণ চমকে উঠলো। দীর্ঘ নীরবতার পর তৃপ্তির এই মৃদুস্বরের

একটি শব্দই যেন ঘরের স্তব্ধতায় উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি হয়ে উঠলো—'কি জানো তুমি ?'

'ওর অসুখের কথা।'

'কি অসুখ ?'

'ভি, ডি।'

একটা নিঃশব্দ চীৎকারে যেন ভরে উঠলো ঘরটা। কল্যাণ আৎকে উঠলো। আরও নিবিড় আলিঙ্গনের জন্য হাত বাড়িয়েছিল স্ত্রীর দিকে, হাত শিথিল হয়ে এলো—'তুমি কি ক'রে জানলে।'

স্বামীর বাহুলগ্না তৃপ্তি তখন কাঁপছে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ধরাগলায় বললো—'আমার ওকে ঘৃণা করা উচিত। না ?'

তৃপ্তির চোখের দিকে তাকিয়ে ওর অসহায়তাকে অনুভব করলো কল্যাণ। স্নেহে, মমতায়, ভালোবাসায় আরও জড়িয়ে রাখতে ইচ্ছা হলো। অমিত মরতে বসেছে, ওকে ঘিরে ডাক্তার-নার্সের ছুটোছুটি, ওর আর্তনাদ, দাপাদাপি আর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকা—সব দৃশ্যই কল্যাণ দেখে এসেছে। কিন্তু বলা যাবে না তৃপ্তিকে। অথচ মানসিক অবসাদ বোধ করবে ভিতরে ভিতরে। কিন্তু সেদিন আর কিছুই বলার থাকবে না কল্যাণের। বাস্তব এবং কঠোর সত্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মেনে নিতেই হবে—অমিত কি ? আর যদি বেঁচে উঠে অমিত আবার এই পৃথিবীতে বসবাসের অধিকার পায় তবে সেদিনও তৃপ্তিকে বিবেচনা করতে হবে—ভালোবাসাকে কতো অংশে ভাগ করা যায় এবং সমান ভাগ দিয়ে সকলকেই খুশি করা যায় কিনা। তৃপ্তির সমগ্র অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে যদি কোন তৃতীয় ভাগীদার তার দাবি জানায় তবে সেদিন কি করবে সে। তৃপ্তির আনত মাথার দিকে তাকিয়ে, ওর সিঁথিতে আঙুল বুলোতে বুলোতে কল্যাণ খুব শান্ত গলায় বললো—'ছিঃ তৃপ্তি, মানুষকে ঘৃণা করতে নেই। তার ভুলগুলো বুঝতে হয়। তার ভুলের জন্যে যে শাস্তিই তাকে দিই, ঘৃণা করবো না। বিশেষত অমিত আমাদের বন্ধু।'

স্বামীর আলিঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তৃপ্তি আরও আস্তে, আরও সতর্ক চেষ্টায় শুয়ে পড়লো বিছানায়। অবলম্বন ছাড়া অনেকক্ষণ বসে থাকতে কেমন ক্লান্তি লাগে আজকাল, স্বামীর বুকে মাথা রেখে একটু বেশি সময় বসে থাকতে পারলো। কিন্তু তারপরই এলিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। কাঁপা-কাঁপা কষ্টকৃত কণ্ঠে বললো—'তুমি খেতে যাও। অফিসে যাবে না?'

তৃপ্তি আবার আলোচনা এড়াতে চাইলো। কল্যাণ সে প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ালো না—তুমিও খেয়ে নাও। তারপর একেবারে ঘুমিয়ে থাকো।'

'না, ঝণ্টু আসুক।'

'যদি রাত করে।'

'তা হোক, তুমি যাও।'

কাত হয়ে শুয়ে থাকা তৃপ্তির শরীরে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে দূর থেকে স্ত্রীকে একটু দেখলো কল্যাণ। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

কোন রকমে খেয়ে এসে ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলো কল্যাণ। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তৃপ্তিকে। চিৎকার ক'রে ডাকলো নিধুর-মাকে।

বিছানার উপর আড়াআড়ি কাত হয়ে শুয়ে মাথাটা ঝুলিয়ে বমি করে মেঝেটা ভাসিয়ে দিয়েছে তৃপ্তি। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেছে, ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে। বুকের আঁচল গোড়ালির কাপড় কোথাও কিছু ঠিক নেই। দেখে কেমন ভয় পেলো কল্যাণ!

চিৎকারে নিধুর-মা ছুটে এলো, নীচ থেকে আরও অনেকে এলো। সবাই বললো—ও কিছু না। প্রথম তো, এই নাকি হয়।

নিধুর-মা সারারাত জেগে কাটালো তৃপ্তির শিয়রে। ঝণ্টু বারকয়েক ঘুমোতে চেষ্টা করলো, পারলো না। অফিস যেতে পারলো না কল্যাণ। একের পর এক সিগারেট পোড়ালো বারান্দার রেলিং-এ

দাঁড়িয়ে। ফাঁকা, নির্জন, ঠাণ্ডা আর মরা সেই মধ্য রাত্রির গলিটার দিকে তাকিয়ে।

দুপুর রাত। কোথায় যেন এক হাঁপানী রোগীর প্রাণান্তকর কাশির শব্দ। ও বাড়ীতে শিশুর কান্না। ওদের নতুন মেয়ে। একটা রিকশা। একটা মাতাল। দোতলায় আলোর ঝিলিক। একটি মহিলা দরজায় এসে দাঁড়ালো। মাতাল ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দূরাগত একটা উন্মত্ত হুঙ্কার। কান্না। তারপর সব চুপ, ঠাণ্ডা, নিঃঝুম। কল্যাণ একটা হাসপাতালের কথা ভাবলো। বিকেলের দেখে আসা সেই মর্মান্তিক দৃশ্যের কথা। এখন হয় তো সব নিথর স্তব্ধ। সারি বাধা নানা বয়সী রোগীদের শয্যা, এখন মৃদু আলো, কোথাও ঘুম, কোথাও কাতরতা, কোথাও মৃত্যু। জানালার ফাঁকে কল্যাণ নিজের ঘরের ভিতর তাকালো। আলো জ্বলছে। তৃপ্তির শিয়রে নিধুর-মা। একজন মানুষ আসবে তার জন্মের আয়োজন।

ওদিকের জানালায় আলো নিভবার আগে কল্যাণ আরও একটি সিগারেট শেষ করলো। তবু দাঁড়িয়ে রইলো সেই অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে। ভাবলো—ওদের কি হৃদয় নেই? হৃদয়ের কোন সমস্যা?

পঁয়ত্রিশ

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে কল্যাণ। পৃথিবী, পৃথিবীর তাবত নরনারী সৃষ্টির প্রথম উষা থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠা মানুষের সব কীর্তি, সমস্ত সাধনা, যাবতীয় সুন্দরের উপাসনার কথা ভেবে-ভেবে ক্লান্ত হয়ে, দেহে মনে রক্তের অনুতে-অনুতে শিহরণ অনুভব করলো, মনে হলো সে যেন আজ এখন, এই মুহূর্তে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে বসে আছে, আর তার চারপাশে, এই অনুপম পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে, জলে-ডাঙায়, চরাচরে এক মৃত্যুর বিষাক্ত ঘ্রাণ। আস্তে আস্তে, একটু একটু ক'রে তিলে তিলে সেই দূষিত বাতাস মানুষের সমস্ত নিঃশ্বাস কেড়ে নেবে, শুধু মৃত্যুর মধ্যে, শ্মশানের মহাশূন্যতায়, ভূগোলের সমস্ত বেড়া ভেঙে যাবে, পৃথিবীর যাবতীয় নারী-পুরুষ এক হয়ে, শুধু একটিমাত্র আর্তনাদের ভাষায় জীবনের প্রতি মমতায় পিছনের দিকে একহাত রেখে এবং মৃত্যুর ভয়াবহ আতঙ্কে সামনের দিকে অভিশাপের তর্জনী তুলে মুখ থুবড়ে পড়বে মাটিতে। আর তারপর দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে সে আগুন একটু একটু ক'রে নিভে যাবে একদিন। সেদিন এই পৃথিবীতেই পর্বত তার স্পর্ধিত চূড়া হেঁট করবে সমুদ্রের কাছে, সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গর্জন স্তব্ধ হবে, স্বচ্ছ আরশির মতো শান্ত হয়ে আসবে ধীরে ধীরে, গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্ব'লে পুড়ে ছাই হবে বর্ষা-শরৎ, পশু আর মানুষের মিলিত শবে আবার উর্বরা হবে বসুন্ধরা। সবুজ হবে না মাটি। আকাশ নীল নয়, মেঘ নেই আকাশে।

এমনি একটা ভয়াবহ দৃশ্যের কথা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে পারলো কল্যাণ। এবং অবাক হলো, এতোটুকু তার কষ্টকল্পনা নয়। প্রত্যক্ষত সত্য, যেন সামনে ছায়াছবির পর্দায় দৃশ্যমান কোন ঘটনা।

সারা অফিস জুড়ে একটা ভয়ঙ্কর চাঞ্চল্য, চারদিক থেকে টেলিপ্রিণ্টারে খবর আসছে, সাব-এডিটররা শুধু অনুবাদ ক'রে যাচ্ছেন। সঙ্কট মুহূর্তে ছুটি বাতিল-করা সৈনিকরা যেমন যুদ্ধ-বিরতি সীমা-রেখার তাবুতে ফিরে আসে তাদের মতো দুপুরের ডিউটি নয় এমন অনেকেই এসে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ঘন ঘন প্রুফ আসছে প্রেস থেকে, সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের পর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কলিং বেল বাজছে এ'খানে ও'খানে, বেয়ারা আর্দালি ছুটোছুটি করছে দ্রুত, এডিটর, নিউজ-এডিটর, চিফ-রিপোর্টার অ্যাসিষ্টেট-এডিটর, নোট, ফাইল, টেলিফোন—এমন কি বিকেলের দিকে বিশেষ সংস্করণ টেলিগ্রাম বেরোতে পারে একটা। চাবদিকের এই ব্যস্ততা আর কর্মকোলাহল কল্যাণকে আজ যেন কেমন নির্জীব, নিরাসক্ত, উদ্যমহীন ক'রে তুলেছে। আলোর চেয়েও দ্রুততর গতিতে তার চারিদিকে যেন ছুটছে সৌরজগতের নক্ষত্রপুঞ্জ এ'দিক থেকে ও'দিক, আর সে সর্বশক্তিমান সূর্য নয়, কক্ষচ্যুত আকর্ষণছিন্ন একটি নক্ষত্রমাত্র। সমস্ত পৃথিবীই যেখানে এক চরম সঙ্কটময় পরীক্ষার মুখে, 'প্রভাকর' পত্রিকার অফিস তার একটা ক্ষুদ্রতম সংস্করণ মাত্র। উত্তরসাগরের স্রোতে বরফের পাহাড় নেমে আসছে আটলান্টিকের উষ্ণতায়, তোলাপাড় হ'বে পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্ত, নোয়ার প্লাবনে ভাসবে খৃষ্টের জগত, তুষার গলছে হিমালয়ের, দেবাদিদেবের জটাভার উন্মোচিত আজ, ব্যর্থ ভগীরথের সাধনা। মহাপ্লাবনে ভাসবে পৃথিবী। হিংসার পদভারে কম্পিত আজ বুদ্ধের জন্মমৃত্তিকা। ব্যর্থ যিশু, ব্যর্থ বুদ্ধ। ইতিহাসের হতভাগ্য দুই ব্যর্থ পুরুষ।

কল্যাণ পাশের দেয়ালে টাঙানো বড়ো মানচিত্রটার দিকে তাকালো। আটলান্টিকের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ, হিমালয়ের ধ্বস, পশ্চিম ও পূর্ব, আবিশ্ব মহাপ্রলয়—তাকালো সামনের ক্যালেণ্ডারের দিকে উনিশ শ' বাষট্টি খৃষ্টাব্দ, অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। যদি টিকে

থাকে মানুষের সভ্যতা, সৃষ্টি ও কীর্তি, স্বপ্ন ও সাধনা, ভবিষ্যতের ইতিহাস স্মরণে রাখবে এই রুদ্ধশ্বাস দিনগুলি, রাতগুলি। কল্যাণ ওর শিরায় শিরায়, মাথার স্নায়ুতে চাপ অনুভব করলো। মনে হলো, মানচিত্রের ওই নদী আর সমুদ্রের বর্ণের মতো ওর দেহের রক্তও যেন নীল হয়ে আসছে—অস্থিরতায়, আতঙ্কে, ভাবনায়। আর মানচিত্রের শরীরে দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশের রেখাগুলি যেন কোন কল্পিত রেখা নয়, ওর শিরা উপশিরার মতোই যেন কাঁপছে, অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে ধরিত্রীকে চঞ্চল ক'রে, অস্থির ক'রে তুলছে।

টেবিলের উপর বাঁ-হাতের কনুই-এর ভর রেখে এবং বাঁ-হাতের তালুতে মাথার বাঁ-দিক সমর্পন ক'রে কল্যাণ তাকিয়ে রইলো পৃথিবীর দিকে। অসংখ্য বর্ণে বহুধা পৃথিবী অথচ এই বর্ণসমষ্টির মধ্যে উজ্জলতম, প্রিয়তম, আমার রক্তের রঙে রাঙানো এক দেশ, আমার আত্মার অংশ, আমার জন্মের শিকড়, আমার ভারতবর্ষ জননী জন্মভূমিশ্চ ···স্কুল বয়সে বাংলা রচনায় বহু ব্যবহৃত সেই শ্লোকটা যেন আবার নতুন ক'রে মনে মনে আবৃত্তি করলো কল্যাণ। এই পবিত্রভূমির প্রতি ধূলিকণা আমার অস্তিত্ব, আমার স্বেদ[illegible] আমার রক্তবিন্দু, আমি একে ভালোবাসি, ভালোবাসি। ভালোবাসি আমার সুখের মতো, তৃপ্তির মতো, তৃপ্তি যার জন্ম দেবে সেই অনাগত বংশস্রোতের মতো, আমার আদর্শের মতো—আদর্শ।

হঠাৎ চৌরঙ্গির সেই প্রকাণ্ড স্কাই-স্ক্র্যাপার বাড়িটার কথা মনে পড়লো। যার পাশে আজ প্রায় বৎসরাধিককাল আকাশ-উঁচু একটা ক্রেন পড়ে আছে। যার দিকে তাকিয়ে কল্যাণ বিস্মিত হতো। আজ কিন্তু সেই প্রাসাদটাই ক্রেনটার উচ্চতাকে ছাপিয়ে গেছে। ম্যানসনটার দিকে তাকিয়ে একদিন মনে হয়েছিলো—বাইরের বাঁশের মাচায় বসে সতেরো আর আঠারো তলার মধ্যবর্তী দেয়ালে যে মিস্ত্রিটি বসে বসে প্লাসটার দিচ্ছে, ঠিক এই মুহূর্তে সে কি

ভাবছে! সাতশ-আটশ সহকর্মীর ভিড়ে সে অনায়াসে কাজে ফাঁকি দিতে পারে। কিছু আসবে-যাবে না। কিন্তু যদি প্রাণান্ত হয়ে শরীরের রক্ত মিশিয়ে দেয়, যদি কয়েক শ' ফুট উপর থেকে পড়েই যায় নীচে, কি হবে? কিছুই না। এ বাণিজ্যভবন উঠবে। সেখানে সাতশ মানুষ অপরিহার্য, একটি একক মানুষ নগণ্য। কল্যাণ যেন হঠাৎ তার সেই ভাবনায় রাজমিস্ত্রির সঙ্গে নিজের একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলো। 'প্রভাকর' পত্রিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক এমনি নৈর্ব্যক্তিক। তাকে বাদ দিয়ে এ পত্রিকা চলবে কিন্তু সমস্ত কর্মপ্রবাহের সঙ্গে বা এই পত্রিকার কার্যসূচীর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে সে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। সে একা এবং ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ। কেন না, আমার বিশ্বাস, আমার প্রত্যয়, আমার দায়িত্ব—আমি, আমি শ্রীকল্যাণ মুখোপাধ্যায়, যে এতোকাল ধ'রে একটা শক্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে থেকে জীবনের এতোটা পথ পেরিয়ে এসেছি সেই আমাকেই আজ নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে। কল্যাণের মনে হলো, সে নিজেই যেন আজ ভারতবর্ষ! বেদ-উপনিষদের অতীত থেকে যে হিমালয় আমার কল্পনার অধীশ্বর, আমার পুরাণের নায়ক, আমার দেবতা, আমার শিব, সেই হিমালয়ের ধ্বস নামছে আজ। আমার লালিত বিশ্বাসকে সে আঘাত ক'রে চুরমার করতে উদ্যত।

কল্যাণ ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠলো। যেন অজান্তেই টেবিলের উপর বেল টিপে বসলো। সামনে এসে দাঁড়ালো হরি। কল্যাণ ছোট একটা কাগজে নোট লিখলো সম্পাদক ভবতোষবাবুর কাছে। মিনিট পাঁচেকের সাক্ষাতের জন্য দর্শনভিক্ষা। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা আমন্ত্রণ এলো। দ্বার উন্মুক্ত।

বিরাট দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকবার পথেই প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা। বিনোদদা, বিনোদ লাহিড়ি।

'আরে কল্যাণবাবু, এই যে আপনি। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

বিনোদ লাহিড়ির চোয়াল ভাঙা গালে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।
'কেন।'
'আর কেন, মাথা সব গোলমাল ক'রে দিচ্ছে মশাই। চারদিকে কি সব শুনছি, শুনলাম আজকেও কি নাকি একটা রাক্ষুসে খবর এসেছে। টেলিগ্রাম বেরোবে।'
'বেরোতে পারে – ' কল্যাণ হাসলো—'আচ্ছা, আপনি যান। আমি সময় হলেই ডেকে পাঠাবো আপনাকে।'
ভিতরে ঢুকে কল্যাণ দেখলো, এই কর্মব্যস্ত অফিসে ভবতোষবাবু নির্বিকার। যেন ঘরের বৈঠকখানায় বসে মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছেন।
'ভদ্রলোক কে বলুন তো।' ভবতোষবাবু তার ভারি চশমাটা টেবিল থেকে চোখে তুলে নিলেন।
'বিনোদ লাহিড়ি। অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট সেকসনে কাজ করেন।'
'এ স্ট্রেঞ্জ ফেলো—'
হ্যাঁ, যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন বুঝি।'
'হ্যাঁ, আর কি চোখমুখের অবস্থা। কল্যাণবাবু, আমি এ'রকম একটা জীবন্ত যুদ্ধভীতি কখনও দেখিনি।'
'হ্যাঁ, এটা একটা রোগ। ট্রামে-বাসে, রাস্তাঘাটে, অফিসে সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন, আলোচনা করবেন। যদি কেউ বলে—যুদ্ধ-ফুদ্ধ বাজে কথা, ওসব হবে না। ব্যস, খুব খুশি। আর যদি কেউ উল্টো কথা বলে তো সর্বনাশ। যা মুখে আসবে তাই বলে—' কল্যাণ হাসতে হাসতে একটা চেয়ারে বসলো—'এমনিতেই আধ-পাগলা। এবার লোকটা সত্যি পাগল হয়ে যাবে।'
'কিন্তু আমি কি বলবো বলুন তো, কাল থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। প্রথম ভেবেছি, চাকরি-সংক্রান্ত বুঝি। পাঠিয়ে দিয়েছি সতীশবাবুর কাছে। কিন্তু নাছোড়বান্দা, আজ আমার বাড়ি গিয়ে হাজির। বলেছি অফিসে দেখা করবেন। কিন্তু আমি কি বলবো, কি বলে সান্ত্বনা দেব।'

'সে কি--' কল্যাণ সোজা হয়ে বসলো—'কিন্তু আমিই যে আপনার কাছে সান্ত্বনা পেতে এসেছি।'

'আমি জানতাম, জানতাম—দেয়ার ইজ অ্যাট্ লিস্ট ওয়ান ম্যান হু উইল কাম টু মি। কিন্তু আমি কি দেব আপনাদের? দেখছেন তো, আমি নিজেই পায়ের ওপর পা তুলে চুপটি করে বসে আছি।'

সমবেদনায় চুপ করে বসে রইলো কল্যাণ।

ভবতোষবাবু বললেন—'আমি নাবালক মুঘল সম্রাট কল্যাণবাবু। দেশের সঙ্কট সময়ে রাজ্যভার বৈরাম খাঁর হাতে। আপনারা তাঁর ক্রীতদাস।'

কল্যাণ টেবিলের ওদিকের মানুষটার দিকে তাকালো। চৌরঙ্গির স্কাই-স্ক্র্যাপার তৈরির কারিগরের মতো আরও একজন। আস্তে আস্তে বললো—'কিন্তু চারিদিকে দেখছেন, গোটা দেশ জুড়ে কি সুরু হয়েছে। দেশের শিক্ষিত পণ্ডিত মানুষেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য কি তাণ্ডব সুরু করেছে। চালের দর থেকে দেশের সংস্কৃতি পর্যন্ত একটা অরাজকতা।'

ভবতোষবাবু হাসলেন—'আমাদের পিতৃপুরুষের দেবালয়ে দেবদাসীর বাণিজ্য। মেতে যান আপনিও। পুরস্কার পাবেন।'

'কি বলছেন আপনি!'

'অবাক হচ্ছেন?'

কল্যাণ নিস্তব্ধ।

'আপনার চাইতে আমি বেশ কয়েক ধাপ উঁচুতে বসে আছি কল্যাণবাবু। আমি আমার বেদনাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পারি। কিন্তু আপনাদের পক্ষে সেটা অনেক মারাত্মক হতে পারে।'

ভবতোষবাবু অদ্ভুত ভাবে হাসলেন।

'অন্য কোন তৃতীয় পথ নেই।'

'কি? বিবেকরক্ষার?'

'হ্যাঁ।'

'নেই।'

'নেই?'

'না।'

না! একটিমাত্র শব্দ। কিন্তু কল্যাণের সমস্ত অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে কথাটা চারিদিকে কেঁপে কেঁপে উঠলো। আরও দীর্ঘ নীরবতার পর আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়ালো সে। বিনোদ লাহিড়ির চেয়ে আরও বিপন্ন বোধ করলো নিজেকে। আরও অসহায়। নিজের চেয়ারে ফিরতেই হবে, অফিসের কাজ। তারপর হাসপাতাল—অমিত। তারপর বাড়ি—তৃপ্তি। অমিত, তৃপ্তি। জীবনের দুই প্রান্ত। আমি, আমি অসহায়, বিপন্ন। উপরে ওঠার সিঁড়িতে পা রেখেই মনে হলো, সে ভীষণভাবে ক্লান্ত, সে টলছে। মনে পড়লো, চৌরঙ্গির সেই বাড়িটার সেই কম্পিত রাজমিস্ত্রিকে—সৌধ গড়ছে সে কিন্তু হাজার ফুট উঁচু বাঁশের মাচা থেকে যে পড়ে যেতে পারে এবং যে কোন মুহূর্তে।

ছত্রিশ

রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা আর মৃত্যুই যদি ইঁট-সুরকি কংক্রিটের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মরবে প্রতিদিন তবে এতো সুন্দর হয় কেন হাসপাতালের পরিবেশ। বিরাট বিরাট ম্যানশন, প্রাসাদ ইতস্তত সাজানো বাগান, পাম গাছের সারি, সবুজ গাছ, ফুল। প্রচুর আলো, প্রচুর বাতাস। ছোটো একটা উপনগরী বলা যায় একে। দোতলার একটি রেলিং-এ দাঁড়িয়ে বিকেলের আলোয় পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল দেখছিলো কল্যাণ। স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে নিসর্গ দেখার মতো। দমকা বাতাস আছড়ে পড়ছে গায়ে, সিগারেট পুড়ছে হাতে। সে যেন ভাবছে ভাবছে হাসপাতালের পরিবেশ

মনোরম হ'বার একটা কারণও খুঁজে পেলো হঠাৎ—এখানে মানুষ জীবনকে ফিরে পেতে চায়। রোগ-তাপ-মৃত্যু থেকে মুক্তি চায় ব'লেই জীবনের মতো সুন্দর ক'রে সাজাতে চায় একে।

তবু প্রচুর বাতাসে শরীরে যখন স্নিগ্ধতা, বুকের ভিতরে দাবদাহ। একরাশ যন্ত্র-পাতির মধ্যে ডুবে থেকে, 'অক্সিজেন' টেনে টেনে কোনমতে টিকে আছে অমিত। ডাক্তারের মুখে অনেক চেষ্টাতেও কোন আশ্বাসবাণী আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। বন্ধুরা উদ্বিগ্ন, শেষ পরিণতির জন্য উৎকণ্ঠ। মৃত্যুর সঙ্গে সোজাসুজি পাঞ্জা লড়বার পণ নিয়ে কয়েকটি যুবক সমবেত হয়েছি একজন মুমূর্ষু বন্ধুর চারপাশে। অথচ যার আত্মপীড়নের সাধনা, যার প্রতিদিনের জীবনযাপনকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করেছি, তারই জন্য জীবনভিক্ষা চাইতে এসেছি ডাক্তারের কাছে, অমিতকে সত্যি আমি আর আগের মতো ভালোবাসি কিনা—যে উত্তরহীন প্রশ্নের কাছে আমি নিজেই নিরুত্তর আজ সেই প্রশ্নই বিরাট একটা জিজ্ঞাসা হয়ে হাসপাতালের চারদিকে তার রমণীয়তায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিবেশ আমাকে প্রীত করে কিন্তু যার জন্য এখানে আসা সেই মানুষ, অর্থাৎ অমিত অথবা অমিতের মৃত্যু-যন্ত্রণা আমাকে পীড়িত করে, অসহ্য মনে হয়।

শাদা-অ্যাপ্রনে দু'জন নার্স হেঁটে যাচ্ছিলো সবুজ ঘাস মাড়িয়ে। নীচের দিকে চোখ ফেলতেই কল্যাণ ওদের দেখলো। যেন অকারণেই তাকিয়ে রইলো। একটু একটু ক'রে দূরে, আরও দূরে, একেবারে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেন যে অন্যদিকে চোখ সরলো না নিজেই জানে না। অসংখ্য চিন্তা বিক্ষিপ্তভাবে এলোমেলো হয়ে মস্তিষ্কের শিরায়, স্নায়ুতে ঘুরছে ফিরছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোন সমস্যারই সমাধান নেই অথচ সব মিলিয়ে একটা দুর্বোধ্য এবং দুর্বহ স্নায়ুপীড়া মনকে ক্লান্ত করেছে, অস্বস্তিতে ভার হয়ে আছে সমস্ত শরীর।

অথচ এই অমিতের জন্য আরও একবার অন্য এক হাসপাতালে এসে

ভিড় করেছিলাম আমরা বন্ধুরা। সেটা অন্যদিন, অন্য অমিত। কল্যাণ আবার ওর স্মৃতিচারণে ফিরে গেলো। সেদিন বীরের পাশে গুণগ্রাহীর মতো দাঁড়িয়েছিলাম। শ্রদ্ধায়, অনুরাগে, ভালোবাসায় আকুল হয়ে উঠেছিলাম। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কাতর স্বরে বলেছিলো অমিত—'মরতে শেখ। মরতে না জানলে খাঁটি খাঁটি মানুষের মতো বাঁচা যায় না।' এই কি মরতে শেখা? 'আজ দীর্ঘকাল পরে সেই অমিতের কাছেই যেন প্রশ্নটা তুলতে চাইলো কল্যাণ। সেদিনের সেই দামাল ছেলে আজ পতঙ্গের মতো অন্যায়ভাবে ধুঁকতে-ধুঁকতে মরছে। এ-ও মৃত্যুর সাধনা।

একটু আগে যেখানে দু'জন নার্সকে হেঁটে যেতে দেখে ভালো লেগেছিলো, সেখানে তাজা সবুজ ঘাসের আস্তরণ দেখে মুগ্ধ হলো কল্যাণ। সযত্ন লালিত বাগান, বিস্তর ফুলের গাছ, থরে থরে ফুল। কিন্তু চিন্তাস্রোত ঘুরে ঘুরে পাক খায় অসংখ্য যন্ত্র-পাতির মধ্যে নিমজ্জিত রুগ্ন, জ্ঞানহীন অমিতের চারদিকে। শরীরে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, লিভার নাকি একেবারেই পচে গেছে। এর পর আরোগ্য মানেই অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুকে চরমসত্য ব'লে মেনে নেবার আগে কিছুদিন দু'চোখ খুলে পৃথিবীকে দেখে নেবার সুযোগ।

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে মৃত্যু কি সত্যি অমোঘ? অন্যথা নেই? তেত্রিশ কি চৌত্রিশের কোঠায় পা দিয়ে এমনি কীট-পতঙ্গের মতো অন্যায়ভাবে মরতে হ'বে অমিতকে—এই কি লেখা ছিলো ওর ভাগ্য-নামক অদৃশ্য ব্যাপারটায়? একথা মনে করতেই যেন হাসি পেলো কল্যাণের। দুর্বোধ্য চরিত্রের অমিতকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। সুস্থ থাকলে এবং কথা বলার শক্তি পেলে এই অমিতই হয়তো তর্ক ক'রে প্রমাণ করতে চাইবে—ঠিকুজি-কোষ্ঠির ছকেই মানুষের ভবিষ্যৎ। সে মরছে কেননা তাকে মরতে হবে এবং এখনই, হয়তো আজই, এই মুহূর্তে। দুর্বল হলে এবং নিজের উপর

বিশ্বাস হারালে মানুষ যে কোথায় তলিয়ে যেতে পারে, অমিতের চরম অধঃপতনই যেন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনে হলো। অথচ স্থির বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়েই সে তার অনাস্থা জানাতে পারে এই অন্ধ সংস্কারের উপর। অমিতের আয়ু ছিলো ষাটের কোঠায়, কেননা তার যৌবন ছিলো, অটুট স্বাস্থ্য ছিলো। এ মৃত্যু অপমৃত্যু, এক ধরনের আত্মহত্যা। অমিতের মৃত্যুই কি এই বাংলাদেশের, কিংবা যদি যুগের দোহাই দিতে হয়, তবে এযুগের একমাত্র সত্য ?

একটি শিশুর নির্মম মৃত্যু দেখেছিলাম একদিন। অনেক দিন আগে 'থার্ডইয়ার' কি 'ফোর্থ ইয়ারে' পড়ি। কল্যাণ ওর স্মৃতি খুঁড়ে আবার সেই মর্মান্তিক দৃশ্যকে অনুভব করতে চাইলো। তখন বিকেল চারটে কি পাঁচটা হবে, কর্নওয়ালিস-বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে রাস্তা পেরোচ্ছিলো কোনো এক অবোধ দুরন্ত শিশু। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটি গাড়ি। ভিড় জমলো, কিল-চড় ঘুসিতে আধমরা হলো ড্রাইভার এবং পুরোপুরি ভাবে শিশুটি থেঁৎলে গেলো চাকার তলায়। রক্তাক্ত হয়ে রইলো রাস্তা। সেই অমানবিক এবং ভয়ংকর দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিলাম এবং এরই মধ্যে স্পষ্ট দেখেছিলাম গাড়ির গায়ে জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছে 'রেড-ক্রসে'র লাল প্রতীক। অ্যাম্বুল্যান্সের গাড়ি, মানবতার ঘোষণা তার অঙ্গে। সত্য সেই মৃত্যু, সত্য সেই প্রতীক। সে দিনের সেই দৃশ্যের পর আজও তো সভ্যতাকে অভিশাপ দিইনি কোনদিন। হাজার হাজার মৃত্যু, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কান্না, হতাশা, নৈরাশ্য, দুঃখ, বেদনা, লজ্জা-গ্লানি, রোগ-শোক-তাপ, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর আজও তো মানুষ ইমারত গড়ে, বাঁধ বাঁধে, বিজ্ঞানে গবেষণা চলে, সন্তানের জন্ম দেয়। কল্যাণ ওর সাংবাদিক জীবনের চারপাশে একটি আর্ত পৃথিবীকে দেখতে পেলো। যে পৃথিবীর এক প্রান্তে মানুষের স্বপ্ন আর কল্পনা, অন্য প্রান্তে বিভীষিকা। যে গভীর সংকটের কথা ভেবে

আণবিক সন্ত্রাসে আতঙ্কিত মানুষ আজ পীড়িত। অথচ সেই সভ্যতা গড়েছে মানুষ, মানুষ জীবন নামক একটি সুদৃশ্য ইমারতের নিপুণ স্থপতি। এই পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড ক'রে, কোটি কোটি অংশে ভাগ ক'রে তার এক পরমাণুতুল্য ভগ্নাংশে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি, আমরা ভাবছি, অমিতের কথা। কিন্তু কতোটুকু সত্য অমিতের এই নৈরাশ্য অথবা মৃত্যুকে অনিবার্য মনে ক'রে তিলে তিলে দগ্ধ হবার সাধনা। এই যদি মহৎ সত্য হবে তবে কতোখানি সত্য এ সংবাদ, কতোখানি তার সার্থকতা—তৃপ্তি মা হবে এবং সেই শিশু পৃথিবীতে নিজের জীবনের, নিশ্বাসের অধিকার চাইবে। তবে কি আমিই অন্যায় করেছি? আমি, তৃপ্তি? মূর্খের মতো এই ক্লান্ত পৃথিবীতে সন্তানের জন্ম দিতে চেয়েছি ব'লে? কল্যাণ যেন অতর্কিতভাবে আতঙ্কিত হলো ভিতরে ভিতরে, ওর রক্তের তিরস্কারে। তাই যদি হ'বে তবে এতো কাড়ি কাড়ি বয়স হলো মানুষের, মানুষের ইতিহাসের, কেন পাপ ব'লে ঘোষিত হলো না এ জন্মদান? কেন অপরাধের শাস্তি পেলেন না আমাদের পিতৃপুরুষ?

হঠাৎ তৃপ্তির প্রশ্নে কম্পিত হলো কল্যাণ। দুপুরে বলেছিলো, শরীর ভালো না। অথচ এখনও সে এখানে, হাসপাতালে। কল্যাণ ওর পকেট থেকে রুমালটা বের ক'রে কপালটা মুছলো একবার। সিগারেটের প্যাকেট বের করলো এবং দেশলাই। হঠাৎ পিঠে হাত পড়তেই ফিরে তাকালো—'কি রে, কখন এলি?'

'এখনই। একটা সিগারেট দে।'

প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো কল্যাণ—'এতো দেরি হলো যে।'

'সাড়ে তিনটেয় একটা ক্লাশ ছিলো। তারপর স্টাফ-কাউন্সিলের একটা জরুরি মিটিং—' একটা সিগারেট তুলে নিয়ে কল্যাণের হাতের আগুনে প্রেমাংশু ওর সিগারেট জ্বালালো—'তাছাড়া মফস্বলের কলেজ। ট্রেনে হোক, বাসে হোক, এখানে আসতে মোট দেড় ঘণ্টা।'

কল্যাণ ওর নিজের সিগারেট ধরাতে ধরাতে ছোট একটু শব্দ করলো—'হু।'

'কল্যাণ—'

'বল—'

প্রেমাংশু মুখটা এগিয়ে এনে ফিস্ ফিস্ গলায় এবং উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করলো—'কি মনে হয় তোর, বল তো।'

আঙুলের ইশারায় ডানদিকের বড় হলঘরটা দেখাতে চেষ্টা করলো প্রেমাংশু। তা না হলেও কল্যাণ বুঝতো। একটু চুপ ক'রে থেকে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট নিয়ে আঙুলে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের ভাষায় বললো—'কি ক'রে বলবো। নাথিং হোপ্‌ফুল।'

'তুই কি এসেই দেখছিস এ অবস্থা? কতোক্ষণ সেন্সলেস?'

'না, আমি তো পৌনে-পাঁচ কি পাঁচটায় এসেছি। শুনছি তো আড়াইটা থেকে এ রকম—'

'আড়াইটা!' প্রেমাংশু দ্রুত একবার নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো—'চার ঘণ্টা ধ'রে এই 'টেনশান?'

'হুঁ—' কল্যাণ কথা বললো না। শুধু একটি অব্যয়োচ্চারণে মন্তব্য শেষ ক'রে সেই বিষণ্ণ দেয়ালের দিকে তাকালো।

সামনে সুবিস্তীর্ণ এবং দীর্ঘ করিডর। পুজোর বাসনের মতো ঝকঝকে এবং পরিচ্ছন্ন সাদা দেয়াল একদিকে, অন্য দিকে রেলিং এবং থাম। একটি-দুটির পর বাঁ-দিকের থামগুলি একাকার হয়ে একটি দেয়াল হয়ে উঠেছে, পায়ের তলায় মসৃণ মেঝে। নির্জন এবং থমথমে অলিন্দের এক কোণে, কল্যাণ আর প্রেমাংশু থেকে কিছু দূরে একদল যুবকের জটলা। সবাই বন্ধু, অমিতের এবং পরস্পরের। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া টানলো দু'জন।

তারপর প্রেমাংশুই খুব চাপা গলায় বললো—'লোকেমের দিকে আর

তাকানো যায় না। অমিত ভালো হয়ে উঠলেও বোধ হয় ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে।'

'হুঁ—'

'নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। উঃ, কি ভীষণভাবে একটা লোক আরেকটা মানুষের জন্য খাটতে পারে। এটা কি শুধু বন্ধুত্ব? সামথিং মোর।'

'আর ওই বুড়ো-বুড়ি! খোঁড়াতে খোঁড়াতে রোজ আসে। সময় হয়েছে, এক্ষুনি আসবে।' কল্যাণ প্রেমাংশুর দিকে তাকালো।

ওঁদের কাছে অমিত কোথাকার কে। অমিতটাকে সত্যি-ভালোবাসে ওরা দু'জনে।'

'পৃথিবীতে ভালোমানুষ এখনও আছে, আর মানুষে মানুষে ভালো সম্পর্ক—'

'সত্যি, এর পরেও অস্বীকার করে কার সাধ্যি?'

দু'জনেই চমকে উঠলো। দূরে হল থেকে ছুটে এসে কি বললো একটি নার্স। বন্ধুরা ত্রস্ত হয়ে উঠলো, লোকেন বসেছিলো, হঠাৎ তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে ছুটলো ভিতরের দিকে। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ব্যস্ত হয়ে পায়ের তলায় সিগারেট মাড়িয়ে কল্যাণ আর প্রেমাংশুও ছুটলো পিছে পিছে। একের পর এক সারিবাঁধা রোগীর শয্যা পেরিয়ে একেবারে কোণে দু'টো লাল পার্টিশান দিয়ে ঢাকা যে বিছানা, সেখানেই অমিত। তিনটে থেকে ওকে নিয়ে লড়াই চলছে ডাক্তার, নার্সের। ডক্টর-ইন-চার্জ ডেকেছেন সিনিঅরকে এবং তখন থেকেই অক্সিজেন-ইন্‌জেক্‌শান ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সব কল্যাণ জানতো এবং এরই পরিণতির জন্য বাইরে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা।

তাস উপুড় করার আগে জুয়ার টেবিলে ঝুঁকে-পড়া জুয়াড়ির মতো অমিতের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে চেয়েছিলো মানুষগুলি কিন্তু কল্যাণ প্রেমাংশু কাছে যেতেই থমকে দাঁড়ালো। বাজখাই গলায়

ফেটে পড়েছেন সিনিঅর—'কুইট, কুইট, প্লিজ কুইট, ইট ইজ আওআর বিজনেস। হোআট ডু ইউ ওয়াণ্ট? রেসপেক্ট টু ইয়োর সেন্টিমেণ্ট অর দা লাইফ টু দিস্ ডেড ম্যান? সিস্টার আপনাদের খবর দিয়েছে ওর জ্ঞান ফিরেছে কিন্তু আপনাদের আসতে বলেছে কে। যান, বাইরে যান, ইট ইজ ডিস্টার্বিং।' গুটি গুটি পায়ে মাথা নুয়ে ফিরে এলো সবাই। কেউ দেখতে পেলো না, অমিত চোখ খুলেছে কিনা।

বাইরে এসেই লোকেন আকুল। যুক্তিহীন শিশুর মতো নির্বোধ—'ওকে ওরা লাল পর্দা দিয়ে ঘিরেছে কেন?'

লোকেনকে ধরলো সুনীল আর অনিমেষ—'ও কিছু নয়। তুই একটু বোস তো। শান্ত হ।'

'না তোরা বলছিস না কিছু।'

'অক্সিজেনের নল-টল, ইন্‌জেকশান, এতো ডাক্তার নার্স, অন্য রোগীকে দেখে ভয় পাবে তাই।'

'দেখছিস না, এতোক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরেছে।'

'ভয় নেই। সেরে যাবে, ভালো তো হচ্ছে আস্তে আস্তে।'

লোকেন কাঁদছে, সবাই লক্ষ্য করলো। সকলের পিছনে ছিলো কল্যাণ, এগিয়ে এলো সামনে। একেবারে লোকেনের মুখোমুখি—'লোকেন।'

অদ্ভুত গম্ভীর শোনালো কল্যাণের কণ্ঠস্বর। সকলেই চমকে তাকালো। চোখে চোখ রেখে তাকাতে চাইলো কল্যাণ। কিন্তু এক মুহূর্তে জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন বালকের মতো অসহায়ভাবে কল্যাণকে দু'হাতে জড়িয়ে হু হু ক'রে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো লোকেন। কল্যাণ ভার সামলাতে পারলো না। সবাই ধরলো।

এবং সকলে নিঃশব্দে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চারদিকে। মেঝেতে হাঁটু ভেঙ্গে ব'সে লোকেন কাঁদতে লাগলো। এ কান্না ওর বহুদিন ধ'রে জমেছে ভিতরে।

দীর্ঘ সময়ের এই অস্বস্তিকর পরিবেশ এবং এই রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ভাবনা কাটানোর পর সিনিঅর ডাক্তার নিজেই বেরিয়ে এলেন হল থেকে, সঙ্গে দু'জন ডাক্তার, একজন নার্স। সবাই এক লাফে ছুটে গেলো সেদিকে।

স্বাস্থ্যে, দৈর্ঘ্যে রীতিমতো ডাকসাইটে পুরুষ মেজর কে, কে, গাঙ্গুলি। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। পকেট থেকে চুরুট বের ক'রেই বাইরে এসেছিলেন, 'সেলোফেন' কাগজের মোড়ক খুলতে খুলতে সকলের সামনে দাঁড়ালেন—'ভাববার মতো তেমন কিছু তো দেখছি না তবে 'ইট ইজ ওঅন অব দা মোস্ট ডেলিকেট কেসেস্ নাউ এক্সিস্টিং ইন দিস হস্পিটাল।'

লোকেনও উঠে এসেছিলো। কাঁপতে কাঁপতে বললো—'ও বাঁচবে তো স্যার।'

'বললাম তো, আমরা চেষ্টা করছি, আশাও রাখি। তবে--' মেজর গাঙ্গুলি তার চুরুট তুললেন ঠোঁটের কাছে—'যম ঠাকুরের কাছ থেকে চড়া দামে কিছু দিনের জন্যে ওর জীবনটা ভাড়া পেতে পারেন। ফর এ শর্ট পেরিঅড, মাইণ্ড ইট। খুব শিগ্‌গিরই আবার ওটা ফিরিয়ে দিতে হবে। কেন বাঁচবে? ও তো বাঁচতে চায়নি, আপনারাও তো বাঁচাতে চান নি। নইলে, নইলে · হোআট আই ক্যান সে। বেটার লিভ্ ইট, আফটার অল্ আই আম এ মেডিক্যাল ম্যান, নট এ মর‍্যাল প্রিচার।'

যেন সক্ষোভেই চুরুটের উপর দাঁতের কামড় বসালেন মেজর গাঙ্গুলি। জোড়া কাঠিতে আগুন ধরিয়ে চুরুটে ধোঁয়া তোলার আগে পর্যন্ত কড়া হেডমাস্টারের সামনে অনুগত এবং ভীত স্কুল বালকের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সবাই। অধ্যাপক, সাংবাদিক, স্কুল-শিক্ষক, কেরানী কারও মুখে কোন কথা নেই।

ভরাট গালে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মেজর গাঙ্গুলি তাঁর ভারি পা-টা এক কদম বাড়িয়েই আবার থামলেন—'ইয়েস, ফিউ আরজেন্ট টক্‌স,

প্রচুর টাকা লাগবে এখনও। ভেতরে যারা আছেন, ওঁরা এক্ষুনি আপনাদের একটা প্রেশক্রিপশান দেবেন। ও'গুলো কিনে দিন আর রক্ত দিতে হবে। ম্যানেজ ইট।'

'ডাক্তারবাবু, আমার রক্তে হবে।'

মেজর গাঙ্গুলি তাঁর পুরু চশমার ফাঁকে লোকেনের দিকে তাকালেন এবং ভারি মুখে একটা ঈষৎ দৃশ্যমান হাসি ফুটিয়ে বললেন—'পারহ্যাপস্ মেডিক্যাল সায়েন্স উইল রিজেক্ট ইউ। উই ক্যান নট কিল ওঅন অ্যাট দা কস্ট অব অ্যানাদার। তাতে কি, আপনারা এতোগুলো ইয়ংম্যান রয়েছেন ডোনেট করুন। নইলে কিনে দিন। নো, ইট ইজ বেটার টু ডোনেট, ইন ছ্যাট কেস, ইট উইল বি সেভড ফর আদার।'

সবাই চুপ।

'কাম ফরওঅর্ড। নো নো, ইট ইজ নট ফর দা নেশান, ফর ইয়োর ফ্রেণ্ড। হি পয়জন্ড হিস্ ব্লাড, ইউ যাস্ট ডোনেট। ভগবানের পৃথিবীতে একটা ব্যালেন্স থাকুক।'

একদিকে একদল অপমানিত মানুষ, অন্যদিকে মাত্র একজন। সকলেই নিঃশব্দ।

'আপনি, আপনি, আপনার তো বেশ ভালো স্বাস্থ্য। আপনি দিন না।'

'আমি?'

'হ্যাঁ আপনি।'

দীনেন সকলের দিকে তাকালো এবং দেখলো সকলেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

লোকেন আবেদনের সুরে বললো—'দে দীনেন, নইলে অমিত বাঁচবে না।'

দীনেনের দ্বিধা আর অকারণ সংশয় আবহাওয়াকে আরও ভারি ক'রে তুললো। অপর পক্ষের বিদ্রূপ এবং কটাক্ষের দংশন আরও তীব্র

হয়ে উঠলো সকলের মধ্যে। পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে সবাই তথাপি নির্বাক।

'আমি দেব।'

সকলেই সচকিত হয়ে কল্যাণের দিকে তাকিয়েছে।

'ইউ!' মেজর গাঙ্গুলি এবার একদলা জমাট ধোঁয়ায় নিজের মুখ আচ্ছন্ন ক'রে হাসলেন—'দেয়ার ইজ অ্যাট লিস্ট ওআন।'

'নো, দেয়ার আর মেনি। কিন্তু—'কল্যাণ এগিয়ে এলো কাছে—' আরও অন্যান্য কতগুলো দিক ভাবতে হয় বলেই সবাই তো সব সময় সব কিছু পারে না। আপনার কথাগুলো শুনছিলাম। মনে হচ্ছে, আপনি একটু ভুল করেছেন। আপনারা যার শুশ্রূষা করছেন, আমরা তার বন্ধু ব'লে মনে করবেন না আমরা ওর মতোই জীবন যাপন করি। যদি ওর কথাই বলেন, তবে বলবো ওর শরীরের অসুখটার খবর আপনারা জানেন কিন্তু ওর চরিত্র, মানুষ হিসেবে ওর পরিচয়, ওর জীবনের টোটাল পারস্‌পেক্‌টিভ আপনাকে জানতে হবে।'

মেজর গাঙ্গুলি বিরক্ত হলেন। অধস্তনের প্রতিবাদের মতোই যেন তার মিলিটারি ব্যক্তিত্ব আহত হলো কল্যাণের কথায়। নিখুঁত বিলিতি কায়দায় কাঁধ কাঁপিয়ে এবং দাঁত থেকে চুরুট নামিয়ে কটাক্ষে তাকালেন—'ইয়েস জেণ্টলম্যান, বাই ভার্চু অব আওয়ার প্রফেসান উই ক্যান নট হেট ম্যান। উই ডক্টরস্‌, সিস্টার্স, মেট্রন অল দা হসপিটাল ওঅর্কস লাভ হুম উই সার্ভ। কিন্তু মানুষ হিসেবেও তো আমাদের একটা মূল্য আছে। মানুষের জীবনের এই অপচয় দেখলে আমরা দুঃখ পাব না? আই রিকোয়াস্ট ইউ টু কাইণ্ডলি মেক হিম আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ছাট লাইফ ইজ প্রেশাস্‌, ইট ইজ এ প্লেজার টু এন্‌জয় লাইফ। উই ফিল্‌ স্যরি, হোয়েন উই ফাইণ্ড ইউ ডাই।'

সাঁইত্রিশ

শরীরে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরলো কল্যাণ এবং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই বিব্রত হয়ে একপাশে স'রে দাঁড়ালো। কেননা ওকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্যই ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা সচকিত চাঞ্চল্য। বিছানায় শুয়ে আছে তৃপ্তি এবং ওকে ঘিরে বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটের মেয়ে-বৌরা গল্প করছিলো, হয়তো দেখতে এসেছিলো তৃপ্তিকে। কল্যাণের ঘরে ঢোকার শব্দেই কারও কারও ঘোমটা দীর্ঘ হলো, যারা খাটে বসে ছিলো তারা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, যারা দাঁড়িয়ে ছিলো তারা ছুটে এসে দরজার ফাঁকে পালালো। শেষ পর্য্যন্ত যারা রইলো তারা দু'জন, শান্তা আর নিধুর-মা। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম করছিলো, ক্লান্ত শরীর বয়ে এনে একটা চেয়ারে ধপ ক'রে বসে পড়লো 'কি শান্তা, কখন এসেছো।'

'সেই সন্ধ্যেবেলা।' কল্যাণকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিলো শান্তা, আবার খাটের একধারে বৌদির শিয়রে বসলো—'আপনাকে এতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন কল্যাণদা। শরীর খারাপ নয় তো?

নিচু হয়ে চুলের গোড়া ধ'রে টানছিলো কল্যাণ। সোজা হয়ে ব'সে বললো—'সন্ধ্যে থেকে ব'সে আছো? ছিঃ এতো রাত অব্দি ঘরে যাওনি, বাড়িতে ভাববেন না। ঝণ্টু কোথায়।

'কোথায় যেন গেছে।'

ওদিকে আলনা গোছাচ্ছিলো নিধুর-মা। বললো—'দাদাবাবু তো বাজারে গেছেন।'

'ঝণ্টু বাজারে কেন?' কল্যাণ অবাক হলো।

'নিধুর-মা তৃপ্তির দিকে তাকালো। তৃপ্তি ফিরে তাকিয়েছে কল্যাণের দিকে। রুগ্ন গলায় বলতে চেষ্টা করলো—'সন্ধ্যে থেকে সমানে

মেয়েরা আসছে। কলেজ থেকে মীরা, সুলতা, সুষমাদি, সন্ধ্যাদি ওরা এসেছিলো। এরপর এঘর-ওঘর থেকে। নিধুর-মাকে পাঠালে তো চলবে না। তাই ঝণ্টু নিজেই সব জোগাড়-যন্তর ক'রে বেরিয়ে গেছে।

অবসাদ আর বিষাদে মলিন তৃপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণ চোখ সরিয়ে নিলো। কেননা পাশেই শান্তা রয়েছে, বোধ হয় অকারণেই, তবু সঙ্কোচ লাগে। অথচ তৃপ্তিকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে আজকাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমের প্রথম পর্য্যায়ের মতো তাকানোর নেশায় তাকাতে ইচ্ছা করে, কথা বলতে ভালো লাগে। কিন্তু বলার মতো কথা যেন ফুরিয়ে গেছে, আজ দু'জনেই কেমন যেন আলাদা মানুষ হয়ে বদলে গেছি অথবা বদলে যাচ্ছি। ক্ষুদ্র সংসারে সাংসারিক জটিলতা নেই তবু কোথায় যেন একটা দুঃখের, বেদনার, পরিতাপের প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব, কথায় কথায় ভাষা হারিয়ে যায়, ভালোবাসায় বিষণ্ণতা আসে, আমরা ক্লান্ত হই। ভাবতে ভাবতে কল্যাণ ওর পাঞ্জাবির আস্তিন গোটানো হাতের দিকে তাকালো।

'হাসপাতালে গিয়েছিলে?'

উঃ—' বাহুতে তুলোর টুকরোটা কখন পড়ে গেছে। কল্যাণ অন্যমনস্ক ভাবে একটা কোনো চিহ্ন খুঁজছিলো। কোথায় গেলো এতো রক্ত আর এক গ্লাস গরম দুধে তার কতোটুকু ফিরলো, কিংবা তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, কয়েক শ সি-সি রক্তের বদলে একটা জীবন কি ফিরবে? মাথা তুলে তৃপ্তির দিকে তাকালো—'গিয়েছিলাম।'

কল্যাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে চাইলো কিন্তু শরীরের ক্লান্তিতে নিজেই বুঝলো কৃত্রিম এবং নকল হাসিটা ধরা পড়তে পারে। তাই দাঁড়াতে হলো, নিখুঁত অভিনেতার মতো আবেগ আনতে চাইলো কণ্ঠস্বরে—'জানো সুখবর, সত্যি সুখবর।'

তৃপ্তি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রইলো শুধু।

'ডাক্তার বললেন, সত্যি বলেছেন, অমিত ভালো হয়ে যাবে। এতো ভালো লাগলো আমাদের। সবাই মিলে, আমরা প্রায় দশ-এগারো জন শ্যামবাজারের একটা দামি রেস্তোরাঁয় সেলিব্রেট করলাম। চিকেন, ওমলেট, রুটি, কফি, সিগারেট।'

'হুঁ—' তৃপ্তি একইভাবে নিরুৎসাহ, নিরাসক্ত। সেই করুণ গলায় বললো—'এখন কেমন আছে।'

কল্যাণ সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো নিজের মিথ্যা অভিনয়ে। তৃপ্তির অনাসক্তিতে দমে গেলো আরও কিছুটা। নতুন ক'রে উচ্ছল হ'তেও কোথায় বাধলো। পুরোনো হাসির রেশ টেনে নেওয়াই উচিত ছিলো কিন্তু ভুল ক'রেই গম্ভীর হয়ে গেছে। শুধু বললো—'ভালো, বেশ ভালো।'

তারপর চেয়ারে এসে বসলো। ওদিকে তৃপ্তিরও অন্য কোন প্রশ্ন নেই। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার মধ্যে কল্যাণ অনুভব করলো এখন সে অনায়াসে এ অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারে, কেন না ঘরে দ্বিতীয় আশ্রয় আছে। নইলে শান্তার কাছে আরও বেশি বিরক্তিকর মনে হবে এ পরিবেশ—'তারপর শান্তা তোমার খবর বলো।'

টুকিটাকি কথার মধ্যে, বিশেষত কল্যাণদার আকস্মিক ছেলে-মানুষিতে শান্তা একটু অবাক হয়েছিলো এবং বুঝেছিলো কোন সূক্ষ্ম জায়গায় একটা কিছু ঘটে গেছে। কল্যাণদা হঠাৎ ওর দিকে মুখ ফেরাতে একটু হক্চকিয়ে গেলো। একবার বৌদির দিকে তাকালো একবার কল্যাণদার দিকে। সসংকোচে হেসে বললো—'আমার আবার খবর কি।'

'কোন খবর নেই?'

'নাঃ, সে তো আপনাদের কাছে। আপনারা খবরের কাগজের মানুষ।'

'তাই বুঝি। কল্যাণ হেসে সিগারেট ধরালো।

'আপনি কি বলুন তো কল্যাণদা।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'সেই কখন এসেছেন। জামা-কাপড় ছাড়বেন না? হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।'

'এই তো যাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন তোমারই অস্বস্তি লাগছে।'

'বা রে, সারাদিন পরে খেটেখুটে এসেছেন। দেখেই মনে হচ্ছে আপনি খুব ক্লান্ত। খারাপ লাগবে না?'

তবু সে রাতে অফিসে গেলো কল্যাণ। তৃপ্তির বাধা মানলো না, ঝণ্টুকে বোঝালো। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর মানুষটা যে সত্যি ক্লান্ত এবং একটু নিশ্চিন্ত ঘুম যে তার সত্যি প্রয়োজন সবাই বুঝেছিলো। কিন্তু কল্যাণ ভাবলো, সারাদিনের খাটুনির পর এখন তার নিভৃতির দরকার অথবা কাজ। ঝণ্টু ঘরে থাকলে তৃপ্তি সম্বন্ধে মোটামুটি নিরুদ্বেগ থাকা যায়, টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া ডাক্তারের কথামতো দিন কয়েকের মধ্যে তৃপ্তির দিক থেকে কোন সম্ভাবনা নেই। ও'দিকে লোকেন, বিভাস, সিতাংশু আছে হাসপাতালে, ওরাও ডাকতে পারে। এতো রাশি রাশি ভাবনা-চিন্তা, তর্ক, প্রশ্ন, আত্মজিজ্ঞাসা বুকের ভিতর এবং স্নায়ুতে বহন করলে ঘরের ঘুম হয় না। পর পর দু'দিন কামাই-এর পর, দিনকয়েক আগে আরও একদিন, তৃপ্তি বমি ক'রে ভয় ধরিয়ে দেবার দিন অফিসে যাওয়া হয়নি মনে ক রে আর ভালো লাগলো না। অফিসে কাজের চাপে সবকিছু ভুলে থাকা যায় এবং প্রয়োজনবোধে কাজে ফাঁকি দিয়ে 'স্টপ্‌প্রেসে'র পব ঘুমোনোও চলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর, রক্তদানের পর, কল্যাণ আরও ক্লান্ত হতে চাইলো। বেরিয়ে পড়লো বেপরোয়ার মতো।

এদিকে বৌদির পাশে বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত অন্ধকারে কথা বললো ঝণ্টু। অনেক কথা, ঘরসংসার, পড়াশুনা, শাস্তা, ভবিষ্যৎ। সবশেষে তৃপ্তি ঝণ্টুকে বন্ধু হিসেবে চাইলো।

'ঝণ্টু, তুমি যে বলেছিলে তোমার অমিতদাকে দেখতে যাবে।'

'কিন্তু কই, শেজদাকে এতো ক'রে বললাম কিছুতেই রাজি হলেন না। ওঁর ভীষণ আপত্তি আছে।'

'আমিও ভাবছিলাম ঝণ্টু, তোমাকে বারণ করবো।'

'কেন বলো তো?'

মৃদুস্বরে কথা বলছিলো তৃপ্তি। কণ্ঠস্বর আরও গাঢ় হলো—'থাক্, তুমি ছেলেমানুষ, সব শুনে কাজ নেই।'

শুধুমাত্র অনুমানে ঝণ্টু যতোটুকু বুঝেছে, ওর ধারণা, তার সবটাই নির্ভুল। তবু দাদা-বৌদির কাছে এ'সব নিয়ে খোলাখুলি কথা না বলাই ভালো মনে ক'রে কিছুই বলে নি। এখন অন্ধকার এবং বৌদি বন্ধুর মতো। কিন্তু তবু ঝণ্টু চুপ করে রইলো। হালকাভাবে বললো—'বড়দের জন্মে ব'লে ছোটদের কাছ থেকে উপন্যাস সরিয়ে রাখলে কি হয় জানো বৌদি? ছোটদের কৌতূহল বাড়ে আর কিছু ছেলে এঁচড়ে পক্ক হয়।'

কৌতুক-রসিকতার সময় তখন নয়, বিশেষত তৃপ্তি দেহে-মনে পীড়িত। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে তৃপ্তি আস্তে আস্তে বললো—'তোমাকে আমি ছেলে ভুলোতে চাই না ঝণ্টু। বরং বলতেই চাই, বলতে পারলে খুশিই হতাম কিন্তু, কিন্তু ঝণ্টু, তোমাকে সবকিছু বলা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়।'

'থাক বৌদি, আমি জানি।'

থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো তৃপ্তি। এবং এক মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে ঝণ্টুকে ধরতে চাইলো। হাত পড়লো ঝণ্টুর বুকে, হাতড়ে হাতড়ে ঝণ্টুর কব্জিটাকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো—'তুমি জানো? কি জানো?'

'সব।'

তৃপ্তি নীরব হলো, হাত শিথিল হয়ে এলো—'তুমি কি ক'রে জানলে?'

'অনুমানে। তোমাদের অতিরিক্ত সতর্কতায়। তাছাড়া অমিতদার

চরিত্রের খবর অনেক আগে থেকেই জানতাম—এরপর ঝণ্টু বালিশে মুখ গুঁজলো। উচ্চারিত কথার শব্দগুলো অস্পষ্ট হলো, গলায় কুণ্ঠিত স্বর—'তাছাড়া স্ত্রীলোক তো নয়। পুরুষ মানুষের এমন কি রোগ হতে পারে যে তোমরা অশ্লীল বই-এর মতে লুকিয়ে রাখবে।'

ক্ষুব্ধ হলো না তৃপ্তি, ঝণ্টুর স্পর্ধায় বিরক্তও হলো না। আবরণহীন কথা বলে ঝণ্টু, সেটা ওর স্বভাব আর ওভাবে কথা বলার অধিকার তৃপ্তিই দিয়েছে ওকে। দীর্ঘ স্তব্ধতায় মগ্ন হলো অন্ধকার। তৃপ্তি অন্য প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত হলো। সবাই জেনেছে একটু একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সংবাদ—কতো কুশ্রীতা আর কদর্যতার মধ্যে ডুবে গিয়ে অমিত এখন হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। অনুকম্পা, ধিক্কার, ঘৃণা ছাড়া আর কি প্রাপ্য হতে পারে এ মানুষের। তলপেটে যন্ত্রণার আঁচড় দাঁত চেপে সহ্য ক'রে তৃপ্তি এপাশ ওপাশ ফিরতে চেষ্টা করলো। যেন আর্তনাদে ফেটে প'ড়ে প্রশ্ন করতে চাইলো অন্ধকারকে—কেন, কেন, কেন? কেন এই ঘৃণিত জীবনের মধ্যে মানুষটার এভাবে ধ্বংস হলো। অন্য কোন পথ কি সত্যি ছিলো না? এই যদি হবে তবে আত্মহত্যার প্রথম চেষ্টায় কেন সেদিনই মরলো না মানুষটা।

'ঝণ্টু—' তৃপ্তি হাঁপাচ্ছিলো।

'বৌদি।'

'নাঃ, কিছু না।'

তৃপ্তির শাড়ির আঁচল ঝণ্টুর শরীর ছুঁয়ে ছিলো। আস্তে আস্তে বৌদির হাতটা খুঁজে নিয়ে ঝণ্টু হাত বুলোতে বুলোতে বললো—'তুমি ঘুমোও বৌদি। তোমার ঘুমোনো দরকার। কতো তুমি ভাববে, ভেবে ভেবে কষ্ট পাবে। আমি যাই, শুয়ে থাকি।'

ঝণ্টু উঠলো। তৃপ্তি বাধা দিলো—'না, ঝণ্টু শোনো।'

'বলো।'

'তুমি কখনও কোন মানুষকে মরতে দেখেছো?'

'না।'

'কোন মানুষের মৃত্যুর জন্যে ভীষণভাবে দুঃখ পেয়েছো?'

ঝণ্টু মনে মনে দ্রুত একবার ভাবলো—'না, বছর তিনেক আগে কাকা বালিগঞ্জের বাড়িতে মারা গিয়েছিলেন ব'লে এগারো দিন না ক'দিন বাড়িতে অশৌচ পালন করতে হয়েছিলো কিন্তু সেরকম কোন মর্মান্তিক ব্যাপার সেটা নয়।'

'আমিও না, কোন মৃত্যুর জন্যে কিংবা কোন মানুষ মরবে জেনে এতো দুঃখ পাইনি কোনদিন—' নিভৃতির, অন্ধকারের প্রশ্ন, একা একা ব'সে ভাববার মতো কতোগুলো জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরতে পেরে যেন হাল্কা হতে চাইছে তৃপ্তি—'কিন্তু, কিন্তু ঝণ্টু, এরকম একটা কদর্য আর জঘন্য মানুষের জন্যে এতো কষ্ট পাচ্ছি কেন? অমিত আমাদের কে?'

'কেউ না কিংবা অনেক কিছু।'

'তার জন্যে এতো কষ্ট পেতে হবে?

'হবে বৈকি, এককালে মানুষটাকে যে ভীষণ ভালোবাসতাম।'

'আজকাল আর বাসি না। না!'

'সে তো জানি না বৌদি, তবে তার প্রতারণাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।'

'প্রতারণা!'

'নয় তো কি?' মানুষটা তার জীবনের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলো না—' অন্ধকার আরও গাঢ়, আরও কুটিল হলো তৃপ্তির সামনে। ঝণ্টুকে নিষ্ঠুর মনে হলো। অথচ ছোট ভাই হলেও ওর প্রাপ্ত বয়সকে স্বীকার করে তৃপ্তি। খোলাখুলি কথা বলতে গিয়ে নির্মমভাবে সত্য কথা বলে। খুব গভীরে হয়তো ওর কথাই সত্য মনে হবে। তবু তৃপ্তি চুপ ক'রে থেকে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলো। তারপর আবার শ্রান্ত এবং কাতর গলায় বললো—'আমার কথার কিন্তু উত্তর পেলাম না ঝণ্টু। ওর এতো অপরাধ আর কুকীর্তির পর নতুন ক'রে

বললে—প্রতারক। ওতে তো আরও বেশি ঘৃণা করবো। এতো কষ্ট পাবো কেন।'

'বৌদি—'

'হুঁ—'

'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কি বলো।'

'আজ যদি তোমার পরিচিত অন্য কেউ মারা যায়। ধরো আমি, আমারই যদি আজ হঠাৎ কোন বিপদ ঘটে—

'ঝণ্টু—'

'না, না, কথার কথা। ধরো, এরকম যদি একটা কিছু ঘটে তুমি দুঃখ পাবে। ভীষণ দুঃখ পাবে কিন্তু অমিতদার জন্যে যে কষ্ট পাচ্ছো সে কি এই দুঃখ।'

'মানে! কি, তুমি বলতে চাও ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বৌদি—' অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঝণ্টু স্বগতোক্তির মতো বললো —'অমিতদা যদি সেদিন পুলিশের গুলিতে মরে যেতেন চিরদিন শহীদ বলে পূজো করতাম, ধরো যদি আত্মহত্যাই করতেন দুঃখ পেতাম কিন্তু আজ যেভাবে মারা যাচ্ছেন—না, না, ধরো যেভাবে ভুগছেন তাতে তার মৃত্যুর কথা ভাববার সময় পাচ্ছি কোথায়। এই মানুষটাকে লোকে আজ ঘৃণা করছে, অবজ্ঞা করছে, করুণা করছে—এই দুঃখ রাখবারই যে জায়গা নেই। বৌদি আমরা লোকটাকে ঘৃণা করতে পারছি না, অন্তত ঘৃণা করার প্রশ্ন উঠছে সেটাই তো সবচেয়ে বড়ো কষ্ট। তোমাদের কথা জানি না আমি আমার কথা বলছি।'

স্নায়ুতে, মনে একটা জ্বালা অনুভব করছে তৃপ্তি। ঝণ্টু নির্মম নিয়তির মতো নিষ্ঠুর। তবু ওর কথায় কোথায় যেন একটা প্রশান্তি আছে। নিজেকে শিশুর মতো মনে হয়। মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যখন নিজের কাছেই দুর্বোধ্য জটিল তখন সেগুলো শুনতে ইচ্ছা করে

অন্যের কাছে। অন্ধকারের কাছে অনুকম্পা চাইলো তৃপ্তি। শরীরের দিক থেকে যখন তার এতো যন্ত্রণা, এতো কাতরতা, কেন ঘুম নেই তবু? কেন এতো মনের পীড়ন?

'বৌদি—'

'ঘুমোও—ভেবো না। ভেবে লাভ নেই।'

'লাভ নেই!'

'না—'

'কার জন্যে ভাববে বৌদি, তুমি একজন অমিত গুপ্তকে চেনো তার জন্য কষ্ট পাচ্ছো। আমি এ যুগের অনেক অমিত গুপ্তকে চিনি। তারা সবাই হয়তো মরছে না তবে মরতে চাইছে। তাদের ঘরবাড়ি আছে আত্মীয় বন্ধুও রয়েছে, তারা শিক্ষিত। এমন নয় যে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সামান্য প্রয়োজনটুকু তারা উপার্জন করতে পারে না। তবু—'

'তবু তবু ওরা কুৎসিতভাবে পচে পচে মরে। কি সুখ!'

'কঠিন প্রশ্ন। উত্তরটা বোধ হয় ওরাও জানে না।—' ঝণ্টু খুব আস্তে আস্তে প্রতিটি শব্দকে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ ক'রে বলতে লাগলো—'ওদের নিয়ে হয়তো ঠাট্টা করা যায় না। যদি যেতো, বলতাম এ যুগের উল্টো বুদ্ধ। বুদ্ধ রাজসিংহাসন, যুবতী বৌ আর সন্তানসুখ অবহেলায় ছেড়ে গাছতলায় ভুগে মরেছিলেন। কি ব্যাপার? না জীবনে বড় দুঃখ—মুক্তি চাই। আর এরা তার চেয়েও সহজে অকাতরে ঘর-বাড়ি ছেড়েছে। অবশ্য উদ্দেশ্যটা ঠিক জানি না। তবে ঈশ্বর, শয়তান, পাপ শব্দগুলো ওদের মুখে প্রায়ই বলতে শুনি।'

তৃপ্তি নীরব এবং সেই নীরবতায় ঝণ্টুর কথাগুলো যেন আরও সকরুণ গাম্ভীর্য পেলো 'কিন্তু আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে যদি এ ধরনের কিছু চরিত্র না পেতাম, তবে হয় তো সত্যি ও ভাবে ওদের ঠাট্টা করতে পারতাম বৌদি। কিন্তু এখন আর পারি না। বুদ্ধ তো

একটা মানুষকে মরতে দেখেই চমকে উঠেছিলেন কিন্তু দু'দুটো মহাযুদ্ধের পর মারামারি-কাটাকাটিতে পৃথিবী ভ'রে গেছে আর মানুষগুলো বিচলিত হবে না? ইতিহাস ভবিষ্যৎ, মানবসভ্যতা ও সব তো বড় বড় ব্যাপার, না হয় ছেড়েই দাও। ওই মানুষগুলো কোনদিক থেকেই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়াতে পারছে না। তবে কি জানো, কফি-হাউসে রেস্তোরায় যে কিছু ফ্রাস্ট্রেশানের ভণ্ডামিও দেখছি না তা নয়। ওদের কস্মিনকালেও বিশ্বাসের আদর্শের সমস্যা ছিলো না, আজও নেই। কথা হলো, অমিতদাদের নিয়ে। যাদের নিয়ে ভাবতে হয়। না খেতে পেয়ে যে ভিখিরি ট্রাম-বাসের তলায় ইচ্ছে ক'রে মরে তাদের সঙ্গে এদের আত্মহত্যার পার্থক্য আছে। খেতে দিলে ভিখিরিটা আর মরতে চাইত না আর অমিতদার মতো মানুষকে হাজার টাকার চাকরি দিলেও তার দুঃখ যাবে না; বরং বাড়বে।'

'হুঁ'—একটা দীর্ঘশ্বাসের হাপর টেনে তৃপ্তি আবার ছেলেমানুষি প্রশ্ন করলো—'তোমার অমিতদাকে কি বাঁচানোর কোন উপায় ছিলো না ঝণ্টু।'

ঝণ্টু সত্যদ্রষ্টার মতো গম্ভীর। আস্তে আস্তে বললো—'হয় তো ছিলো। কিন্তু সে বড্ড কঠিন কাজ বৌদি। ওদের শোধরাতে গেলে গোটা দেশটার খোল-নলচে পাল্টাতে হয়। কিন্তু সে কি দু'জন এক জনের কাজ? শুনেছি হার্কুলিস নাকি নদীর গতি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা তো হার্কুলিস নই যে গায়ের জোরে উল্টে পাল্টে দেব সব কিছু, আর ব্রহ্মা, উপগুপ্ত বা রামমোহন রায়ও নই যে রাতারাতি নৈতিক আদর্শ বদলে দেব মানুষের। সময় লাগবে। হয় তো তার আগেই অমিতদা—'

'থামলে কেন ঝণ্টু—' তৃপ্তি সঙ্গে সঙ্গেই বললো—'তোমার অমিতদা বাঁচবে না।'

ঝণ্টু চুপ ক'রে রইলো। কেননা এ সিদ্ধান্ত সত্য। কিন্তু লক্ষ্য

করলো, এই নিদারুণ সত্যটা মেনে নিতে বৌদির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠেছে, উচ্চারণে আতঙ্ক। বালিশের উপর দু'হাতের পাতায় মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজলো। চোখ বুজে ভাবতে লাগলো—বৌদিকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা সে খুঁজে পায় কিনা।

কিন্তু অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি ভাবলো অন্য কথা—সত্যি আর কোন সান্ত্বনা নেই। অমিত মরবে কেন? মরে গেছে। এই একান্ত সত্য কথাটা মেনে নিতে কেন এতো কষ্ট পাচ্ছি? একটা মানুষ, আত্মীয় হোক, বন্ধু হোক যে-ই হোক, মেয়েমানুষের শরীরের লোভে যে এমন ক'রে জঘন্য নোংরা ব্যাধি তৈরি করতে পারে, মদ খেয়ে জুয়া খেলে যে এমন ভাবে জীবনটা নষ্ট করে তাকে ঘৃণা না ক'রে আমি আমার এ অবস্থায় ভেবে ঘুমোতে পারছি না—আমিই বা কেমন মেয়েমানুষ? এমন কুৎসিত ভাবে মেয়েদের অপমান করে যে পুরুষ, অমিত না হয়ে অন্য কেউ হলে তাকে তো অবশ্যই ঘৃণা করতাম, নাম শুনলে ঘিন ঘিন করতো সারা শরীর। কিন্তু অমিত বলেই কি পারি না! একই সঙ্গে দেহে-মনে একটা মেয়েলি যন্ত্রণায় আর নারীত্বের অবমাননায় বেদনা অনুভব করলো তৃপ্তি। এই গাঢ়-ঘন-কুটিল অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, এমন কি নিজেকে পর্যন্ত লুকোনো যায় নিজের কাছে। তৃপ্তির মনে হলো এই অন্ধকারই ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, ওর একান্ত বন্ধু। কেননা এখানেই শুধু নিজেকে যাচাই করার একমাত্র সুযোগ। শুধু এখানেই অনায়াসে নিজেকে শাসন করা চলে, প্রবোধ দেওয়া যায়, আকুল হয়ে কান্নাও সম্ভব। মুখ-থেতলানো ইঁদুরের মতো তিন দিনের বাসি পচা দুর্গন্ধ নিয়ে মানুষটা ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে, এ কথা সত্যি কিন্তু সে মানুষটার জন্যই যে এক দিন মনে-প্রাণে যন্ত্রণা কুড়িয়েছি—সে-ও তো মিথ্যে নয়। গণিকা! তৃপ্তি যেন ওর স্মৃতি খুঁজে আবিষ্কার করলো—গল্প-উপন্যাসে পড়েছে, লোক মুখে এই প্রথম

শুনলো, কিন্তু গণিকা কোন দিন দেখেনি। অথচ ওরা নাকি মেয়ে মানুষের শরীর, লোভী পুরুষেরা যায়, অমিতও যেতো—ভাবতে ভাবতেই সমস্ত শরীরে পাক খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো। কি আমি দিতে পারি? কতোটুকু সাধ্য ছিলো আমার? তৃপ্তির মনে হলো কতো বড়ো জায়গায় সে ফাঁকি দিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। অধ্যাপিকা সেজে মেয়েদের সামনে আজও প্রতিদিন কেতাবি কথা আউড়ে যেতে হয় বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব, বলতে হয়, দেহের অতীত হয়ে প্রেম সুন্দর এবং সত্য এবং চিরন্তন। তাই যদি সত্য হবে তবে কল্যাণের সঙ্গে শরীর জড়িয়েও কেন অবধারিত ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারলাম না অমিতকে। কি সে চেয়েছিলো, কি আমি দিতে পারি নি? হয় তো স্বামীকে প্রতারণা করেই অমিতের জন্য ভেবেছি, মানুষটাকে ভালোবেসেছি, নীরবে কাঁদতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলাম। মেয়েমানুষের শরীরে সন্তানের জন্ম দিতে পারি কিন্তু সমস্ত নারীত্ব নিয়েও বারবার একটা পুরুষের কাছে বিশ্রীভাবে অপমানিত। ভাবতে ভাবতে তৃপ্তি ক্লান্ত হলো। সামনে প্রগাঢ় অন্ধকার, আরও ঘন, আরও নিবিড়। মানুষের ভিড়ে হারিয়ে-যাওয়া শিশুর মতো নিজেকে অসহায় নিঃসঙ্গ মনে হয় এই অন্ধকারে। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি আমরা, যাবতীয় সুন্দর দৃশ্যগুলো কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। নইলে কেন গা-ঘিন-ঘিন করা ঘৃণার পাশাপাশি একই সঙ্গে ভালোবাসার কথা ভাববো এবং ভালোবাসতে না-পারার দুঃখে কাতর হয়ে ঘুমোতে পারবো না। বই-এর কথাগুলো যদি সত্য হতো তবে কেন ঘরের দিকে ফেরাতে পারলাম না অমিতকে? শুধু বিয়ে করলেই যাদের সব দুঃখ মিটে যায় অমিত তো ততোখানি জোলো পুরুষ ছিলো না। অন্তত এই বিশ্বাস নিয়েই একদিন ওর সঙ্গে মিশেছিলাম। সুন্দর বন্ধুত্ব নিয়ে দু'জন থাকবো—এই চেয়েছিলাম। কিন্তু সে মানুষ বন্ধুত্বকে পরিহাস করলো এবং শেষ পর্যন্ত কুৎসিত মেয়েমানুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে জীবনটা নষ্ট

করলো। এবং মাঝখানে আমি আর এক মেয়েমানুষ অপমানিত, উপেক্ষিত, ব্যর্থ। ব্যর্থ শুধু মেয়েমানুষ বলেই—অন্য পুরুষ বন্ধুরা যেটুকু পারতো অথবা পেরেছে, আমি তাও পারলাম না। অথচ বন্ধুত্ব রক্ষা করতে চেয়ে শুধু ওকে পীড়িত করেছি, নিজে যন্ত্রণা কুড়িয়েছি। আজ মনে হয় কল্যাণ মহৎ। জন্তুসদৃশ সেই অন্ধকারে তৃপ্তি যেন একে একে ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে হারিয়ে ফেলছিলো, আবার ধীরে ধীরে চেতনায় ফিরে এসে স্বস্তি পেলো। কল্যাণ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভদ্র, রুচিবান ক্ষমাশীল না হতো তবে যে কোন মুহূর্তে বিরোধের সৃষ্টি হতে পারতো। ওর চোখে-মুখে আমি বিরক্তি লক্ষ্য করেছি, একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে গত এক বছর ধরে অমিতের সঙ্গে আমার সম্পর্ককে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। অনুবোধ করেছে, তিরস্কার করে নি, বোঝাতে চেয়েছে বাধা দেয় নি। সংসারের সুখ ওর-আমার স্বার্থ—স্বার্থেই হোক, নিঃস্বার্থেই হোক কল্যাণ ধৈর্য না ধরলে আজ আমি বিপন্ন হতাম। তৃপ্তি চোখ বুঁজে সমস্ত শরীরে, মনে, রক্তে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করলো। এবং ভেবে খুশি হলো একটা ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা আজ কেটে গেছে। এবং এ কথা চিন্তা করে সে আরও বেশি আশ্বস্ত—অমিত যদি এবারের মতো জীবন নিয়ে ফিরতে পারে তবে আবার যাব ওর কাছে। এবার দুর্বল সেন্টিমেণ্টাল মেয়েমানুষ হিসেবে নয়, নারীত্বের ব্যক্তিত্ব এবং অহঙ্কার নিয়ে। তিরস্কারের বদলে তিরস্কার, বিদ্রূপের পরিবর্তে বিদ্রূপ। ওর মধ্যে ভীতি জাগাতে হবে, মেয়েদের প্রতি ভয়। নির্দয় আঘাতে অপমানিত করতে হবে ওর ভিতরকার ওই কুৎসিত দানবটাকে। নইলে মেয়েদের প্রতি ওর শ্রদ্ধা ফিরবে না। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো খেয়াল করেনি তৃপ্তি। সকালে উঠে দেখলো—সারারাত ঝণ্টু ওর পাশে শুয়ে ছিলো, এখনও ঘুমোচ্ছে। ওদিকে ওর বিছানাটা খালিই পড়ে আছে। শায়িত ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি কৌতুক অনুভব করলো। হাসলো-

সমাজ নামে অদেখা ব্যক্তিটি যদি কাল রাতে জানালার খড়খড়িতে টর্চের আলো ফেলে উঁকি দিতো—রস পেতো অনেক।

আটত্রিশ

অমিত মারা গেছে।

খুব মামুলিভাবে শেষ হলো ওর শেষটুকু। শ্মশান থেকে ফেরার পথে শরীরে অমানুষিক ক্লান্তি নিয়েই ব্যাঙ্কে যেতে হয়েছিলো একবার। অথচ ঘরে ফিরেও শান্তি ছিলো না। তৃপ্তির কাছে ধরা পড়ার ভয়। বাধ্য হয়েই ফিরতে হলো আবার। এবং অফিসে। অনেক কাজ। টেবিল ভরে কাগজের স্তূপ। চারদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে টেলিপ্রিণ্টার—রয়টার, পি-টি-আই, টাস। পৃথিবী থেমে নেই। অনেক, অনেক খবর জন্ম নিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। অমিতের মৃত্যু সেখানে কতো সামান্য ঘটনা, একটি শিশুর জন্ম হবে—সে আর কতোটুকু সংবাদ। আতঙ্কিত বিশ্ব। সুদূর আটলান্টিকে মহাপ্রলয়ের সূচনা, ধ্বস নামছে হিমালয়ে। আণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি ক'রে সমগ্র পৃথিবী রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুনছে সভ্যতার মৃত্যুর। কলকাতা শহরের ট্রাম-বাস-অফিস-রেস্তোরাঁ থেকে সুরু ক'রে সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মানুষের জটলা—গুঞ্জন, উত্তেজনা, তর্ক, আলোচনা, উৎকণ্ঠা। 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ'পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।' এবং যাবতীয় চক্ষুষ্মান নরনারীর ভবিষ্যৎ আজ এই অন্ধ শক্তির কাছে বিসর্জিত।

খবর আসে—রাষ্ট্রপুঞ্জ বিচলিত, রাষ্ট্র প্রধানদের বিশ্ব শান্তির আবেদন, বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির কাছে শান্তিকামী, দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ঘন ঘন

তারবার্তা। কল্যাণ ওর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের যাবতীয় অনুভূতিকে বিশ্বযন্ত্রণার সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে স্থবির হয়ে যায়। এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই ব্যক্তিমানুষের, মুক্তি নেই বিশ্বমানবের।

মাথা নুয়ে এক মনে কাজ করতে চেষ্টা করে। মন বসে না। শ্মশানের স্মৃতি ভয়ঙ্কর, এমন কি বন্ধুর মৃত্যুর চেয়েও। অনায়াসে কতোগুলি মানুষের শরীর ছাই হয়ে যায় আর কতিপয় মানুষ জীবনকে স্বাভাবিক ভেবে হাসতে হাসতে সেখান থেকে ঘরে ফিরে আসে। কল্যাণ কোন বিশেষ দৃশ্যের কথা ভেবে নয়, কোন বিশেষ চিন্তায় ভাবিত হয়েও নয়—সব মিলিয়ে বৃহৎ একটা শূন্যতা অনুভব করে বিষণ্ণ হয়ে থাকে। তারপর এক সময় উঠে আসে সাব-এডিটরদের টেবিলের সামনে। পথে প্রুফ-রিডার বৃদ্ধ বসন্তবাবুর সঙ্গে দেখা—

'ভালো আছেন স্যর? আপনার ওআইফ?'

'ভালো'—সংক্ষিপ্ত এবং দায়-সারা গোছের একটা উত্তর দিয়ে কল্যাণ এগিয়ে এলো।

চারদিকের মানুষগুলোর অসম্ভব কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে কেমন যেন বিদেশী মনে হলো। নিজের টেবিলে মাথা গুঁজে সংবাদ অনুবাদ করছিলেন বিকাশ নন্দী। কল্যাণের উপস্থিতিতে সচকিত হলেন—এই যে কি খবর! ব্যাপার কি আপনার! কি হয়েছে।

'কেন?'

'চোখ-মুখের এ অবস্থা। ইউ-এন-ওর সেক্রেটারি জেনারেলের চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে।'

'চারদিকের অবস্থা দেখছেন তো! কোনদিক থেকেই শান্তি পাচ্ছি না।'

'আপনার স্ত্রী?'

'ভালো।'

'সিগারেট খান—' বিকাশ নন্দী সিগারেটের প্যাকেট সামনে ধরলেন।

দুজনেই সিগারেট ধরিয়ে মুখোমুখি বসলো।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। কিছু মনে করবেন না।'

কল্যাণ নিস্পৃহভঙ্গীতে তাকালো—'বলুন'।

'আজকের এডিটোরিয়াল পড়েছেন।'

কল্যাণ চমকে উঠলো—'কেন বলুন তো।'

'ওটা কার লেখা। নিশ্চয়ই আপনার নয়, ভবতোষবাবুর তো নয়ই। জানতে ইচ্ছে করে এতো ইর্‌রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌ মানুষটি কে।'

সিগারেটের এক কণা তামাক পাতা যেন গলায় আটকালো মনে হলো। বিশ্রী তেতো আর বিস্বাদ। কল্যাণ জল চাইলো বেয়ারা ডেকে।

বিকাশ নন্দী হাসলেন—'একটা থিয়োরিকে ভিত্তি করে যখন পলিসি তৈরি হয় আর সেই পলিসি অনুযায়ী ঘটনা ঘটে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কল্যাণবাবু। কিন্তু ঘটনাগুলো নিজেদের খুশিমতো ঘটছে আর দফায় দফায় ঘটনার গতি দেখে যেখানে নতুন নতুন থিয়োরি তৈরি হয় তাকে অরাজকতা বলে। আমরা দ্বিতীয় দলের হাতে।'

একগ্লাস জল খেয়ে কল্যাণ আরও একগ্লাসের হুকুম দিলো। সামনে সহকর্মী বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রীতিমতো ভয় পেলো। মনে হলো বিকাশ নন্দী শুধু একজন মানষ নন, একটা জনতা। যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা নিয়ে দেশের জনশক্তি বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদে কঠিন হয়ে ওঠে আজ সেই শক্তিই যেন কল্যাণের কাছে কৈফিয়ত তলব করছে। কল্যাণ নীরব রইলো। শরীর মনের বিষাক্ত যন্ত্রণা তখন ওকে যুদ্ধের পরাজিত সেনানায়কের মতোই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। টেলিপ্রিণ্টার থেকে আরও দুটো শ্লিপ টাইপ-করা কাগজ ছিঁড়ে এনে টেবিলের উপর রেখে গেলো অফিসের দপ্তরি প্রিয়নাথ। অনাসক্ত ভাবে সেদিকে তাকালো কল্যাণ। চোখ বুলিয়ে পড়ার ভান করলো। আরও কিছু নতুন খবর এসেছে পৃথিবীর। হয় তো প্রথম পৃষ্ঠার হেড-লাইন অথবা পঞ্চম পৃষ্ঠার কোথাও তার স্থান। কল্যাণ

একবার অসহায়ভাবে অফিসের চারিদিকে তাকালো। প্রচণ্ড হলঘরে, টেবিলে টেবিলে কাজ চলছে, সারিবাধা ফ্লুরোসেন্ট আলো, মাথার উপরে ফ্যানের বাতাস। তার নীচে সৌরমণ্ডলীর গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়েও আরও নিপুণ শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা সকলের। এটা সংবাদ পত্রের অফিস, সে নিজেও সাংবাদিক। ইচ্ছা হলো, চিৎকার করে সে জানিয়ে দেয় সকলকে ভূমধ্যসাগরে বোয়িং সেভেন-ও-সেভেনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় যে দেড়শত যাত্রী প্রাণ হারিয়েছে তার চেয়েও একটি গুরুতর মৃত্যুর সংবাদ তার হাতে আছে। এ মৃত্যু মানুষের বেঁচে থাকাকে বিদ্রূপ করে, এ মৃত্যু সমাজ দেহে দুরারোগ্য ব্যাধির অদৃশ্য জীবাণুর ষড়যন্ত্র।

কল্যাণ উঠে দাঁড়ালো। সে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং শোচনীয় ভাবে অক্ষম। অক্ষম কেন না পৃথিবীর বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে অমিতকে নিয়ে আজ তার কিছুই করার নেই। ছেলেটা মরেছে কিন্তু মৃত্যু দিয়ে কোন সংবাদ সৃষ্টি করতে পারে নি। এর চেয়ে ভালো ছিলো ওর সেই আত্মহননের চেষ্টা কিন্তু কিই-বা লাভ হতো তাতে? ছোট একটুকরো সংবাদে অথবা এক কোণে ছোট একটু বক্স-নিউজে কতোটুকুই বা বোঝানো যেতো দেশের মানুষকে—বিপন্ন সময়ের হাতে নিহত এই যুবক। জীবনের নিষ্ফলতায় বিশ্বাস করিনি বলেই এ মৃত্যুকে গুরুত্ব দেব বেশি। এ মানুষ শুধু নিজে মরে না, অসংখ্য জীবিত মানুষকে আতঙ্কিত করে, মানুষের ভবিষ্যতে অনাস্থা জানায়।

নিজের চেম্বারের দিকে যেতে যেতে কল্যাণ ওর চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবলো। তৃপ্তি আবার ওর শরীরের স্বাভাবিকতায় ফিরে এলে সাময়িকভাবে ওর রোজগারের উপর নির্ভর করবে কিছুদিন। তারপর অন্য কোন পথ খুঁজবে, মনুষ্যত্ব নিয়ে বাঁচা যায় এমনি কোন জীবিকা। নইলে অন্য কোন উপায় নেই। আবিশ্ব এই আত্মহননের যজ্ঞ চলেছে মানুষের। আর্ত পৃথিবী, বিভ্রান্ত মানুষ। আজ যেন

অতিক্ষুদ্র পরমাণু বলে মনে হচ্ছে নিজেকে। কোথাও কিছু করার নেই। এমন কি সাংবাদিক জীবন নিয়ে এই জনমত তৈরির কারখানায়ও সে অসহায়।

নিজের চেম্বারে ঢুকতেই আবার চৌরঙ্গীর সেই আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদের কারিগরকে মনে পড়লো। মাটি থেকে বেশ কয়েক শ' ফুট উঁচুতে বাঁশের মাচায় দাঁড়িয়ে নিজের কীর্তি আর জীবন নিয়ে কি মজার খেলাই না খেলছে। অথচ এ প্রাসাদ তার কিছু নয়, এ প্রাসাদে কোথাও সে নেই।

দুপুরের রোদ মাথায় বয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই নিধুর-মা দরজা খুলে দিলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—'সেই এলেন বাবু একটু আগে আসতে পারলেন নি। আমি ঠায় তখন থেকে বসে আছি ট্যাশকিতে এলেন নি কেন?

'কেন, কেন কি হয়েছে—'প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে চমকে উঠলো কল্যাণ—'সে কি, ওরা কোথায়?

'আপনি যাবার একটু বাদেই তো মার বেদনা বাড়লো। ডাক্তার এলো। ট্যাশকি ডেকে মা নিজেই হাসপাতালে চলে গেলেন?

'একা!'

'না, সঙ্গে ছোট দাদাবাবু গেছেন। ওখান থেকে আপনাকে ফোন করবেন বলেছেন।

কল্যাণ অবশ হয়ে এলো। সামনের শূন্য খাটটার দিকে তাকালো এবং ঘরের চারপাশে। জানালা গলিয়ে প্রচুর আলো এসে ঘরটাকে আলোকিত করেছে। কিন্তু উৎসবে মেতে ওঠার মতো মন, উদ্যম, উৎসাহ সব নিস্তেজ। ক্লান্তিতে, অবসাদে, স্নায়ুর দাপাদাপিতে শরীর-মন অবশ, শিথিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো খাটের দিকে। বিছানায় গড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিতে বিবেকে বাধলো, অন্যদিকে চেয়ারে বসে মাথা লুকিয়ে রইলো

টবিলের হাতের থাজে। একটি দীর্ঘ একাঙ্ক নাটকের নায়ক বলে নিজেকে মনে হচ্ছে আজ। একই দিনে আজ এতো বিপরীত ধর্মী ঘটনা। সবই সহজ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু অদ্ভুত লাগে ভাবতে, আমাকে কেন্দ্র করে আমার চারিদিকে এতো ঘটনা অথচ আমি কেউ নই, আমি নিষ্ক্রিয়। অঘটনকে রোধ করতে পারি না, আবার আমার নিজের উৎসবে খুব অপরিহার্য নই। কিন্তু আমি আছি এবং আছি বলেই আজ সরে দাঁড়াতে পারি না। এই ক্লান্ত অবসন্ন উদ্যমহীন মন নিয়েই উৎসবে যেতে হবে।

কল্যাণ উঠলো। আবার ছুটতে হবে ট্যাক্সিতে। থিয়েটার রোড। তিন দিন আগে স্থির করে রাখা নার্সিং হোম।

ঊনচল্লিশ

সেদিন রাত কাটলো ভয়ে, শঙ্কায়, উৎকণ্ঠায়। আটঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পরও তৃপ্তি ব্যথায় বেদনায় আকুল হয়ে কাৎরালো। বেশিক্ষণ কাছে থাকতে পারেনি কল্যাণ। ডাক্তার বলেছে—ভয় নেই। স্বাভাবিক। ডাক্তারের আশ্বাসে সাহস বাড়ে। ঝণ্টু এসে নিয়ে গেলো অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া নিধুব-মাকে, সেখানেই রইলো সারারাত। আর রাত প্রায় দেড়টায় ঘরে ফিরে ভিতরে ভিতরে দাপাদাপি আর ছটফট করে মরলো কল্যাণ। সঙ্গী রইলো অনভিজ্ঞ ঝণ্টু। সারারাত জাগলো দুজনেই।

রাত ফুরোবার আগেই খবর এলো। রেডিও নয়, টেলিপ্রিন্টার নয়, লোক-মারফৎ। আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিলো। নার্সিং-হোমের আর্দালি নিয়ে এলো চিরকুট।

পিতা হয়েছে কল্যাণ। একটি শিশুর জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে।

পুষ্পবৃষ্টি হলো না, দুন্দুভিও বাজলো না কোথাও। ঝণ্টুই ছুটে গিয়ে চিরকুটটা হাতে নিয়েছিলো, সোল্লাস চিৎকারে ও-ই ঘোষণা জানালো প্রথম। খবর শুনে ছুটে এলো নীচের তলার সুন্দরীদি। পাড়া

কাঁপিয়ে, গলা ছিঁড়ে অতর্কিতে উলু দিলো ন'বার। এলো আরও সব ভাড়াটেরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি উচ্চকিত হট্টগোলে ঘরটা মুখর হয়ে উঠলো।

কিন্তু কোন সাড়া দিতে পারলো না কল্যাণ নিজে। শুয়ে ছিলো, ঝন্টু র চিৎকারেই খাটের উপর উঠে বসেছে। হঠাৎ বুঝেই উঠতে পারলো না ব্যাপারটা। এই দীর্ঘ সময়ের এতো দুশ্চিন্তার ভার এতো সহজে মাথার উপর থেকে নেমে যেতে পারে, এতোক্ষণ ধরে যতো ভাবনা ভেবে এসেছে, সে'সব ভাবতে হবে না আর—এই সহজ কথাটা চিন্তা ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা সামলে নিতে সময় লাগলো কিছুক্ষণ। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো সব কিছু। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো সেও করণীয় সম্বন্ধে অচেতন এক প্রাণী। তাকে ঘিরে তারই চারপাশে উৎসব অথচ উৎসবে মেতে উঠতে গিয়ে অনুভব করে শরীরে মনে ক্লান্তির ভার।

'কই দাদা, চুপ করে বসে রইলেন যে, খাওয়ান? পাঠান কাউকে গাঙ্গুরামের দোকানে।'

নীচের তলার নন্দবাবুর কথায় ধাক্কা খেয়ে সচকিত হলো কল্যাণ। কৃতার্থের হাসি হেসে উঠে দাঁড়ালো খাট থেকে।

ঝন্টু লক্ষ্য করলো, হাসির আড়ালের সেই বিষণ্ণ মুখ। এককোণে এসে প্রশ্ন করলো--'একবার যাবে না সেজদা।'

সংযত গাম্ভীর্যে কল্যাণ বললো—'চল।'

ভোর বেলার কলকাতা। দিনের কাজ পরিপূর্ণভাবে সুরু হতে তখনো অনেক দেরি। কল্যাণের ভালো লাগলো এই সকালের আলো, ট্যাক্সির প্রচণ্ড গতি, ট্যাক্সির দুপাশে মৃদু বাতাসের ঝাপট। এতো ভোরে ঘুম থেকে ওঠবার অভ্যাস কোনদিনই নেই তবু ঘুমের আবেশে মনে হলো, কী আশ্চর্য মনোরম এই ভোরের বাতাস, এই সকাল। কতিপয় কুঁড়ির ফুল হয়ে ফোটবার সময় এখন, দুর্বার শরীর চুঁইয়ে শিশির ঝরবে। সূর্য আশীর্বাদ করবে তাদের।

কার্তিক ফুরিয়ে এসেছে, অঘ্রাণ সুরু হবে-হবে। সকালের আলোয়

কলকাতা জাগছে। যাত্রীহীন ট্রাম এবং বাসের দ্রুতগতি, ইতস্তত মোটর-লরি, ফুটপাতে কয়েকটি মানুষ, সাইকেলে কাগজের হকার, ফুটপাতে রিকশ তুলে এখনও ঘুমোচ্ছে দু'চারজন রিকশওলা, বড়-বাড়ির গাড়িবারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে থাকা পথের মানুষ ভিখিরি, কুলি, উদ্বাস্তু সংসার। যেন মস্ত একটা উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে কাল রাতে এবং উৎসবের পরবর্তী ক্লান্তি নিয়ে কলকাতা জাগছে, সর্বত্রই ঝিমোনো ভাব। উৎসব! কল্যাণ ভাবলো—গত ক'দিন ধ'রে, বিশেষত কাল, কাল রাতে, যে অপরিসীম শ্রম আর ক্লান্তির মধ্যে সময় কেটেছে, তাকে উৎসব বলবো! উৎসব! উৎসব নয় তো কী? একটি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রির শেষে কেন এতো সুন্দর মনে হবে পরিচিত কলকাতাকে, কেন ভালো লাগবে প্রথম শীতের মৃদু বাতাস, এই সকাল।

কল্যাণ একবার দু'দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইলো ভালো লাগা কলকাতাকে। অতি চেনা রাস্তা, রাস্তার মোড় এবং সাইন-বোর্ড—কিন্তু সময় নেই। প্রচণ্ড একটি গতি উড়িয়ে নিয়ে ছুটছে। দৃষ্টিকে স্থির রেখে তাকাবার উপায় নেই। পথ ফাঁকা পেয়ে ড্রাইভার অ্যাক্সিলেটরের উপর পায়ের চাপ বাড়িয়েই চলেছে, স্পিডো-মিটারের কাঁটা কাঁপছে, কাঁপতে-কাঁপতে উঠছে। মনে হলো, এই দুরন্ত বেগকে থামাবার শক্তি আজ নেই। মিথ্যা হয়ে গেছে সবদিক, প্রচণ্ডবেগে পিছনে স'রে যাচ্ছে চারদিক, অফিসের নানা ব্যস্ততাতেও হয়তো একবার স্থির হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব কিন্তু এই গতি-রোধের শক্তি আর নেই। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, একটা স্থির উদ্দেশ্যকে নিশানা ক'রে ধাবমান এই গতি। শুধু এই ট্যাক্সির নয়, তিল তিল মুহূর্ত দিয়ে গড়া এই জীবনের গতিই যেন শুধু এই লক্ষ্যে, এই মোহনায় মুক্তি পেতে ছুটে এসেছিলো। আজ তার সাফল্যের, চরিতার্থতার তারিখ।

কল্যাণ চোখ বুজে আজকের দিনটার পরিচয় চাইলো। আজ

বৃহস্পতি ; তারপর ? তারিখ ? মাস ? খৃষ্টাব্দ ! আরও একটি দিনের বয়স বাড়লো যিশুখৃষ্টের, আরেকটি শিশু পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে আজ —আজ থেকে তার বয়স গোনার, পৃথিবীর সময়ের উপর অধিকারের দাবি জানাবার দিন। অনেক অনেক বছর ধরে সময়ের সিঁড়ি ভেঙে এখানে এসেছি। আমার অতীত আছে, সুদূর অতীত, পিছন ফিরে তাকালে স্মৃতির দিগন্তকে ধূসর মনে হয়। কিন্তু আজকের নতুন শিশুর একতিল অতীত নেই, ভবিষ্যৎ, শুধু ভবিষ্যৎ, অন্তহীন ভবিষ্যৎ— ভবিষ্যতের পথ কেটে কেটে এই শিশু তার অতীতের সঞ্চয় গড়বে, আরও অসংখ্য জন্মজয়ন্তী কাটবে যিশুখৃষ্টের, আরও বয়স বাড়বে পৃথিবীর এবং আমি সেই ভবিষ্যতের মধ্যেও বেঁচে থাকবো, বংশস্রোতে বাঁচবো। আজ থেকে আমি পূর্বপুরুষ, আমি অতীত।

কল্যাণ ট্যাক্সির নরম গদিতে আরামে চোখ বুজেছিলো কিন্তু থিয়েটার রোডের মোড়ে হঠাৎ স্পিডের মাথায় বাঁক ঘুরতে গিয়ে ট্যাক্সিটা যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠলো। কল্যাণ আর ঝণ্টু দু'ভাই দু'জনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে গিয়ে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'লাগলো ?' ঝণ্টু সেজদার দিকে তাকালো।

'নাঃ—'

'ওদিকে কনুইতে ধাক্কা খেলে যে—'

'না, কিছু না।' কল্যাণ একটা সিগারেট ধরাবার মতো সময় নিলো। তারপর তাকালো ভাইয়ের দিকে। রক্তের সঙ্গে জড়িত ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলো কল্যাণ, বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও ঝণ্টু আজ পরিপূর্ণ যুবক। এতোদিন বুদ্ধি দিয়ে যে-ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছি, ঝণ্টু আজও সেভাবেই চিন্তা করে। এই উপলব্ধির অভিজ্ঞতা ওর নেই, এবং নেই ব'লেই নিজেকে আজ নানাদিক থেকে স্বতন্ত্র, ত্রিকালজ্ঞের মতো অভিজ্ঞ মনে হয়।

'ঝণ্টু—'

ঝণ্টু তাকালো।

'তোর-আমার বয়সের তফাৎ কত?

'হঠাৎ—'

কল্যাণ ওর আকস্মিক প্রশ্নের অস্বাভাবিকতা অনুভব করে হাসলো।

'—বল না শুনি। জানিস?'

'ধরো আট কি নয় বছর।'

'প্রায় একটা ডিকেড।'

হুঁ—'

'তবু তুই আমি একই সময়ের মানুষ। একদিক থেকে সমবয়সী। কী বলিস। কিন্তু আজ যে-শিশু জন্ম নিলো তার সঙ্গে তোর-আমার পার্থক্য?'

'একটা 'জেনারেশান!'

'জেনারেশান!' কল্যাণ চুপ করলো। ছোটভাই-এর কাছে উচ্ছ্বাস আর চঞ্চলতা প্রকাশ পেতে পারে এই আশঙ্কায় সিগারেটের আড়ালে নিজেকে লুকোলো। বলতে পারলো না, একটা জেনারেশানের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আনন্দ কত গভীর। বাইরের দিকে তাকিয়ে একমনে সিগারেটের স্বাদ আর ফুটপাত-ছোঁয়া বাড়িগুলোতে ট্যাক্সির দুরন্ত গতি লক্ষ্য করতে লাগলো। হঠাৎ বললো—'জেনারেশানকে আমরা কি দিতে পারি ঝণ্টু?

'শিক্ষা-দীক্ষা, প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ।'

'আর কিছু?'

'ভাবিনি।'

'আর আমাদের ভুলের বোঝা। রাশি রাশি ভুল ক'রে রেখেছি, সেসব শোধরাতেই ওদের অনেক সময় লাগবে।'

সামনের চৌমাথায় পুলিশের লালবাতির হুঁশিয়ারিতে ট্যাক্সিটা হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লো! এবং তারপর যখন আবার চলতে শুরু করেছে, ঝণ্টু কল্যাণ দুজনেই নীরব।

কল্যাণ আবার সেই আলোর দিকে তাকালো। এবং মনে পড়লো তৃপ্তিকে।

বিবাহের উৎসবের মতো আজকের উৎসবেরও নায়িকা তৃপ্তি, এ-আনন্দে তার চুলচেরা হিসেবেও সমান অংশ। তৃপ্তি এবং আমি, আমি এবং তৃপ্তি! কল্যাণ এখন পর্যন্ত অচেনা অদেখা শিশুটির কথা ভাবলো। কে এই শিশু? কী তার পরিচয়? স্মৃতিতে গিয়ে অতীতের যতোটুকু মনে আনা যায় তার সর্বত্রই তৃপ্তি, শুধু তৃপ্তি। ভালোবেসেছিলাম একজন নারীকে, তার নারীত্বকে, তার যৌবনকে, এবং সেই যৌবন, শিক্ষা-দীক্ষা, সৌরভ নিয়ে তৃপ্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। আমি প্রেমে ডুবে তৃপ্তিকে ভালোবেসেছিলাম। তৃপ্তিকে চেয়েছিলাম, এবং আমার প্রতিমুহূর্তের ভাবনায়-চিন্তায়-ধ্যানে তৃপ্তি ছিলো, শুধু তৃপ্তি। সেই প্রেমে, সেই ভাবনায় কোথায় ছিলো এই শিশু?

শুধু তৃপ্তিকে পাবার জন্যই বিয়ে করেছিলাম এবং তৃপ্তিকে পেয়ে খুশি হয়েছি, সুখীও। অথচ বায়োলজির সহজ নিয়মটাকে তো জানতাম দুজনেই। একদিন প্রেমের মধ্যে, বিবাহের মধ্যে যেখানে স্বার্থপরের মতো সুখ খুঁজেছি, সেই পিপাসা আজ প্রত্যাশা আর আকাঙ্ক্ষার রূপ নিয়ে রক্ত মাংস এবং সজীব প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত। নিজেদের ভালোবাসি বলেই এই সজীবতাকে ভালোবাসব, আমার, তৃপ্তির, তৃপ্তির, আমার, আমাদের শরীরের ভগ্নাংশ দিয়ে, আমাদের অণু-পরমাণু উপকরণ দিয়ে গড়ে তোলা এই প্রাণ। কল্যাণ ভাবলো, এবং সে ভেবে স্বস্তি পেলো—মানুষকে ভালোবাসে তৃপ্তি, ভালোবাসতে চায়। আজ বৃহত্তর এই আকর্ষণ ওকে অনুভব করতে সাহায্য করবে, কোনো ক্ষতি হয়নি পৃথিবীর। ভালোবাসতে চাইলে প্রিয় মানুষের অভাব নেই পৃথিবীতে। একজনের অভাবে অন্যজনের সৃষ্টি।

'রোককে, বাঁয়া তরফ। সেজদা—'

ট্যাক্সিটা হঠাৎ ব্রেক কষতেই কল্যাণ আচম্কা নাড়া খেলো—উঃ—

'নামবে না? এসো।'

'হুঁ, নাম—'

অভিজাত 'নার্সিং-হোম, সাহেবি নাম। গির্জার প্রার্থনাগৃহের মতোই চকচকে-ঝকঝকে, ছিমছাম, এবং নিস্তব্ধ। মোজায়েক-করা মেঝেতে পা রাখতে মায়া হয়, সামনে কাশ্মিরি কাজ করা কাঠের টেবিলে পিতলের টবে মানি-প্ল্যান্টের চারা, দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর যন্ত্রণা। কল্যাণ একবার চারদিকে তাকিয়ে লক্ষ করলো। সিঁড়ির দিকে এগোতেই ডক্টর চৌধুরীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা '—কন্‌গ্র্যাচুলেশান মিষ্টার মুখার্জি। এ সান, ব্রাইট, হেলদি, লভলি, ওয়ার্দি টু বি এ চাইল্ড অভ্‌ হিজ গ্রেশাস্‌ মাদার।'

বিনিময়ে কল্যাণ হাসলো। ডক্টর চৌধুরী পার্শ্ববর্তী একজন নার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ক্যাবিন নাম্বার সেভেন, নিয়ে যাও।'

এবং এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত শরীরে মৃদু কাঁপুনি অনুভব করলো কল্যাণ। একটা মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য পা দুটো ট'লে উঠলো। কোথায় যাচ্ছি আমি? কোন উর্ধ্বে? সামনে একটি একটি সিঁড়ির ধাপ এবং এর একটি একটি সিঁড়ি ভেঙে আমি উপরে উঠবো, পরিচিত হবো একজন নতুন মানুষের সঙ্গে। যাকে আমি চিনি না, জানি না, কোনদিন দেখিনি অথচ তার প্রতি বিন্দু রক্তের মধ্যে আমার নাম, আমার পরিচয়। কল্যাণের মনে হলো সে নিজেই শিশু হ'য়ে গেছে। সিঁড়িতে একটি একটি ক'রে পা ফেলতে গিয়ে বারবার মনে হলো এই সিঁড়ি তাকে যেন বয়সের হিসেব দিচ্ছে। জন্মের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত অনেক, অনেক বছর অতিক্রম ক'রে এই হাসপাতালের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। এর প্রতিটি সিঁড়ি যদি আমার প্রতিটি বৎসরের হিসেব হয় তবে আমি আমার বয়স ভাঙছি এবং বয়স ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছি অনুপম এক অভিজ্ঞতার দরজায়। এতো রোমাঞ্চ, এতো আনন্দ, এতো শিহরণ এবং এই বিপুল অভিজ্ঞতা আজও আছে পৃথিবীতে? কিন্তু কাল তো

ভাবিনি, পরশুও না, দীর্ঘদিন ধ'রে যা পুঁথিপত্রে প'ড়েছি, যুক্তি-তর্কে প্রমাণ করতে চেয়েছি, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস ক'রেছি, তা কেন এমনভাবে উপলব্ধিকে আঘাত করেনি এতোদিন!

দোতলার কাছে আসতেই কল্যাণ একটা পরিচিত গন্ধ পেলো। আয়োডিন, ডেটল কিংবা ওষুধের পাঁচ মিশেলি গন্ধ, যা একান্তভাবেই হাসপাতালের ঘ্রাণ। এবং মনে পড়লো সেই হাসপাতালের স্মৃতি, আজ কতোদিন ধ'রেই যে গন্ধ প্রতিমুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পিছনে পিছনে অনুসরণ ক'রে জগৎ-জীবন-সংসার সম্বন্ধে ভাবিত করেছে। হাসপাতালের ঘ্রাণ পেয়ে, হাসপাতালের দরজায় দাঁড়িয়ে নিজেকে আরও গভীর, গভীরতরভাবে ভালোবাসার সুযোগ পেলো কল্যাণ। মনে হলো, মস্ত একটা যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে এই পৃথিবীর উপর, এবং এই বিপুল ধ্বংস আর যুদ্ধক্ষেত্রের আহত আর্ত অথবা মৃত মানুষের কান্না, হতাশা, নৈরাশ্য, বেদনা, শোক তাপ, দুঃখের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে একা বেঁচে থাকার দুর্লভ আনন্দকে উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। এখানে লজ্জা আছে স্বার্থপরতার, একা একা সুখ অন্বেষণের, আনন্দ আছে, উল্লাস আছে জীবনকে ভালোবাসার, প্রাণের মহৎ মূল্যকে বিচার করার। সামনে একটা সবুজ পর্দা দেখে কল্যাণ থমকে দাঁড়ালো। সেই পর্দার আড়ালে শক্ত কপাট দুহাতে সরিয়ে সহাস্য আমন্ত্রণ জানালো নার্স এবং একমুহূর্তে একটি মাত্র পদক্ষেপে কল্যাণ ওর জীবনের সিংহদ্বার অতিক্রম করলো।

বোধহয় পাশের জানলা দিয়ে আকাশ খুঁজছিলো তৃপ্তি। দরজা খোলার শব্দেই ফিরে তাকিয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই ক্লান্ত, রুগ্ন, মলিন এবং অবসন্ন একটা হাসির রেখা ফুটলো ওর ঠোঁটে। প্রত্যুত্তরে হাসতে হাসতে ঝণ্টু গিয়ে একেবারে খাটের উপর ঝুঁকে প'ড়ে দাঁড়ালো, দুহাতের চাপ পড়লো নরম গদিতে। কল্যাণ অকারণেই যেন শাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সুখ পেলো।

আশ্চর্য এক শুভ্রতার পরিবেশে শুয়ে আছে তৃপ্তি, শ্রান্তিতে-অবসাদে আরো যেন সুন্দর লাগছে ওকে। শাদা দেয়ালের ঘরে ধবধবে শাদা বিছানায় তৃপ্তির শরীর ছুঁয়ে এক শিশু। পাউডারের ছোপে ভাসিয়ে দেওয়া ডল পুতুলের চেয়েও ছোট্ট একটা মানুষ। মানুষ নয়, রক্তমাংসের একটা পুঁটলি। কল্যাণ হঠাৎ কোনো প্রাণের উৎসাহ পেলো না এই শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকতে। সব কিছুই কেমন যেন খুব সহজ স্বাভাবিক ব'লে মনে হলো একেবারে কাছাকাছি এসে। কাল রাতেও যার কোন অস্তিত্ব ছিলো না, কোনো পরিচয় ছিলো না, তৃপ্তির কান্নার সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে শরীরের সঙ্গে, জীবন আর মৃত্যুর সঙ্গে যার জীবন বাঁধা ছিলো, পৃথিবীতে আজ সে এক আলাদা মানুষ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। সম্পূর্ণ অচেনা, অপরিচিত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার অভিজ্ঞতা অসংখ্যবার [illegible], কিন্তু এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। যাকে কুশল জিজ্ঞাসা করা [illegible] না, পরিচয়ও জানতে চাওয়া যায় না, শুধু নিজেকে জানতে হয়, নিজের পরিচয়কে। ঘরের কোনে দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো শাদা তোয়ালের নীচে জল ভর্তি শাদা এনামেলের গামলাটার পাশে তুলো আর ডেটলের শিশির দিকে তাকিয়ে কল্যাণ ভাবলো এবং ঘরের ঘ্রাণ ভালো লাগলো তার—লাইজল আর শিশুর শরীরের ঘ্রাণ, শিশুর গায়ের রোঁয়া-ওঠার গন্ধ জীবনে এই প্রথম।

কেমন আছো ?'

ভালো।'

ও কে ? চিনেছো ?'

হুঁ, মহামান্য ভ্রাতুষ্পুত্র।'

ওদের কথার শব্দগুলো কল্যাণের কানে এলো। কিন্তু না-শোনার ভান ক'রেই উপরের দিকে তাকালো।

'শান্তাকে খবর দিয়েছো ?'

কী ক'রে দেব ? এখনো তো সকাল হয়নি ভালো ক'রে।'

'বিকেলে নিয়ে এসো।'

'আসবো।'

ঝণ্টুর শার্টের বোতাম নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে কী যেন বলছিলো তৃপ্তি, কল্যাণ কিছুই শুনতে পেলো না।

হঠাৎ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো ঝণ্টু। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। এবং কল্যাণ যেন ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে করলো নিজেকে। একা। বাসরঘরের মতো একেবারে নতুন মনে হলো তৃপ্তিকে। আবার নতুন ক'রে পরিচয় করতে হবে। ধীরে ধীরে তৃপ্তির পাশে এসে বসলো, চোখে চোখ রাখলো। শান্ত, করুণ, অসহায় চাউনি চোখেমুখে। বহুদিন পরে আশ্চর্য সুন্দর মনে হলো তৃপ্তিকে, ভালো লাগলো তাকিয়ে থাকতে। তৃপ্তির নিঃশব্দ এবং প্রসন্ন হাসির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত লঘুস্বরে প্রশ্ন করলো—

'ভালো আছো?'

তৃপ্তি হাসলো।

কিন্তু তারপর? নতুন প্রশ্ন তোলার মতো কোন কথা আর খুঁজে পেলো না কল্যাণ! যেন এতোদিনের এতো কথা, এতো ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এই জীবনচর্চা সব ফুরিয়ে গেছে এখন শুধু নিঃশব্দে বসে থাকার, ভাববার, অনুভব করবার দিন। কল্যাণ চারদিকে তাকালো— শাদা দেয়াল, পর্দা-সরানো খোলা জানলা, একফালি আকাশ, রোগীর শয্যা, ছোট টেবিল, জলের গ্লাস, ওষুধের শিশি, এককোণে শাদা এনামেলের গামলা, ডেটল-লাইজলের গন্ধ, স্ত্রী আর প্রথম সন্তান।

হঠাৎ অনুভব করলো, বাঁ দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ আস্তে আস্তে শরীর বেয়ে উঠছে। পাশ ফিরে শুলো তৃপ্তি। নিরলংকার শাদা হাত কল্যাণের কোমর থেকে বুক ছুঁয়ে কাঁধে উঠে এলো।

'কাল হাসপাতালে গিয়েছিলে?

প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে কল্যাণ তাকালো।

'অমিত কেমন আছে এখন ?'

প্রশ্নটা শুনে কল্যাণের মনে হলো, যেন নিতান্তই সামান্য একটা জিজ্ঞাসা। এবং এর জন্য সম্পূর্ণভাবেই প্রস্তুত হয়ে ছিলো। কিন্তু হঠাৎ খটকা বাধলো. মনে হলো এ প্রশ্ন তৃপ্তির নয়, মায়ের মুখে জীবনের প্রথম কথা, একটি দুরূহ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছে প্রথম সন্তান এবং নেহাতই অসহায়ভাবে, একটি উত্তরহীন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে বিমূঢ়, হতবাক এবং যথেষ্ট দূরের মানুষ বোধ হলো। চোখ সরিয়ে সামনের দিকে তাকালো, সামনে দেয়াল, শক্ত, বোবা, শাদা। এতো বেশি নিস্কলঙ্ক শাদা দেয়াল যে তাকাতে ভয় হয়। কল্যাণ দেয়াল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সন্তানের দিকে তাকালো। ছোট একটা পুতুলের মতো নরম তুলতুলে শরীরের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমরা অতীত স্মৃতির মন্থনে আতঙ্কিত হই। তৃপ্তি এখনো অন্ধকারকে লালন করে দুঃস্বপ্নে পীড়ন করছে নিজেকে। কিন্তু দুঃস্বপ্ন কেন ? অতীতকে আমরা পুরোপুরি জানি এবং জানি ব'লেই বিষণ্ণ স্মৃতি আমাদের শাসন করে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ? ভবিষ্যৎ দুর্বোধ্য, অনিশ্চিত এবং অনিশ্চিত বলেই এখন বাঁচবো, বেঁচে থাকব, প্রতীক্ষা করবো।

'কী, কিছুই বলছো না যে।'

কল্যাণ তৃপ্তির করুণ এবং কাতর মুখের দিকে তাকালো। হাসলো চোখে চোখ রেখে। আস্তে আস্তে হাত রাখলো তৃপ্তির গালে, গাল থেকে চিবুক, গলা, বুক ছুঁয়ে ওর কাঁধে—আদর করলো।

'অমিত কেমন আছে ?'

'ভালো।'

'ডাক্তার কী বলেছে ?

'ভালো হয়ে গেছে, খুব ভালো।'

কিন্তু তবু বিষণ্ণতা, তবু বিষাদ। খুশি হবার মতো, প্রাণ ভ'রে নিশ্বাস নেবার মতো সংবাদ শুনেও তৃপ্তি উল্লসিত হলো না। আর

প্রতারণার জন্য বিবেকের দংশনে আহত হলো কল্যাণ। সাহস পেলো না স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতে এবং এই স্পন্দন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সেই যুবককে, মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচু বাঁ মাচায় ঝুলন্ত সেই মানুষটিকে মনে পড়লো আকার স্থপতির সঙ্গে যার নেই, কিন্তু মহানগরী কলকাতার রাজপথে আকাশ প্রাসাদ নির্মাণে হাত আছে তার। হাতে তার রঙের তুলি। দীন আর দারিদ্র্যের করুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে রাঙাবে সে ঐশ্বর্যের ইমার জীবনকে সে ভালোবাসে, মৃত্যু তার পায়ের তলায়। অথচ বৃহৎ বাণিজ্য-ভবন তার কেউ নয়, কিছু নয়। সেখানে না আ কোন হৃদয়ের সংযোগ, না আত্মার অনুভবের, না সৃষ্টির যন্ত্রণা কল্যাণ বিপন্ন বোধ করলো। শাদা দেয়াল ক্লান্ত করে। চো ফেরালো সন্তানের দিকে।

এবং স্বস্তি পেতে তৃপ্তি জানলার দিকে তাকালো। অনেক-অ বড়ো বাইরের আকাশ কিন্তু জানলাটা ছোট, খুব ছোট।
